তৃতীয় অধ্যায়

মনোজ মিত্রের নাটকের বর্গীকরণ ও আলোচনা

তৃতীয় অধ্যায়

মনোজ মিত্রের নাটকের বর্গীকরণ ও আলোচনা

মনোজ মিত্র যখন বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে পথচলা শুরু করলেন তখন ভারতের স্বাধীনতার বয়স দু'দশকেরও বেশি। গণনাট্য আন্দোলনের সূচনার সময়কার সমাজ-বাস্তবতা তখন আরো কিছুটা পরিবর্তিত। নাট্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রে গণনাট্যে ভাঙন ধরেছে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই। 'বহুরূপী'র নেতৃত্বাধীন নতুন ধারাটিকে 'সৎনাট্য', কখনো বা 'নবনাট্য' বলা হচ্ছে। শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যেও চলছে একটা দোলাচল। এই দ্বিধার কথা ব্যক্ত করেছেন মনোজ মিত্র তাঁর একটি লেখায় ঃ

> "শম্ভু মিত্রের বহুরূপী, উৎপল দত্তের এল টি জি তখন আমাদের লক্ষ্যে। বলতে দ্বিধা নেই, দুই প্রবল ব্যক্তিত্বের কাকে যে আমরা ধ্রুবসত্য বলে মেনে নেব, তা নিয়েও আমাদের মধ্যে ছিল টানাপোড়েন।"[১]

'ক্রুদ্ধ ক্ষুধার্ত প্রতিষ্ঠান-বিরাধিতায় সংকল্পবদ্ধ' সেই সময়ে মনোজ মিত্রের নাট্যরচনার সূত্রপাত। নিজের প্রথম নাট্যরচনা 'মৃত্যুর চোখে জল'(১৯৫৯)-কে 'খুব একটা বৃহৎ দায়বদ্ধতা থেকে লেখা' নয় বলে নাট্যকার নিজেই জানিয়েছেন। এরপর ক্রমে যেসব নাটক তিনি লিখতে থাকলেন সেগুলির মধ্যে কোনোটি ব্যক্তিগত সমস্যা (পাখি', 'নীলকণ্ঠের বিষ', 'টাপুর টুপুর'), কোনোটি পুরাণের নতুন ব্যাখ্যা ('অশ্বত্থামা', 'তক্ষক'), কোনোটি বা রহস্য-রোমাঞ্চ বা রোমান্স-আশ্রিত ('ব্ল্যাকপ্রিন্স', 'অবসন্ন প্রজাপতি', 'বেকার বিদ্যালংকার','আরক্ত গোলাপ')। ১৯৬৭ পর্যন্ত এই নাটকগুলি রচিত হয়েছে। থিয়েটারই তখন পর্যন্ত তাঁর নাটক রচনার প্রেরণা। কিন্তু ১৯৬৮ সালে লেখা 'নেকড়ে' থেকে তিনি নাটককে করে তুললেন বিশেষ বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম। এইসময় থেকে রচিত তাঁর নাটকের বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন নাট্য-সমালোচক ড.পবিত্র সরকার ঃ

> "তিনি ফিরে এসেছেন মানুষ ও সমাজের সম্পর্ক বিষয়ে, ব্যক্তিমানুষ ও ব্যক্তিমানুষের সম্পর্ক বিষয়ে, ইতিহাসে দীর্ঘস্থায়ী শোষণের বিরুদ্ধে অসহনীয়তার চূড়ান্ত মুহূর্তে মানুষের ফেটে পড়া বিষয়ে, মধ্যবিত্ত পরিবারের অ্যালিয়েনেশন ও ব্যক্তিবিচ্ছেদ, এই শ্রেনীর স্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ ভন্ডামি বিষয়ে তাঁর গভীর ও সরস অনুধ্যানে।"[২]

এখান থেকেই তাঁর লক্ষ্য নিজের চারপাশের সমাজ ও সেই সমাজের মানুষ। সামাজিক দায়বদ্ধতা যে নাট্যকারের থাকা উচিত, সেকথা তিনি বিশ্বাস করেছেন এবং নিজের নাটকে সেই দায়বদ্ধতার প্রকাশই ঘটিয়েছেন। কিন্তু এই দায়বদ্ধতা যদি শিল্পরূপের অন্তরায় হয় তাহলে নাটক হয়ে উঠবে নীরস বক্তব্যমাত্র। তাই বক্তব্যকে শিল্পরূপের আধারে প্রকাশ করতে তিনি নাটক রচনায় বহু বিচিত্র আঙ্গিক এবং ফর্ম ব্যবহার করেছেন। বিষয়ের নিরিখেও তাঁর নাটক বিচিত্রপথগামী।

প্রথমদিকে মনোজ মিত্রের নাট্যরচনা শুরু হয়েছিল Serious বক্তব্য দিয়েই। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি প্রধানত অবলম্বন করেছেন কমেডির ভঙ্গি। তাঁর এই পথ পরিবর্তনটি ধরিয়ে দিয়েছেন ড.পবিত্র সরকার ঃ

" 'মোরগের ডাক', 'টাপুর টুপুর', 'নীলকণ্ঠের বিষ', 'মৃত্যুর চোখে জল' ইত্যাদি নাটক পরবর্তীকালের উজ্জ্বল সিরিয়োকমিক নাট্যকার মনোজ মিত্রের বিষয়ে তেমন অগ্রিম ইঙ্গিত দেয় না; আবার ব্যক্তি-সমস্যা থেকে সমাজ-সচেতন সমালোচনাতে তাঁর উত্তরণের আভাসও বহন করে না। এই মনোজ মিত্রকে আমরা পাই 'শিবের অসাধ্যি', নরক গুলজার','পরবাস'(১৯৭৫), 'বাবাবদল'(কেনারাম-বেচারাম), 'সাজানো বাগান' (১৯৭৭),'রাজদর্শন', 'মেষ ও রাক্ষস' (১৯৮০) ও 'নৈশভোজ'(১৯৮৪)-এ ।"[৩]

কিন্তু ব্যক্তি-সমস্যা কখনোই সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে না তাঁর নাটকে, বরং ১৯৮৮ বা তার পরবর্তীকালে লেখা অনেক নাটকেরই বিষয় পরিবার বা ব্যক্তির সমস্যা, বিশেষ সামাজিক অবস্থায় পতিত ব্যক্তিমানুষের সংগ্রাম বা অসহায়তা।

আধুনিক নাট্যকার হিসেবে মনোজ মিত্রের যে কোনো নাটকেরই বিষয় প্রবলভাবে সামাজিক। কিন্তু সেই বিষয়কে প্রকাশ করতে গিয়ে কখনো তিনি ব্যবহার করেছেন ইতিহাস বা মহাকাব্য-পুরাণের প্রেক্ষাপট, কখনো বা বক্তব্যকে সরাসরি না বলে রূপকের আকারে ব্যক্ত করেছেন। বক্তব্যের প্রত্যক্ষ উপস্থাপনার চেয়ে আঙ্গিকগত এসব কৃৎকৌশলের ব্যবহার অনেকসময় বেশি কার্যকরী হয়। কারণ নাটক বা থিয়েটারকে বক্তব্য প্রকাশের পাশাপাশি দর্শককে আকৃষ্ট এবং তৃপ্ত করার কথাও ভাবতে হয়। কেবল দর্শক-মনোরঞ্জনের জন্য নাটক লেখা যেমন অনুচিত, তেমনি দর্শককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করাও যুক্তিপূর্ণ নয়। বক্তব্যের গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে তাকে সার্থক শিল্পবস্তুতে রূপান্তরিত করার প্রতিভা আছে মনোজ মিত্রের। বিষয়ের দিক থেকে দেখলেও তাঁর নাটক কখনো ধরেছে শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্ব, কখনো দেখিয়েছে মানুষের ব্যবহৃত হবার ইতিহাস, কখনো বা আলো ফেলেছে সমাজের লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতা, ক্রূরতার প্রতি। সামাজিক যে সত্যগুলিকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন নিজের চারপাশে, সেগুলিকে কখনো দেখিয়েছেন একটি বা দু'টি পরিবারের মাধ্যমে, কখনো বা সামাজিক শ্রেণির মাধ্যমে। প্রত্যক্ষত কোনো দলীয় রাজনীতির প্রতি আস্থা বা কোনো রাজনৈতিক দলের সাংস্কৃতিক সংগঠনের উত্তরাধিকার বহন না করলেও বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ তাঁর আছে এবং সামাজিক সমস্যাগুলি বিশ্লেষণের পেছনে সেই মতবাদ কার্যকরী থেকেছে বলে তিনি নিজেই জানিয়েছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতি ও তার সমালোচনা মনোজ মিত্রের নাটকে স্থান পেয়েছে। সাহিত্যতত্ত্বে যাকে 'রাজনৈতিক নাটক' বলা হয়, সেরকম প্রচারমূলক বা বিশেষ আদর্শ-অনুসারী নাটক হয়তো তিনি লেখেন নি, কিন্তু প্রথম দিককার বেশ কিছু নাটকে তাঁর রাজনৈতিক চেতনা অত্যন্ত প্রখর এবং পরের দিকেরও অনেক নাটকে রাজনীতির সাধারণীকৃত সমালোচনা লক্ষণীয়। এই সমস্ত দিকগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা মনোজ মিত্রের নাটকগুলির নিম্নোক্তরূপ বর্গীকরণ করেছি :

ক) সামাজিক নাটক

খ) পারিবারিক নাটক

গ) রাজনৈতিক প্রসঙ্গযুক্ত নাটক

ঘ) ইতিহাসের পটে লেখা নাটক

ঙ) পুরাণ-নির্ভর নাটক

চ) রহস্য নাটক

যে কোনো বর্গীকরণের মতোই এই বর্গীকরণও অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিযুক্ত । কারণ অনেক নাটককেই যেমন এক বর্গ থেকে অনায়াসে স্থানান্তরিত করা যায় অন্য বর্গে তেমনি আবার মনোজ মিত্রের নাট্যতালিকায় এমন দু'একটি নাটকও আছে ('দন্তরঙ্গ', 'সাহেববাগানের সুন্দরী', 'তেঁতুলগাছ'), যাদের বিশিষ্টার্থে কোনো বর্গেরই অন্তর্ভুক্ত করা চলে না । কিন্তু তবু একটি সাধারণ কাজ-চলা-গোছের ধারণা গড়ে উঠতে পারে এধরণের বর্গীকরণে । প্রত্যেক বর্গের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি এবং সেই বর্গের নাটক রচনায় নাট্যকারের বিশিষ্ট চেতনার ধারণা গড়ে উঠতেও এরকম বর্গীকরণ অপরিহার্য ।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) কিছু লোক কিছু নাটক - মনোজ মিত্র - বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ - সৃষ্টি প্রকাশন - কলকাতা - ০৯ - প্রথম প্রকাশ - বইমেলা, ২০০১, পৃ. ১৩-১৪

২) নাট্যকার মনোজ মিত্র - পবিত্র সরকার - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খণ্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ-মাঘ ১৪০৩ - এর ভূমিকা, পৃ.।৪।

৩) ত্রিশ বছরের বাংলা নাটক - পবিত্র সরকার - নাটমঞ্চ নাট্যরূপ - প্রমা প্রকাশনী - কলকাতা-১৭ - দ্বিতীয় সংস্করণ - বৈশাখ ১৩৯৭, পৃ.২৩৩

সামাজিক নাটক

নাটকের বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিকরণের অন্যতম শ্রেণি হ'ল 'সামাজিক নাটক'। নাটক যেহেতু মানুষের জীবনের কথা বলে এবং মানুষমাত্রেই সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ, সেহেতু বৃহত্তর অর্থে যে কোনো নাটকই সামাজিক নাটক। কিন্তু 'সামাজিক নাটক' অভিধায় যখন কোনো বিশেষ শ্রেণিকে চিহ্নিত করা হয় তখন সেই শ্রেণি বিশেষ চরিত্রলক্ষণ দাবী করে। বিশিষ্ট সমালোচক সামাজিক নাটকের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে :

> "সামাজিক নাটক বলতে আমরা বুঝি কোনো একটি যুগ বা সময়ের সামাজিক সমস্যা ও সঙ্কট নিয়ে লেখা নাটক। সমাজের অন্তর্গত শক্তি সমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কিংবা সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের দ্বন্দ্ব এ জাতীয় নাটকের উপজীব্য।"[১]

নাট্যকারের সমকালের সামাজিক সমস্যা সামাজিক নাটকে গুরুত্ব পেয়ে থাকে। বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে ব্যক্তি চরিত্রের সমস্যাও সামাজিক নাটকে থাকতে পারে। সমাজ-সমস্যার মুখোমুখি হয়ে এই শ্রেণির নাটকে নাট্যকার সমাজের যুযুধান পক্ষগুলির কোনো একটির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়তে পারেন। এই শ্রেণির নাটকে নাট্যকার কখনো সমস্যা সমাধানের পথের ইঙ্গিত দেন, কখনো বা সমাধানের পথ খোঁজার দায়িত্ব দেন পাঠক-দর্শকের ওপর। নাটকের ভরকেন্দ্রে একটি বিশেষ সামাজিক সমস্যা থাকলে তাকে বলা হয় সামাজিক সমস্যামূলক নাটক। পাশ্চাত্য সমালোচনা সাহিত্যে এই শ্রেণির নাটককে বলা হয়েছে 'Problem Play'. Marjorie Boulton এই শ্রেণির নাটক সম্পর্কে বলেছেন :

> " It is usually somewhat tragic in tone in that it naturally deals with painful human dilemmas ; it is the kind of play that, by implication, asks a definite question and either supplies an answer or leaves it to us to find one."[২]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যে এই ধরণের নাটকের আবির্ভাব ঘটে। বার্ণার্ড শ-এর 'Mrs. Warrer's profession', 'Major Barbara', গোর্কির 'The Lower Depths', গলসওয়ার্দির 'Justice', ইবসেনের একাধিক নাটক এই শ্রেণির নাটকের দৃষ্টান্ত। সমাজ-সমস্যাকে এসব নাটকে দেখা হয়েছে মানুষের জীবনের ট্রাজিক পরিণতির সঙ্গে অন্বিত করে। M. Boulton শেক্সপীয়রের 'Measure for Measure', 'Hamlet', এবং 'Antigone', 'Electra', 'Choephoroe' প্রভৃতি গ্রীক নাটককে এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। কোনো কোনো সমালোচক সামাজিক নাটক ও পারিবারিক নাটককে একই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। তাঁরা মনে করেছেন, সমগ্র সমাজের রূপ যদি দুটি বা একটি পরিবারের কাহিনিতে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় তবে সে নাটককে 'সামাজিক নাটক' বলায় আপত্তি থাকতে পারে না। বাংলায় অধিকাংশ সামাজিক নাটকই এরকম এক বা একাধিক পরিবার-আশ্রিত।

বাংলা নাটক তার জন্মলগ্ন থেকেই সমাজসংস্কারের স্বেচ্ছাবৃত দায় গ্রহণ করেছে। ফলে প্রথম থেকেই বাংলা নাটকে সমাজচিত্র এবং সামাজিক সমস্যা স্থান পেয়েছে। বাংলা সামাজিক নাটক

এগিয়েছে প্রধানত দুটি ধারায় — একটি ধারায় Serious ভঙ্গিতে সামাজিক নানা সমস্যার কথা বর্ণিত ও আলোচিত হয়েছে, অন্য ধারাটিতে লঘু ভঙ্গিতে বাংলাদেশের সমাজের নানা অসঙ্গতি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে আঙুল তোলা হয়েছে। এই দ্বিতীয় ধারাটি প্রধানত প্রহসনের ধারা। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪)-ই বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম সামাজিক সমস্যামূলক নাটক। এই নাটকেই প্রথম বাঙালির বাস্তব জীবন ধরা দিল। অর্থাৎ মৌলিক বাংলা নাটক রচনা শুরু হবার দু'বছরের মধ্যেই বাংলা নাটক সামাজিক বিষয়কে অবলম্বন করল। এরপর উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ নাটক', মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ', দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' ও 'সধবার একাদশী' প্রভৃতি নাটকের মধ্য দিয়ে এই ধারাটি অগ্রসর হতে থাকে। 'নীলদর্পণ' বাংলা সামাজিক নাটকের ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। সমকালীন সমাজের একটি জ্বলন্ত সমস্যাকে অবলম্বন করে রচিত এই নাটক সমাজে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

প্রথম পর্বে বাংলা সামাজিক নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে কৌলীন্য প্রথা, বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা। এরপর ইয়ং বেঙ্গলদের উচ্ছৃঙ্খলতা, স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে আলোড়ন, পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ, প্রাচ্য রক্ষণশীল সভ্যতার অন্ধ গোঁড়ামি প্রভৃতি সামাজিক বিষয় নাটকে উঠে এসেছে। বাংলা সামাজিক নাটক রচনার ধারায় আর একটি উল্লেখযোগ্য নাম গিরিশচন্দ্র ঘোষ। সমকালীন বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, যেমন - একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন, পণপ্রথা, মদ্যপান, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি তাঁর নাটকে স্থান পেয়েছে। গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা সামাজিক নাটক মোটামুটিভাবে সামাজিক সমস্যার নিখুঁত চিত্রাঙ্কনেই আবদ্ধ থেকেছে। কিন্তু তারপর থেকে বাংলা সামাজিক নাটকের গঠনবিন্যাস ক্রমশ জটিল হয়েছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

> ''বাস্তব সমাজটি রঙ্গমঞ্চে আনিয়া নিখুঁতভাবে উপস্থিত করিয়া দিতে পারিলেই সেকালের নাট্যকারদিগের দায়িত্ব শেষ হইয়া যাইত; কিন্তু আধুনিক কালে এই নিতান্ত সহজ উপায়ে দর্শকের চোখ ভুলাইবার রীতি একেবারেই অচল হইয়া গিয়াছে। ব্যক্তিমনের জটিলতা, তাহার অনন্ত জিজ্ঞাসা — এইসকল নিপুণ ভাবে কথোপকথনের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া লইয়া নাট্যিক চরিত্রের বিকাশ এই যুগে দেখাইতে হয়।''[৩]

গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যে আধুনিক বাংলা নাট্যধারার সূত্রপাত, সেখানে নাট্যাভিনয়ের উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক, কৃষক ইত্যাদি মানুষকে আন্দোলন ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা। চারপাশের বাস্তব সমস্যাকে তুলে ধরে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং সেই সমস্যা থেকে মুক্তিলাভের উপায় সন্ধানই ছিল সমকালীন নাট্যকারদের লক্ষ্য। বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী হয়ে সমাজকে শোষক ও শোষিত শ্রেণিতে বিভক্ত দেখে এই দুই শ্রেণির দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে শোষিত শ্রেণির জয় ঘোষণাই ছিল এই সময়কার সামাজিক নাটকের উপজীব্য। কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক এই নাট্যাদর্শকে সকলে দীর্ঘদিন মেনে নিতে পারলেন না। শম্ভু মিত্রের গণনাট্য সংঘ ত্যাগ করে বহুরূপী গঠনের মধ্যে দিয়ে শুরু হ'ল নতুন নাটকের ধারা, যেখানে গণনাট্যের আদর্শকে স্বীকার করে নিয়েও মানুষের জীবনকে দেখা হ'ল আরো সমগ্রভাবে। কেবল শ্রেণিসংগ্রাম নয়, জীবনের বহুমাত্রিক জটিলতা ও গভীরতাকে ধরতে চাইল এই সময়কার সামাজিক নাটক। মানুষের কেবল শ্রেণিপরিচয় নয়, গুরুত্ব পেল বক্তি-পরিচয়টিও। স্বাধীনতা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের সংকট মধ্যবিত্ত

মানুষের জীবনে যে অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল তাই গুরুত্ব পেতে থাকল সমকালীন সামাজিক নাটকে। একালের সামাজিক নাটক রচয়িতাকে অনেক বেশি সতর্ক ও সচেতন থাকতে হয়। কারণ একালের সামাজিক নাটকে যে সমস্যার অবতারণা করা হয় তা বিধবা-বিবাহ, বহুবিবাহ, মদ্যপান বা পণপ্রথার মতো কোনো সামাজিক সমস্যা নয়, বরং তা হ'ল বিশেষ কোনো সামাজিক পরিস্থিতিতে পতিত ব্যক্তিমানুষের জীবনসমস্যা। এযুগে তাই সামাজিক নাট্যকারকে কেবল সামাজিক উপকরণ সম্পর্কে অভিজ্ঞ হলেই চলে না, মানবচরিত্র সম্পর্কে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির অধিকারীও হতে হয় : ''ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতার উপর মানব-চরিত্রের জটিল রহস্য সম্পর্কে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও ব্যক্তিচরিত্র সম্পর্কে আন্তরিক সহানুভূতি না থাকিলে সামাজিক নাটক রচনায় কেহ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন না।''[৪]

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শেষ বছরটিতে নাট্যকার হিসেবে মনোজ মিত্রের আবির্ভাব। সেই সময়কে মনোজ মিত্র চিহ্নিত করেছেন এইভাবে ঃ

> " তখনকার সেই সময়টার মধ্যেই এমন একটা কিছু ছিল, যার টানে আমাদের সহপাঠী কবি গল্পকার বন্ধুরা চাইছিল তাদের গল্প-কবিতার জন্যে একটি পৃথক ভূমির দখল, চিত্রকর বন্ধুরাও চাইছিল নতুন রূপ, নতুন প্রকাশ, রাজনীতিক বন্ধুদের সন্ধানও ছিল সেইরকম। সময়টাই ছিল ক্রুদ্ধ, ক্ষুধার্ত, প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতায় সংকল্পবদ্ধ। জন্ম নিচ্ছিল নতুন থিয়েটার, নবনাট্য।"[৫]

সমকালের নাট্য তথা মঞ্চজগতে দুই প্রবল ব্যক্তিত্ব ছিলেন উৎপল দত্ত এবং শম্ভু মিত্র। স্থূলভাবে উৎপল দত্তের নাট্যধারাকে বক্তব্যপ্রধান এবং শম্ভু মিত্রের ধারাটিকে অনুভূতিপ্রধান বলা যেতে পারে। মনোজ মিত্র নিজের নাট্য রচনায় এই দুটি ধারাকে মেলালেন। বক্তব্য তাঁর নাটকে আছে কিন্তু তা ভার হয়ে ওঠেনি, মানুষকে ছাপিয়ে ওঠেনি। বক্তব্যের ভারে, শত্রু চেনানোর দায়ে, অত্যাচারীর মুখোশ ছেঁড়ার দায়িত্বে বাংলা নাটক থেকে যখন ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছিল মানুষ, তখন তিনি নিজের নাটকে ফিরিয়ে আনলেন 'আলোছায়ায় ঘেরা গভীর গোপন মানুষ', 'অন্তর্লোকের বাসিন্দা মানুষ'কে। তাঁর সামাজিক নাটক বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে ব্যক্তি মানুষের সুখ-দুঃখ, লড়াই-যন্ত্রণা, আশা-আনন্দের প্রতিফলন। বৃহত্তর অর্থে মনোজ মিত্রের সব নাটকই সামাজিক। নিজের দেশ-কাল-সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ তাঁর সৃষ্টি । সামাজিক মানুষের জীবনকে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি কখনো আশ্রয় করেছেন ইতিহাস বা কাল্পনিক ইতিহাস, কখনো ব্যবহার করেছেন রূপক বা রূপকথার আঙ্গিক, কখনো বিচরণ করেছেন পুরাণের পটভূমিতে। এইসব পর্যায়ের নাটকগুলিকে আমরা পৃথকভাবে আলোচনা করেছি। রাজনীতির প্রসঙ্গযুক্ত এবং পরিবার-জীবন-আশ্রিত নাটকগুলিকেও আমরা পৃথক বর্গের অন্তর্ভুক্ত করেছি। এগুলিও আসলে সাজাজিক নাটক। আধার যাই হোক, বিষয় সমকালের সমাজ। এগুলির বাইরে 'সামাজিক নাটক' বর্গের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছি আমরা এই নাটকগুলিকে – 'সাজানো বাগান' (১৯৭৬-৭৭), রাজদর্শন (১৯৮৮), 'নৈশভোজ' (১৯৮৪-৮৫), 'কিন্তু কাহারের থেটার' (১৯৮৮), 'দর্পণে শরৎশশী' (১৯৯১), 'আত্মগোপন' (১৯৯৪), 'নাকছাবিটা' (২০০০) এবং 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' (২০০১)। একাঙ্ক নাটকগুলির মধ্যে এই বর্গের আওতায় আসবে 'কালবিহঙ্গ' (১৯৬৮), 'আমি মদন বলছি' (১৯৭৪), 'মদনের পঞ্চকান্ড' (১৯৭৪), 'কাকচরিত্র' (১৯৮২), 'প্রভাত

ফিরে এসো' (১৯৮৮), 'বৃষ্টির ছায়াছবি' (১৯৯৩)। বলাবাহুল্য এই বর্গীকরণ কখনোই চূড়ান্ত নয়। রাজনৈতিক, পারিবারিক ও সামাজিক নাটকগুলিকে যেমন একগুচ্ছে রাখা চলে তেমনি পৃথক গুচ্ছে রাখলেও 'রাজদর্শন', 'নৈশভোজ', বা 'কিনু কাহারের থেটার'-এর মতো নাটককে সামাজিকের পরিবর্তে রাজনৈতিক বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, আবার 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'কে পারিবারিক বর্গ থেকে অনায়াসেই নিয়ে আসা যায় সামাজিক বর্গে।

'সাজানো বাগান' (১৯৭৬-৭৭) কেবল মনোজ মিত্রের নয়, সমগ্র বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল সৃষ্টি। মৃত্যুর বিপ্রতীপে জীবনের এ এক অদ্ভুত রসায়ন। আরোপিত বিপ্লব এখানে নেই কিন্তু কমেডির মধ্য দিয়ে শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের উত্থানের এ এক আশ্চর্য আলেখ্য। কোথায় পেলেন তিনি এই নাটকের ভাববীজ, কোথায় পেলেন জীবনরসিক বাঞ্ছারামকে? সে জিজ্ঞাসার উত্তর আছে তাঁরই গদ্য রচনায়। ১৯৬১ সালে ২৩ বছর বয়সে তিনি রানিগঞ্জে কলেজে যোগ দিলেন দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে। শ্রী নারায়ণ পান্ডে ছিলেন লোকসাহিত্যের গবেষক। তাঁর সংগ্রহে ছিল দেশবিদেশের অসংখ্য লোককথা উপকথা নীতিকাহিনীর বই। মনোজ মিত্র বলেছেন ঃ

> " সাজানো বাগানের মরতে মরতে না মরা বুড়োর গল্পোটা পাই এখানেই কোনো একটা সংকলনের মধ্যে। ... বুড়োটাকে খুব চেনা ঠেকেছিল। যেন সে আমাদের ওপার বাংলার লোক আমাদের খুলনা জেলার বাসিন্দা। হয়ত ছেলেবেলায় আমাদের সেই ছোট্ট গাঁয়ে দেখেছি তাকে, এও মনে হয়েছিল"।[৬]

মাথায় থেকে গিয়েছিল দু-তিন পাতার সেই ছোটো শিশুপাঠ্য কাহিনিটি। বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদটা এলো প্রায় তেরো-চোদ্দ বছর পরে - ১৯৭৬ এর শেষদিকে। 'সুন্দরম্'- এর রিহার্সাল থেকে তুলে নিয়ে 'নরক গুলজার' নাটকটি থিয়েটার ওয়ার্কশপে বিভাস চক্রবর্তীকে দিয়ে দেবার পর সুন্দরমের বন্ধুদের 'শান্ত' করতে খুব তাড়াতাড়ি একটা নতুন নাটক প্রয়োজন। এই প্রয়োজনই উস্‌কে দিল স্মৃতিকে। দেখা গেল, শিশুপাঠ্য নীতিকথার সেই বুড়ো মাথায় কেবল জায়গাই করে নেন নি, তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতার মধ্যে, শৈশবের পরিচিত দেশকালের মধ্যে বেড়েও উঠেছেন ক্রমশ। বাঞ্ছারামের বাগান এবং সেই বাগানের ভূত কোনোটিই তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে নয়। তিনি লিখেছেন ঃ

> " গাঁয়ের একটা বড় বাগান ঘিরে ভূতপ্রেতের গল্পোগাছা ছিল। শৈশবে ঠাকুমার মুখে সে গল্প শুনতাম। দিনের বেলা সে বাগানে আমরা ঢুকতামও না। একজন বুড়ো মানুষ, সাদা ফকফকে, সে বাগানে চালা বেঁধে থাকত। হাঁটতে পারত না। মাটিতে বসে বসে চলত। তার নাম ছিল বাঞ্ছারাম ! গাছপালাকে সে বড় আদরযত্ন করত"।[৭]

পূর্ববঙ্গের সেই গ্রামের ভূত এবং বাঞ্ছারামের পাশাপাশি মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে স্থান দিয়েছেন নিজের চোখে দেখা সেই চোরকেও, যে কিনা গৃহস্থের নাতির ম্যালেরিয়া শুনে 'হাতের মাল' ছেড়ে যায় এবং পরদিন দুপুরে গৃহস্থের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে অবলীলায় বলে ঃ " কাল রাতে তুমি আমায় নিজ মুখে নেমন্তন্ন করেছ। নাতির জ্বর শুনে হাতের মাল ফেলে রেখে গেছি, এখন শুনব কেন ?"[৮]

ওপার বাংলার সেই সহজ সরল ঢিলেঢালা জীবনটাকেই মনোজ মিত্র ধরতে চেয়েছিলেন

'সাজানো বাগান' - এ। কিন্তু ৫ এপ্রিল, ১৯৭৭ ঢাকুরিয়া পুল সংলগ্ন 'অবন মহল' - এ 'সুন্দরম্' প্রযোজিত যে 'সাজানো বাগান' নাটকের অভিনয় হ'ল তা দর্শকের বাহবা পেলেও নাট্যকারের মনোমত হ'ল না। তিনি লিখেছেন ঃ

> " সেদিন মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি বুঝে গিয়েছিলাম, নাটকটা কিছুমাত্র উতরোয়নি। গরিব আর বড়োলোক — শোষক আর শোষিতের দ্বন্দ্বটা এতোটাই প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে যে হারিয়ে গেছে আমার শৈশবে দেখা সেই আপাত টেনশানহীন বিশেষ ধরণের জীবনযাত্রা "। [৯]

তাই পরদিন সকালেই সে নাটক সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে আবার নতুন করে লিখতে বসলেন। 'সাজানো বাগান'-এর নতুন রূপের প্রথম অভিনয় হ'ল মুক্ত অঙ্গনে, ৭ নভেম্বর ১৯৭৭। নাটকের সেই চেহারাই অদ্যাবধি রক্ষিত হয়েছে। এখানেই মনোজ মিত্রের স্বাতন্ত্র্য। বক্তব্যকে যতক্ষণ পর্যন্ত নির্ভার করে তুলতে না পারছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টিতে জীবন মূর্ত হয়ে না উঠছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি বদলে চলেন তাঁর সৃষ্টিকে। সমস্যার চরিত্রগত দিক থেকে 'সাজানো বাগান' নাটকটি 'নেকড়ে', 'চাক ভাঙা মধু' 'নরক গুলজার' বা 'শিবের অসাধ্যি'র সমধর্মী। শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্ব এবং পরিণামে শোষকের জয় এই নাটকেরও কেন্দ্রীয় বিষয়। কিন্তু এই দ্বন্দ্বকে ছাপিয়ে এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে একটি বিশেষ সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থানে স্থিত মানুষের জীবনের সহজ চলন। যে রসবোধ মনোজ মিত্রের অন্বিষ্ট, এই নাটকে তার পরিচয় পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। নকড়ির 'পল্লী উন্নয়ন সমিতি', তার ছেলের 'যুব পার্টি', হাতে ঘড়ি আর ঠোঁটে চারমিনারসহ নতুন যুগের পুরোহিত — প্রভৃতির মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ সময়কালকে চিহ্নিত করার চেষ্টা হলেও সেই সময়কে ছাপিয়ে যাওয়াতেই এই নাটকের কৃতিত্ব। মনোজ মিত্র জানেন, পৃথিবীর যেখানে যত ফসল তার দিকে ওঁৎ পেতে বসে আছে হিংস্র হায়েনারা। তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অস্ত্র হিসেবে তিনি উপস্থাপিত করেছেন বাঞ্ছার প্রবল জীবনাসক্তিকে। কেবল নিজের প্রবল বেঁচে থাকা দিয়েই বাঞ্ছা হারিয়ে দিয়েছে নকড়িকে।

'চাক ভাঙা মধু'তে শোষক অঘোর ঘোষ ছিল মহাজন, আর 'সাজানো বাগান'- এ ছকড়ি দত্ত জমিদার, তার ছেলে নকড়ি জোতদার। অঘোর ঘোষের মতোই গায়ের জোরে সম্পত্তি আত্মসাৎ করতো ছকড়ি দত্ত। কিন্তু বাঞ্ছারামের লাঠির কাছে হার মেনেছে ছকড়ির লাঠিয়ালেরা। বন্‌বন্ করে লাঠি ঘুরিয়ে বাঞ্ছা রক্ষা করেছে বারো বিঘে তেরো ছটাক জমির ওপর বাগানকে। তিল তিল করে গড়ে তোলা এই বাগান তার প্রাণ। জীবনের বেশিরভাগ সময় সে ব্যয় করেছে এই বাগানের পেছনে। জীবিত অবস্থায় জমিদার ছকড়ি, যার যে জমির প্রতি দৃষ্টি দিয়েছে তাই গ্রাস করে নিয়েছে। পারেনি কেবল বাঞ্ছারামের বাগান। এই ব্যর্থতায় মরে গিয়েও মুক্তি পায়নি , ঠাঁই নিয়েছে গাছের ডালে। বাঞ্ছাকে সে নানাভাবে ভয় দেখিয়ে কাবু করতে চায়। আজ আর বাঞ্ছার সেই লাঠির জোর নেই, মাজা পড়ে গেছে, মাটিতে ঘষটে চলে সে। ভূতের পাশাপাশি বাগান রক্ষায় আর এক অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে ছোটোমেয়ের ছেলে গুপি। বাগান বেচে দিয়ে সে চুল ছাঁটার সেলুন, দর্জির দোকান বা ভাটিখানা খুলতে চায়। একাল বোঝে মুনাফা, মাটির প্রতি কোনো টান তাদের নেই। কিন্তু বাঞ্ছার কাছে যে এই মাটিই জীবন। নাতির হাত থেকে বাঁচতে তার আর্ত চিৎকার শুনে প্রবেশ করে জোতদার নকড়ি আর তার পারিষদেরা। বাবার মতোই বাগানটার ওপর দীর্ঘদিনের লোভ নকড়ির। লাঠির যুগ গেছে, বুদ্ধির প্যাঁচই এখন ভরসা। সেই প্যাঁচেই বাঞ্ছাকে বাঁধতে চায় নকড়ি। বাঞ্ছার সঙ্গে সে চুক্তি

করে, প্রতি মাসের পয়লা তারিখে বাঞ্ছাকে দুশো করে টাকা দেবে, বিনিময়ে বাঞ্ছার মৃত্যুর পর বাগানের মালিক হবে সে। প্রথমে আঁতকে উঠলেও ক্রমে বাঞ্ছাকে তারা বোঝাতে সক্ষম হয় যে, এই ব্যবস্থায় বাঞ্ছার দুদিক থেকে লাভ। বেঁচে থাকা পর্যন্ত বাগানের অধিকারও থাকল, আবার মাসে মাসে দুশো করে টাকাও পাওয়া গেল। নকড়ি দত্তের কোনো সংশয় নেই যে, এক দু'মাসের মধ্যেই বাঞ্ছা পটল তুলবে আর বাগান হবে তার। বাঞ্ছাকে রাজি করতে তার সামনে তুলে ধরে দীর্ঘ সচ্ছল জীবনের ছবি, সে জীবন দুধ-ঘি আর কাশ্মীরি শালে উজ্জ্বল। তাদের কথায় শীর্ণ বাঞ্ছার বুকে লাগে জীবনের দোলা, জাগে বাঁচার লোভ। নিজের মনে সে বিড়বিড় করে ঃ " বাঁচবো ... আমি বাঁচবো..."[১০] বাঞ্ছার এই অস্তিত্ব ঘোষণাই চারিয়ে গেছে গোটা নাটক জুড়ে। নকড়ি দত্তের আশা ক্রমশ কুহকিনী হয়ে উঠেছে।

খুশি নকড়ি, খুশি ছকড়ির প্রেতাত্মাও। এতদিনে বাঞ্ছাকে কব্জা করা গেছে। কিন্তু কে যে কাকে কব্জা করেছে বোঝা দুষ্কর হয়ে ওঠে। তিনমাসের কিস্তির টাকা দেওয়া হয়ে গেলেও বাঞ্ছার মরার নাম গন্ধ দেখা যায় না। তীব্র আক্রোশে বাঞ্ছাকে তৃষ্ণার জলটুকুও এগিয়ে দেয় না তারা, ডাক্তারকে ওষুধ দিতে দেয় না। তবু সব প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে বাঞ্ছা বেঁচে থাকে – তীব্রভাবে বেঁচে থাকে। গণৎকার বাঞ্ছার দীর্ঘ আয়ুরেখা দেখতে পায়, ডাক্তারি রিপোর্টেও কোথাও কোনো দোষ পাওয়া যায় না। নকড়ি ক্রমশ অধৈর্য হয়ে ওঠে। এদিকে গুপী নতুন বিয়ে করা বৌ পদ্মকে নিয়ে এসে ওঠে বাঞ্ছারামের কাছে। বিয়ে করে সে বুঝেছে আশ্রয়ের মূল্য, মাটির টান। পদ্মকে সঙ্গে নিয়ে বাগান আরো বড়ো করে তোলার স্বপ্ন তার চোখে। কিন্তু বাগান তো এখন প্রায় নকড়িরই সম্পত্তি, বাঞ্ছারাম মরে গেলেই তো সব শেষ। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে গুপী-পদ্মর, আর সেইসঙ্গে পাড়ার সেই ছিঁচকে চোরটির, বাঞ্ছারামের বাগানের মাল গেঁড়িয়েই যার সংসার চলে। বাগান নকড়ির দখলে চলে গেলে তারও যে অস্তিত্বের সংকট। তখন বাগানে কাঁটাতারের বেড়া বসবে, মালী-চৌকিদার বসবে, চোর ঢুকবে কোন্ ফাঁকে ? কিন্তু এ সবই তো বাঞ্ছার মৃত্যুর পরের কথা। যদি বাঞ্ছা না মরে, যদি তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়? তাহলে তো থেকে যাবে বাগানের অধিকার। তাই এবার শুরু হয় গুপী-পদ্ম আর চোরের লড়াই জীবনকে টিকিয়ে রাখার জন্য। এ জীবন শুধু বাঞ্ছার নয় – তাকে ঘিরে থাকা মানুষগুলির জীবনও আজ বাঞ্ছার বেঁচে থাকা-না-থাকার সঙ্গে প্রবলভাবে যুক্ত। তাই পদ্ম জলের ঘটি এনে বাঞ্ছার মাথায় জলের থাব্‌ড়া দেয়। একজন বগলে বৌ আর একজন বগলে নারকেল নিয়ে বাঞ্ছার মৃত্যুর পথ রোধ করে দাঁড়ায়। পদ্ম জল ঢেলে দেয়, আর ঃ " তৃষিত বাঞ্ছা একে একে গুপি, চোর ও পদ্মের মুখের দিকে চেয়ে চক্ চক্ করে জল খায়।"[১১] এই জল জীবনের রসদ, জীবনের প্রতীক।

দুই যমজ ছেলে হোঁৎকা-কোঁৎকাকে নিয়ে বিব্রত নকড়ি। হোঁৎকা সিনেমার প্রোডিউসার হতে চায়, আর কোঁৎকা গ্রামে 'যুবপার্টি' তৈরির চাঁদা চায়। দু'ভাই-ই বাবার ওপর ক্রমশ চাপ বাড়াচ্ছে। এদিকে বাঞ্ছার বাগানের চিন্তায় বাবার অবস্থা করুণ। তারই দেওয়া কিস্তির টাকায় দুধ-ঘি খেয়ে বাঞ্ছা বসা থেকে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, এরপর তীরের মতো সোজা হবে। কিস্তির টাকা চাইতে সে নিজেই এখন চলে আসে নকড়ির বাড়িতে। পদ্ম আর চোর মিলে তাকে খাওয়াচ্ছে হরলিকস্ আর মুরগির ডিম। 'যুব' করা ছেলে কোঁৎকাকে দিয়ে নকড়ি কড়কে দিতে চায় বাঞ্ছাকে।

কিন্তু ডাগর পদ্মের দিকে চোখ পড়ে বাবা-ছেলে দুজনেরই। সেই সুযোগটাই কাজে লাগায় বাঞ্ছা। একবার বাবাকে আর একবার ছেলেকে নিতে বলে 'মেয়েমানুষটা'-কে। বাবা-ছেলের দ্বন্দ্বে বাঞ্ছার বাড়িতে গুপীর অধিকার সু-প্রতিষ্ঠিত হয়। বশীকরণ, যজ্ঞ কোনোকিছুই বাকি রাখে না নকড়ি বাঞ্ছার মৃত্যু কামনায়। কিন্তু বাঞ্ছা তো মরবে না, আর তো সে একা নয়। ছকড়ি বুঝতে পেরেছে ঃ " বাঞ্ছা কাপালির ন্যাচারাল ডেথ হবে না ! ওর পেছনে যে মানুষ ভীড় করেছে ! লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ... এর পর ওই লাঠি ও তুলবে।"[১২]

যখনই বাঞ্ছাকে 'খতম্' করতে গেছে নকড়ি তখনই কোনো না কোনো রূপে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে জীবন। সে জীবন কখনো পদ্ম, কখনো চোর, কখনো বা গুপি। বাঞ্ছার মৃত্যু কামনায় যেদিন যজ্ঞ হচ্ছে নকড়ির বাড়িতে তখন লাঠি ভর দিয়ে এসে উপস্থিত হয় বাঞ্ছারাম। নকড়ির বাড়িতে পুরনো বাসন-কোসন বিক্রি হবে শুনে বাঞ্ছা এসেছে। সে কিনতে চায় জমিদার ছকড়ি দত্তের রূপোর গড়গড়াটা। সেটার ওপর বড় লোভ তার। ঐ গড়গড়াটা ফাটিয়ে সে মরতে চায়। বাঞ্ছা ক্রমে সোজা হয়ে উঠছে আর নকড়ি কুঁকড়ে যাচ্ছে, দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। কেবল জীবনের জোরে প্রবল শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে এনেছে বাঞ্ছা। নকড়ি আগেই মরে গেলে চুক্তির কী হবে সে প্রশ্নও উঠে এসেছে। তখন বাগান আবার তার হাতে ফিরে আসবে শুনে বাঞ্ছা আনন্দিত। নকড়ি বাঞ্ছার কাছে করুণ ভিক্ষা চায় বাঞ্ছারই মৃত্যু। এখন কে জোতদার আর কে খাতক বোঝা দায় ! নকড়ির জীবন আজ বাঞ্ছার হাতে। দয়াপরবশ হয়েই যেন বাঞ্ছা মরতে রাজী হয়। নকড়ির দেওয়া ফলিডল সে হাতে নেয় রাতে 'ছুইছাইড' করার জন্য। কিন্তু মরতে রাজি হওয়ার বিনিময়ে অনেকগুলি শর্তে সে রাজি করিয়ে নেয় নকড়িকে। 'বডি' যেন কাটাছেঁড়া না করা হয়, শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় যেন গুজিয়া ছড়ানো হয়, বাঁশে না বেঁধে বোম্বাই খাটে যেন নেওয়া হয়, 'কেত্তন' যেন অবশ্যই হয়, বডিতে 'গব্যঘেত্য' যেন মাখানো হয়, আর পেছনে তার নামে দেগে একটা ষাঁড় যেন 'উচ্ছুগ্য' করা হয়। বাঞ্ছা আজ শর্ত দেবার জায়গায়, আর অসহায় নকড়িকে সেই শর্ত মেনে নিতে হচ্ছে। কথা হয়ে যায়, মাঝরাতে বাঞ্ছা বিষ খাবে আর ভোর-ভোর তাকে খাটে বেঁধে শ্মশানের পথে বেরিয়ে পড়বে নকড়ির লোকেরা।

বাঞ্ছা বেইমান নয়। কথা যখন দিয়েছে, বিষ সে খাবেই। তার জন্য একটা লোক শুকিয়ে রোগা হয়ে যাচ্ছে এ বাঞ্ছার সহ্য হচ্ছে না। সুতরাং ফলিডল খেয়েই সে প্রাণ দেবে। ছকড়ির প্রেতাত্মা উল্লসিত। তার এতদিনের বাসনা পূর্ণ হতে চলেছে। আজ তার আত্মা মুক্তি পাবে। ঐ তো বুড়ো ফলিডলের শিশি বের করেছে — এইবার খাবে — হাঁ করেছে। হঠাৎ পদ্মর আর্তনাদ ঃ " ও দাদু - দাদুগো - কোথায় গেলে - "[১৩] ইতিমধ্যে কোঁৎকার নেতৃত্বে যুবদল শববহনের খাটিয়া নিয়ে এসে উপস্থিত। নকড়ি দত্তও প্রবল উৎসাহে উপস্থিত। এতদিনে 'বাগান' তার হয়েছে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই হঠাৎ দরজা খুলে বেরিয়ে আসে বাঞ্ছারাম! বোতল খুলে যখন সে ফলিডল মুখে ঢালতে যাবে তখনই যে নাত বৌ পদ্মর প্রসব বেদনা উঠল। মৃত্যুর পথ রোধ করে দাঁড়াল জীবন। আর সে কি করে মরে। তার যে তখন অনেক কাজ। তারই শব বহনের জন্য যে ধূপ অগুরু আনা হয়েছিল তা সে তুলে নিয়ে যায় শিশুর জন্য। কারণ ঃ " এসব জিনিস মরণেও যেমন লাগে জনমেও তেমনি লাগে।"[১৪] নকড়িকে সে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, মরা তার হবে না। যে শিশুকে নিজে নাড়ি কেটে পৃথিবীতে এনেছে

তাকে ভাসিয়ে দিয়ে তো সে মরতে পারে না । মরতে তো যায় বাঞ্ছা, কিন্তু ঃ " গাছপালা ... নাতিপুতি ... পুঁইপোনা ... সব মাথা ঝাঁকায় ... বলে বুড়ো, তোমা হতে আমরা সব হয়েছি ... তুমি আমাদের নক্ষে করেছো ... তুমি চলে গেলে আমাদের বাঁচাবে কেডা !"[১৫] বাঞ্ছা এখন আর একক নয়, সে বহু, সে সমগ্র। এভাবে রক্তচোষা বাদুড়ের মতো অন্যের রক্ত খেয়ে খেয়ে উঠে দাঁড়াতে ভালো লাগে না বাঞ্ছার, কিন্তু চারপাশের সবাই যে তাকে ছাড়তে চায় না। তাই নকড়ির দিকে ফলিডলের শিশি বাড়িয়ে ধরে সে বলে ঃ "তোমার ফলিডল - তুমিই বরং -"[১৬] নাটকের শুরু থেকে এই উক্তি পর্যন্ত এমন স্বাভাবিকতায় পৌঁছে দেন মনোজ মিত্র যে, বাঞ্ছার এই উক্তিকে একটুও আরোপিত বা অস্বাভাবিক মনে হয় না। জীবনের কাছে হেরে গেছে মৃত্যুর পরোয়ানাধারী নকড়ি, তাই তাকে সরে যেতেই হবে। কিন্তু ফলিডলের আগেই তার মৃত্যু হয়েছে হার্ট অ্যাটাকে। বাঞ্ছার জন্য আনা খাটেই সে ঢলে পড়েছে মৃত্যুর কোলে। মনোজ মিত্র কিন্তু এখানেই নাটক শেষ করেন নি। তাঁর প্রায় সব নাটকের শেষেই যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাঞ্ছা যখন নকড়ির মৃত্যু নিশ্চিত কিনা পরীক্ষা করে দেখছে, তখনই ঘরের ভেতর শোনা যায় নবজাতকের কান্না। মৃত্যু অতিক্রম করে এ যেন জীবনের ঘোষণা, অস্তিত্বের ঘোষণা। বাঞ্ছারাম কাপালি ঘরের দরজায় গিয়ে শিশুর উদ্দেশ্যে বলে নিজের বাগানের গাছ-পাখির কথা, বলে মৌমাছির গুঞ্জনের কথা, বলে মুক্তোর দানার মতো আমের বোল আর জলপাই পাতা বেয়ে ঝরে পড়া শিশিরের কথা। নকড়ির মৃত্যুতে যে বাগান ফিরে এসেছে বাঞ্ছার হাতে, সেই বাগান, সেই মাটি, সেই প্রাণ সে দিয়ে যাবে উত্তরপুরুষকে। শেষ সংলাপে পাঁচবার 'হ্যাঁ হ্যাঁ' এই অস্তি ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাঞ্ছা প্রতিষ্ঠা দেয় জীবনকে, মনোজ মিত্র প্রতিষ্ঠা করেন সদর্থক অস্তিত্বকে।

" একটি ভালো নাট্যের জন্ম হয় তার সেই সময় ও সমাজের প্রধান দ্বান্দ্বিক চিহ্নগুলির আলপনা গায়ে জড়িয়ে। "[১৭] বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্বের এই উচ্চারণ 'সাজানো বাগান' নাটকের পঁচিশ পেরনো উপলক্ষ্যে । কেমন ছিল সেই সময় ও সমাজ, যখন 'সাজানো বাগান' লেখা হচ্ছে ? রচনাকালের দিকে তাকালে বোঝা যাবে, মনোজ মিত্রের কলমে যখন ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে বাঞ্ছারামের অবয়ব তখন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষ করছে বিংশ শতাব্দীর সেই সত্তরের দশককে, যে দশক মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাসহীনতা, ষড়যন্ত্র, গুপ্ত হত্যা, রাজনৈতিক হানাহানি, জরুরি অবস্থা প্রভৃতি নেতিকেই স্মরণ করায়। মানুষের জীবনে তখন চরম অনিশ্চয়তা, বাতাসে বারুদের গন্ধ। কে কতক্ষণ বেঁচে থাকবে তার কোনো স্থিরতা নেই। সেই মৃত্যুগন্ধময় আবহে মনোজ মিত্র নিয়ে এলেন বাঞ্ছারামকে, যার জীবনের আসক্তি তীব্র। নিজের প্রবল বেঁচে থাকা দিয়েই যে হেলায় উপেক্ষা করে যায় সব প্রতিকূলতা। সব ষড়যন্ত্র, সব বিরুদ্ধ শক্তি অসহায় হয়ে পড়ে তার বেঁচে থাকার কাছে। সত্তরের দশকে এই নাটকের ব্যতিক্রমী ভূমিকা সম্পর্কে তাই সমালোচক বলেছেন ঃ

> " সেই সত্তর দশকে আমাদের প্রতি দৈনিকে বেঁচে থাকায় মৃত্যু এবং হত্যা সমাজকে ক্রমশ ছায়ার আবর্তে সংকীর্ণ করে তুলতে চাইছিল। তারই বিপরীতে দাঁড়িয়ে যখন বেঁচে থাকা এক বৃদ্ধকে দেখি তখন কোথাও আমাদের জীবনের বিস্তারের ইঙ্গিতকেই স্পষ্ট করে তোলে।"[১৮]

'সাজানো বাগান' নাটকে শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্বের একটা প্যাটার্ণ আছে, কিন্তু তা কখনোই বড় হয়ে ওঠেনি। কমেডির মধ্য দিয়ে এখানে জীবনের সত্যকে প্রকাশ করা হয়েছে। সে কমেডিও জীবনের

স্বাভাবিক চলন থেকেই উদ্ভূত। এই জীবন মনোজ মিত্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন ওপার বাংলায়। জীবনের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, বক্র রসিকতা ছিল তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলিতে। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

> "বক্র রসিকতার জায়গাটা এ নাটকে একটা মারাত্মক ব্যাপার। 'সাজানো বাগান' একটা মারাত্মক রসিকতা । মৃত্যু নিয়ে ঠাট্টা, হাসিঠাট্টার কথা এখানে ছুরি হয়ে বিঁধতে চেয়েছে। ঢাকার কুট্টি, সাতক্ষীরার চাষিদের নিজস্ব কথাবার্তায় এটা আমি গভীর ভাবে লক্ষ করেছি।" [১৯]

সমসাময়িক বাংলা নাটক যখন বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর বিদেশী নাটকের অনুবাদে মগ্ন তখন মনোজ মিত্র সম্পূর্ণ দেশজ উপাদানে নির্মাণ করলেন দেশজ জীবনের উপভোগ্য দলিল। এই জীবন ভূমিলগ্ন, এই জীবন বৃক্ষনির্ভর। গাছ-মাটি মিলে যে শিকড়ের টান তাকেই তিনি তুলে ধরতে চাইলেন এই নাটকে। বাঞ্ছারাম সেই ভূমিলগ্ন মানুষ, নিজের জীবনের বেশিরভাগ সময়টাই যে কাটিয়েছে গাছ-গাছালির পরিচর্যা করে আর জমিদারের শ্যেনদৃষ্টি থেকে বাগান রক্ষা করে। এই ভূমিলগ্নতার আর এক অর্থ মরণাপন্ন ভূমিজীবী মানুষেরাই জীবনের লড়াইয়ে জিতবে। বাঞ্ছার মধ্য দিয়ে সে ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে। জীবনের পড়ন্ত বেলায় নিঃসঙ্গ বাঞ্ছারামের পরম মমতার ধন বাগানখানি। অনেক লোভ, অনেক স্বার্থপরতার হাত থেকে এই বাগানকে রক্ষা করতে হয় অশক্ত বাঞ্ছার। অশক্ত বাঞ্ছা এখানে সাধারণ কৃষক শ্রেণির প্রতিনিধি। জমিদার-জোতদার তার জমি কেড়ে নিতে চায়। এ চিরকালের প্রথা। 'সাজানো বাগান' সেই প্রথার বিরুদ্ধে জেদি লড়াই – যে লড়াইটা তাত্ত্বিক মতে আরম্ভ হবে কোনোদিন এবং শেষ হবে এই পরিণামে। বাঞ্ছাকে কত অনায়াসে পাঠক-দর্শকের সঙ্গে একাত্ম করে দেন মনোজ মিত্র। কোনো স্লোগানে বা বক্তৃতায় নয়, নিছক অনাড়ম্বর বাস্তব জীবনের ছবি এঁকেই সকলকে করে তোলেন বাঞ্ছার লড়াইয়ের সহমর্মী। বাঞ্ছাকে সরিয়ে দেবার জন্য স্বার্থান্বেষীদের যে চক্রান্ত তা হাসাতে হাসাতেই চোখে জল এনে দেয়। হাসির আড়ালে এই নাটকে অশ্রুর যে মুক্তোবিন্দু টলমল করে ওঠে তাই একক বাঞ্ছারামকে করে তোলে বহু মানুষের সহযাত্রী।

নকড়ির সঙ্গে বাঞ্ছার মাসকিস্তির চুক্তি হবার পর থেকেই নকড়ি উদ্‌গ্রীব বাগানের দখল পেতে। কিন্তু ক্রমেই বাঞ্ছার মৃত্যু পিছিয়ে যাচ্ছে, তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে আরো অনেকের স্বার্থ। তাই বারবার সময় বাড়াতে হচ্ছে — প্রথমে চারমাস – তারপর পৌষ পর্যন্ত – তারপর ফাল্গুন। বাঞ্ছা ক্রমেই বাড়িয়ে নেয় জীবনের সীমা। সে তো আর নিজের জন্য বাঁচতে চাইছে না, চাইছে তার ওপর নির্ভরশীল অসহায় মানুষগুলির জন্য। সে মরে গেলে তারা যে আশ্রয়হীন। কিন্তু এভাবে বেঁচে থাকতেও বাঞ্ছার ভালো লাগে না। চোর ছ্যাঁচোড়ের জন্য এই ঘেন্নার পরমায়ু তাকে ধোপার গাধার মতো বয়ে বেড়াতে হচ্ছে, বারবার কথার খেলাপ হয়ে যাচ্ছে। বাঞ্ছার এই কুণ্ঠা সে যেভাবে প্রকাশ করে তা মনোজ মিত্র কথিত সেই 'বক্র রসিকতা' ঃ

> "টাকাটা দেবেন কত্তা ! (কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপ) হে হে, কী অনাচার ! কী অনাচার ! চেরটাকাল আপুনারাই লোকের দরজায় তাগাদায় গেছেন — নোকে দিয়েছে — আপুনারা নিয়েছেন — আজ আপুনারা দেবেন — আমরা নেবো! (নকড়ি পকেট থেকে টাকা বার করে) ভাববেন না বাবু, ধরণী এ অনাচার বেশিদিন সইবে না ।" [২০]

নকড়ির টাকায় কেনা দস্তানাপরা হাত নকড়ির মুখের সামনে বাড়িয়ে ধরে বাঞ্ছা যখন মাসকিস্তির

টাকা চায় তখন কে শোষক আর কে শোষিত তাই যেন গোলমাল হয়ে যায়। বাঞ্ছার ক্রমশ সোজা হয়ে ওঠাকে চোর উপমিত করেছে ধনুক এবং তীরের সঙ্গে। সেই তীর যেন বিদ্ধ হচ্ছে নকড়ির হৃদয়ে। নিজের বেঁচে থাকা দিয়েই বাঞ্ছা হারিয়ে দিচ্ছে নকড়িকে। বাঞ্ছা খুব সরল বা আদর্শবাদী চরিত্র নয়, সে দোষে-গুণে ভরা মানুষ। মনোজ মিত্রের নাটকের চরিত্ররা কেউই এর বাইরে নয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাঞ্ছা ধূর্ত না সরল সেটা নকড়ির মতোই পাঠকও যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। পদ্মর প্রতি নকড়ি এবং কোঁৎকার আকর্ষণকে যখন সে কৌশলে স্বার্থরক্ষার কাজে ব্যবহার করে তখন তাকে ধূর্ত বলে চেনা যায় কিংবা সুইসাইড করতে রাজি হওয়ার আগে নকড়িকে একাধিক শর্তে আবদ্ধ করে নেওয়ার মধ্যেও তার কৌশলী পরিচয়ই প্রকাশ পায়। কিন্তু বাঞ্ছা যখন বলে ঃ " এই মরি এই মরি -- আজ মরি না কাল মরি বারবার লোকটার কাছে আমার কথার খেলাপ হচ্ছে -- আর নোকটা এইরকম রোগা হয়ে যাচ্ছে ! লজ্জায় তার দিকে আমি চোখ মেলে তাকাতে পর্যন্ত পারিনে !"[২১] তখন সত্যি সত্যি বোঝা দুষ্কর হয়ে ওঠে যে, এ বাঞ্ছার সত্যিকারের গ্লানি অথবা চাপা ব্যঙ্গ। এই নাটকে বাঞ্ছা শেষপর্যন্ত আর কোনো চরিত্র থাকেনি, হয়ে উঠেছে বিশেষ একটি idea-র দ্যোতক। সেই idea উচ্চারণ করে ঃ " আজ্ঞে ফলের আশায় কেউ কি সাজায় বাগান ! মাটি মাটি ! মাটি বলে আমারে সাজাও ... নিষ্কাম সাজাও ।"[২২] এই যে বারবার মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে আসা এবং মৃত্যুকে নিয়ে রসিকতা করা - এ আসলে জীবন- রসিকতারই ফল। নিজের পরিচিত এক নাটকের বন্ধু দেবাশিস দাশগুপ্ত আর বাঞ্ছারাম চরিত্রের মধ্যে এই জীবন-রসিকতা দেখেছেন বলে জানিয়েছেন মনোজ মিত্র ঃ

> "না জানি ওরা কেমন করে বুঝতে পেরেছিল, ওদের জীর্ণ রূপ দুঃখদুর্দশা আধি ব্যাধি ত্রাস লাজ ভয় -- কোনওটাই ওদের নিজেদের নয়। সব আর এক জনের। ওরা কেবল ভাণ করছে ওদের বলে। ভাণ করছে মরবে বলে। আসলে মরবে আরেকজন। নিজেরা ওরা সবকিছুর বাইরে -- সুন্দর পবিত্র সুখী শিশু। ওরা যেন -- লীলয়া দ্বিতীয়ম ঐচ্ছৎ।"[২৩]

নিজেকে এভাবে নিজের থেকে পৃথক করে নিতে পারলেই জীবনকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব, যেমন দেখেছে 'সেঞ্চুরি বুড়ো' বাঞ্ছারাম। সমকালের নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যমঞ্চে অভিনন্দিত হয়েছে এই জীবনদৃষ্টিই। সব জটিলতা-স্বার্থপরতা-হানাহানির মাঝেও জীবনের যে সহজ প্রবাহ বহমান তাই এই নাটকের অন্বিষ্ট। ওপার বাংলায় নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ সহজ জীবনপ্রবাহকে মনোজ মিত্র সঞ্চারিত করে দিয়েছেন 'সাজানো বাগান'-এ, যে জীবনে চোর গৃহস্থকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেয় এবং বাগান নিয়ে চুক্তিবদ্ধ হবার আগে মালিক তার সঙ্গে 'কনসাল' করেনি বলে অভিযোগ জানায়। কারণ সে মনে করে, দীর্ঘদিন চুরি করার সুবাদে বাগানের ওপর তারও একটা 'নাইট' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রসন্ন জীবনদৃষ্টির কারণেই গুপী-পদ্ম-চোরের বাঞ্ছাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা স্বার্থপরতা বলে চেনা গেলেও তা ক্রূর বলে মনে হয় না। বাগান থেকেই চুরি করা মুরগির ডিম যখন চোর বাঞ্ছাকে খাওয়াতে চায় তখন স্বার্থপরতার চেয়ে অসহায়তার দিকটিই বেশি করে প্রকাশ পায়। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে তখন চোরেরও সহমর্মী হয়ে পড়েন পাঠক-দর্শক। এ নাটকে লোভ আছে, লোভের প্রতিরোধ আছে, স্বার্থপরতা আছে কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে আছে প্রবল জীবনাসক্তি। বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কলমে তারই স্বীকৃতি ঃ " লোভ, বেঁচে থাকার ইচ্ছে, স্বার্থ, ভালবাসা -- সব নিয়ে রামায়ণ-মহাভারত-টলস্টয়ের স্টাইলে এমন লুডো খেলা আর দেখিনি। সেই সঙ্গে বারাসত-বসিরহাট-টাকী-মালতীপুরের বাংলা উচ্চারণ। হাসি দুঃখ । আক্ষেপ।"[২৪] এই জীবনাসক্তির পাশাপাশি

স্বকীয় ভঙ্গিতেই মনোজ মিত্র দেখিয়েছেন সমকালীন সমাজের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি-ভন্ডামিকে। সরকারি অফিসে কালীপূজা, ডাক্তারের অপচিকিৎসা, যুবপার্টি বা পল্লী উন্নয়ন সমিতির নামে রাজনৈতিক খবরদারি এবং নেতৃত্বস্থানীয়দের অধঃপতিত চরিত্র কোনোকিছুই নাট্যকারের কটাক্ষ থেকে রেহাই পায়নি। 'চাক ভাঙা মধু'র পর পরিবর্তিত গ্রামজীবনের চিত্র তিনি আবার আঁকলেন 'সাজানো বাগান'-এ। এই নতুন গ্রামজীবনের জটিল বিন্যাস নাটকে উপস্থাপিত করার কৃতিত্বকে অভিনন্দিত করেছেন সমালোচক ঃ

> " বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, বিজন ভট্টাচার্যের গ্রামকে পেছনে রেখে এসে নতুন গ্রাম জীবনের জটিল ছককে বাংলা সাহিত্যেও আয়ত্ত করার উল্লেখযোগ্য চেষ্টা খুব বেশি নেই। সেদিক থেকেও আধুনিক নাটকে 'সাজানো বাগান' স্মরণীয় প্রয়াস হয়ে রইল।" [২৫]

এই নাটকের চরিত্রসৃজন, সংলাপ, রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুক প্রভৃতি সবই পৃথক অধ্যায়ে আলোচিত হবে, তবে এখানে কেবল এটুকু বলার যে, এসব কিছুর যথাযথ সমবায়ে মনোজ মিত্র যে যথাযথ নাটক গড়ে তুলতে পেরেছেন সেটাই তাঁর প্রধান কৃতিত্ব। সমকালের বাংলা নাটকে বক্তব্যের চাপে রূপনির্মাণ যখন গৌণ হয়ে পড়েছে তখন মনোজ মিত্র দেখালেন, শিল্পরূপ অক্ষুণ্ন রেখেও কীভাবে বক্তব্যকে প্রোথিত করে দেওয়া যায়। বাইরে হাসির আবরণ থাকলেও ভেতরে বক্তব্য গভীর এবং সে বক্তব্য হাসির তোড়ে হারিয়ে যায় না। বরং অনেকক্ষেত্রেই দেখা গেছে, মুখর হাসির পর কত সহজেই উচ্চারিত হয়ে গেছে গভীর কথাটি। জমিদার-জোতদারের দীর্ঘ শোষণের কথা যখন বলে বাঞ্ছা কিংবা নকড়ির দিকে বাড়িয়ে ধরে ফলিডলের শিশি, তখনও তার বক্তব্যকে ভার মনে হয় না বক্র রসিকতার কারণেই। সোস্যাল স্যাটায়ার রচনানৈপুণ্যে কোন চরম মাত্রা পর্যন্ত যেতে পারে তার সার্থক দৃষ্টান্ত 'সাজানো বাগান'। সমকালে এই নাটক তাই উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন লাভ করেছে। 'দেশ' পত্রিকার বক্তব্য যেন 'সাজানো বাগান' সম্পর্কে সমকালের জনমানসের প্রতিফলন ঃ

> " এমন একটা নাটক যেখানে বক্তব্য অন্তঃ সলিলা, হাসির স্রোতে ভাসতে ভাসতে দর্শকের মনে অজান্তেই গভীর নাটকীয় বক্তব্য প্রোথিত হয়ে যায়। যে ধরণের মৌলিক নাটকের জন্য আমাদের অহল্যা-প্রতীক্ষা, সাজানো বাগান সেই প্রার্থিত নাটক।" [২৬]

শুধু সমকাল নয়, 'সাজানো বাগান'-এর আবেদন চিরকালীন। কারণ জীবনের আবেদন কোনো দেশ-কালের গন্ডীতে আবদ্ধ নয়, সেই চিরকালীন মূল্যই স্বীকৃতি পেয়েছে নাটক রচনার পঁচিশ বছর পর ঃ " শিলালিপির মতো এই নাটক, কালের পটে উজ্জ্বল এর অক্ষরগুলি, স্থির বাণীতে চিরকালের গীতি, কালসমুদ্র পেরোনোর একটি ডানা।"[২৭]

'রাজদর্শন' (১৯৮১)-এর লম্বোদর ভট্ট বাঞ্ছারামের মতোই জীবনপিয়াসী কিন্তু বাঞ্ছারামের মতো সে উৎপাদক নয়, সে সংগ্রাহক। ভালো খাওয়ার প্রতি দরিদ্র এই ব্রাহ্মণের অপরিসীম লোভ, কিন্তু বিরাট সংসার প্রতিপালন করাই দুঃসাধ্য, ভালো খাবার জুটবে কোথা থেকে? ক্রোধ এবং হতাশায় সে সন্তানের জন্ম দেবার জন্য স্ত্রীকে দোষারোপ করে, নিজেই নিজেকে নির্বংশ হবার অভিশাপ দেয়। অযোধ্যা রাজ্যের এক প্রত্যন্ত গ্রামে লম্বোদরের বাস। গাঁয়ের কামার অভিরাম লম্বোদরের স্ত্রীকে মা ডেকেছে। সেই সুযোগে লম্বোদর মাঝে মাঝেই অভিরামের কাছে হাত পাতে। অযোধ্যার

সিংহাসনে আসীন রাজা নন্দ। রাজকার্যে তার বিন্দুমাত্র মন নেই, দেবদ্বিজে ভক্তি নেই, কেবল স্বার্থরক্ষা এবং রমণীবিলাস। রাজার দুর্বলতার সুযোগে রাজ্যে মাথাচাড়া দিয়েছে বিদ্রোহ, রাজ পরিবারের মহলে মহলে চলছে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র । সেই ষড়যন্ত্রে রাজার ভাই চন্দ্রকেতু এবং ছোটোরাণী যশোমতীও যুক্ত, রাজাকে হত্যা করে চন্দ্রকেতু চায় রাজত্ব আর রূপবতী রাণীকে। এদিকে রাজকর্মচারীরা হয়ে উঠেছে স্বেচ্ছাচারী। রাজ্যের জলসত্রে মদ বিক্রি হচ্ছে আর সেখানে বিনে পয়সায় তা পান করছে রাজার সৈন্যরা, প্রত্যন্ত গ্রামেও মুরলীধরের মতো কর্মচারীরা রাজস্ব আদায়ের নামে অত্যাচার চালাচ্ছে সাধারণ মানুষের ওপর। সর্বোপরি নন্দ রাজার ওপর পড়েছে শনিদেবের কোপদৃষ্টি। এক অজানা রোগে নন্দরাজা ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছেন, সব চিকিৎসক জবাব দিয়ে গেছেন। এখন ব্রাহ্মণদের দান করে তাদের আশীর্বাদের জোরে নিজের আয়ুর সীমা বাড়াতে চান নন্দ, যদিও দানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হবে প্রজাদের ওপর 'বিশেষ কর' চাপিয়েই। দিন নির্দিষ্ট হয়েছে আগামী শুক্লা পঞ্চমী। এই সংবাদ পেয়ে লম্বোদর ভট্ট উল্লসিত। সেও যাবে অযোধ্যায়। কিন্তু অতদূরে নিজের পায়ে হেঁটে যাবার সাধ্য তার নেই। তাই অভিরামই একমাত্র ভরসা। পরজীবী এই ব্রাহ্মণকে কাঁধে করে অযোধ্যায় নিয়ে যেতে হবে অভিরামের এবং পথের খরচও জোগাড় করতে হবে নিজের কামারশালা আর হাপর বেচে। অভিরাম প্রথমে রাজি না হলেও মুরলীধরের ভয় দেখিয়ে তাকে গ্রাম ছাড়তে রাজি করিয়েছে লম্বোদর আর তার কাঁধে সওয়ার হয়ে তারই পয়সায় পথের সব খরচ চালিয়ে শুক্লা পঞ্চমীর আগের রাতে তারা এসে পৌঁছেছে অযোধ্যায়। ভাঁড়ুদাসের জলসত্রে তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে রাজার দুই সৈন্য ব্যাঘ্রমল্ল-ভীমভল্লের। অভিরামকে তারা পীড়ন করতে গেলে লম্বোদর ছাতা ঘুরিয়েই তাদের হটিয়ে দেয়। অভিরামের শেষ সম্বল একটি কড়ি দিয়ে একঘটি মদ খেয়ে গরিব জীবনের শেষ দিনটাকে তারা বড়লোকের মতো বিদায় করতে চায়। কিন্তু কপালের লিখন খণ্ডাবে কে! হঠাৎ সেই রাতেই মারা যায় নন্দরাজা। অথৈ জলে পড়ে লম্বোদর-অভিরাম। সেই ঘোর বিপদে তাদের সামনে উপস্থিত হন সাক্ষাৎ মহাশনি। তাদের দুঃখের কথা শুনে তিনি ব্যবস্থা দিলেন লম্বোদর বা অভিরামের মধ্যে যে কোনো একজন মরলে তিনি সেই আত্মাকে মৃত নন্দের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেবেন। এদিকে দেহ রক্ষিত থাকবে, নন্দের বেশে দানধ্যান করে আবার মৃত্যুবরণ করলেই আত্মা পুরনো দেহে ফিরে আসতে পারবে। দু'জনের মধ্যে কে মরবে তা নিয়ে টানাপোড়েনের পর গলায় ফাঁস দিয়ে মৃত্যুবরণ করে লম্বোদর আর তার দেহ পাহারার দায়িত্বে থাকে অভিরাম।

যে কুব্জা দাসী ছিল নন্দরাজার ধাই, যে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে নন্দরাজাকে, সে-ই চন্দ্রকেতুর ভয়ে বিষ দিতে বাধ্য হয়েছে রাজা নন্দকে। নইলে চন্দ্রকেতু হত্যা করবে কুব্জার সন্তানদের। রাজার মৃতদেহ পড়ে আছে অনাদরে, রাণীরা সব রত্নভাণ্ডারের চাবি সন্ধানে ব্যস্ত। এমত সময়ে হঠাৎ উঠে বসে নন্দরাজার মৃতদেহ, হৈচৈ পড়ে যায় রাজবাড়িতে। কেউ চূড়ান্ত হতাশ, কেউ বা নবজীবনপ্রাপ্ত রাজাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আখের গোছাতে ব্যস্ত। নন্দের দেহধারী লম্বোদরের অবস্থা এদিকে করুণ। ভয়ে সে দিশেহারা। তার আচরণের অস্বাভাবিকতা কারো নজর এড়ায় না। প্রথম সে আত্মসমর্পণ করে দুই দেহরক্ষী ব্যাঘ্রমল্ল-ভীমভল্লের কাছে। তারা প্রশিক্ষণ দিয়ে লম্বোদরকে রাজার উপযোগী মাপের করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয় স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে। যতদিন পর্যন্ত রাজার পাগড়ি মাথায় ঢলঢল

করছিল ততদিন পালাতে চাইছিল লম্বোদর, কিন্তু যেদিন পাগড়ি বসল আঁট হয়ে সেদিন সে অনুভব করল রাজত্ব করার সুখ। এদিকে অভিরাম আর মড়া আগলে রাখতে পারছে না। রাজপ্রাসাদে সে ঢুকতেও পারে না। অনেক কষ্টে চুরির দায়ে ধরা পড়ে একদিন সে নীত হ'ল নন্দর দেহধারী লম্বোদরের কাছে। ফিরিয়ে নিয়ে যাবার অনেক চেষ্টা করলেও লম্বোদরকে তখন গ্রাস করেছে ক্ষমতার মোহ, নারীর মোহ। তাছাড়া নিয়ে যাবার মতো কিছু সে গোছাতেও পারেনি। তাই আরো কিছুদিন মৃতদেহ আগলাতে হবে অভিরামকে। এদিকে ক্রমশ প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, নন্দরাজার দেহে আসলে লম্বোদর। কিন্তু এই জাল নন্দকে সামনে রেখেই সকলে কাজ হাসিল করে নিতে চায়। তাই গাঁটছড়া বাঁধে জাল নন্দের সঙ্গে! নন্দরূপী লম্বোদর চালটা ধরতে পারেনি, তাই সেও উল্লসিত। আর পুরনো দেহে সে ফিরবে না। নিজের মৃতদেহ সে এখন নষ্ট করে ফেলতে চায়। কিন্তু অভিরাম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ধর্মবাপকে সে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেই, মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেবেই। তাই অভিরাম ছুটতে থাকে লম্বোদরের ধড় নিয়ে আর পিছু পিছু ছোটে নন্দরাজার বাহিনী। ধড়ের জন্য পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে পঞ্চ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা। মগধ নগরীর পথ ধরেছে অভিরাম। তাকে ধরতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে সন্দেহজনক ঘরবাড়িতে, শস্যক্ষেত্রে, গ্রামের পর গ্রামে। দ্রুতবেগে আগুন ছুটছে আর মড়া কাঁধে অভিরাম ছুটছে বন জঙ্গল নদী ডিঙ্গিয়ে। এদিকে রাজ্যে চরম অরাজকতা। বন্যায় বিধ্বস্ত একটি অঞ্চল, দুস্কৃতীর শাস্তির বিধান প্রায় উঠেই গেছে, রত্নের লোভে দাক্ষিণাত্য বিজয়ে পাঠিয়েছিলেন যে বাহিনীকে, তারা পরাজিত হয়েছে। কেবল সেনাপতি ভাঙা পা নিয়ে ফিরেছেন, বিশাল বাহিনী ধ্বংস হয়েছে। এদিকে রাজ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছে। মৌর্য বৃষল বিদ্রোহের নেতা। সে এগিয়ে আসছে প্রাসাদের দিকে। আক্রমণ করেছে প্রাসাদ, জ্বালিয়ে দিয়েছে আগুন। সেনাপতি মহামাত্য সকলেই পালিয়ে গেছে রাজাকে ছেড়ে। রাজা এখন জাঁতাকলে পড়েছেন। চারদিকে আগুন। জ্বলছে রাজার বাহন অশ্ব ধূম্রকেশর। প্রাণপণে রাজা এখন অভিরামকে ডাকছেন কিন্তু অভিরামের বদলে এসে উপস্থিত হয়েছে কুব্জা। নিজের সন্তানের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সে এবার ছুরিকাঘাতে হত্যা করবে জাল নন্দকে। কিন্তু নিজেরই দেহের বিরুদ্ধে নন্দ ওরফে লম্বোদর যে লেলিয়ে দিয়েছেন সৈন্য। সুতরাং এদিকে মরলে ওদিকে বেঁচে ওঠা যাবে কিনা তাও নিশ্চিত নয়। তাই মরতে সে ভীত। কুব্জাকে সে 'মা' বলে ডাকে কিন্তু কুব্জা আজ নির্দয়। এই জাল লোকটির জন্যই সে হারিয়েছে সন্তানদের। তাই ছুরি হাতে সে ধাওয়া করে নন্দকে। এদিকে অভিরাম লম্বোদরের মৃতদেহ নিয়ে আবার ফিরে এসেছে সেই গ্রামের গাছতলায়। আর তখনই এসে তাকে ধরেছে মুরলীধর। এ মড়া মহামূল্যবান। পঞ্চ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা এর পুরস্কার। মুরলীধর যখন লম্বোদরের মৃতদেহের পা ধরে টানতে থাকে তখনই হঠাৎ বেঁচে ওঠে লম্বোদর। আত্মা এবার নন্দের দেহ ছেড়ে ফিরে এসেছে নিজের দেহে — বগলের ফোঁড়ায় টাটানো উপলব্ধি করে লম্বোদর নিশ্চিত হয়েছে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে। কিন্তু আত্মীয়-পরিজন বাসস্থান সব জ্বলে পুড়ে গেছে নন্দরাজার লাগানো আগুনে। শকট ভরে দান আনার লোভে গিয়েছিল যে লম্বোদর, আজ সে নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল। কিন্তু মনোজ মিত্র শেষ পর্যন্ত আশাবাদী। তাই অনুতপ্ত লম্বোদরকে আশার বাণী শোনায় অভিরাম। অভিরামের ধর্ম মা অর্থাৎ লম্বোদরের স্ত্রী মরেননি, তিনি পদ্মপাতায় মালপো ভেজে অপেক্ষা করছেন। নাটকের এই মধুর সমাপ্তিতে সত্য হয়ে থাকে অভিরামের উক্তি ঃ

"কেন কাঁদছ বাপ, কেন কাঁদো ? দুখানা হাত রয়েছে! আবার ঘর গড়বে! হাত দুখানা তো ভিক্ষে করার তরে পাওনি, পেয়েছ চালনা করার জন্যে ... তাই করবে! নিজের ঐশ্বর্য নিজে গড়বে!... কেন মিছে হাত বাড়াও! যা তোমার, তারে তুমি চিনে নাও! ... ও ঠাকুর বাবা, চেয়ে দ্যাখো তোমার ন্যাড়া গাছেও কেমন পাতা বেঁধেছে ... কেমন ঝুপসি হয়েছে ... ফল আসছে গো ... শিগগিরই ফল আসছে ..." [২৮]

এই উক্তিতেই চিরদিনের শেকড়হীন পরগাছা লম্বোদরের চেতনা জাগে। অভিরামের কাঁধে চেপে যেতে যেতে সে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে ঃ "ওরে ও অভিরাম, নামা....আমায় নামিয়ে দে! ঐ দ্যাখ সবাই আমার দিকে কিরকম কটমট করে তাকাচ্ছে। না, আর তোর পিঠে না, এবার হেঁটে যাবো।"[২৯] লম্বোদরের এই মাটিতে নেমে আসাতে, এই স্বাবলম্বী হয়ে ওঠাতেই নাটক শেষ করেন মনোজ মিত্র।

বাইরের দিকে থেকে রাজাকে দর্শন বলে মনে হলেও এই নাটক আসলে বলে রাজার দর্শনের কথা। সেই দর্শন হ'ল ক্ষমতা উপভোগ এবং স্বার্থপরতার দর্শন। এই দর্শন কোনো ব্যক্তিনির্ভর নয়, পদনির্ভর। পাগড়ি যেই আঁট হয়ে বসে মাথায়, অমনি জেগে ওঠে মোহ, জেগে ওঠে ক্ষমতার দম্ভ। এই ব্যবস্থার কাছে দেবতাও অসহায়। তাই শনিদেব নন্দের প্রাণ নেবার পর লম্বোদরকে সেই দেহে প্রবেশ করালেও প্রজাদের অবস্থা আরো খারাপ হয়। 'শিবের অসাধ্যি'তে আমরা দেখেছিলাম, জোতদারকে পরাস্ত করতে ব্যর্থ শিব এই আশা করেছিলেন যে, ছিদেমরাই একদিন লড়াই করে সুদিন ফিরিয়ে আনবে ঃ "পারবি পারবি... পারলে তোরাই পারবি ! কিছু করতে হলে তোদেরই করতে হবে! লেগে পড় ! উল্টেপাল্টে দে।"[৩০] 'রাজদর্শন'-এও শনিদেব শেষপর্যন্ত বলেছেন ঃ "দেবতা যদ্যপি পারে বদলাতে রাজা.... পারে না বদলাতে শাসন, এমনি এ মজা!"[৩১] এই শাসন বদলাতে হবে সাধারণ মানুষকেই। তাই দেবতার অহং ত্যাগ করে শনিদেব আহ্বান জানিয়েছেন বৃষলকে। আশা করেছেন, দরিদ্রের এই সন্তান দারিদ্র্য দূর করতে সক্ষম হবে, হতশ্রী আত্মসুখসর্বস্ব অযোধ্যাপুরীকে ধ্বংস করে সেখানে যে নতুন জীবন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। 'শিবের অসাধ্যি'-তে 'পরের কাছা'কে বর্জনীয় বলে মনে করেছিলেন মনোজ মিত্র, এখানেও সেই একই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণের প্রতিনিধি বৃষলের সিংহাসন লাভের মধ্য দিয়ে নতুন জীবনাদর্শের ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে। এদিকে রাজা হয়েই লম্বোদর নিজের পুরনো জীবন ভুলে যেতে চেয়েছে, নিজের মৃতদেহ ধ্বংস করে ফেরার সম্ভাবনা রুদ্ধ করতে চেয়েছে কিন্তু তা হতে দেয় নি অভিরাম। নিজের জীবন বিপন্ন করেও সে লম্বোদরের মড়া আগলেছে, যখন রাজার জীবন দুর্বিষহ মনে হয়েছে তখন লম্বোদর যে আবার পুরনো দেহে ফিরে আসতে পেরেছে সে অভিরামের জন্যই। মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে এই অভিরামদের গুরুত্বই প্রতিষ্ঠা করতে চান। কাল্পনিক ইতিহাসের পটভূমিতে রচিত এই নাটকে তিনি আসলে ধরতে চেয়েছেন সমাজকেই। অযোধ্যার রাজা হিসেবে নন্দের কথা বলে তিনি আসলে রামরাজ্যের ধারণার সঙ্গে ইতিহাসের অত্যাচারী রাজা নন্দের বৈপরীত্য সৃষ্টি করতে চেয়েছে। রাজা তথা সিংহাসনের যে বৈশিষ্ট্য এবং রাজপুরীর যে ষড়যন্ত্রের কথা বলেছেন তা আসলে সমসাময়িক জীবন থেকেই উদ্ভূত। ইতিহাসের সূত্রে এভাবে সমসাময়িকতাকে গেঁথে মনোজ দেখাতে চান, অতীত আর বর্তমানে জীবনের মৌলিক বৃত্তিগুলি আসলে একই। রাষ্ট্রব্যবস্থা যে অপরাধীকে অপরাধ করার সুযোগ দিয়ে তারপর নিজে সুযোগ নেয় তা দেখানো হয়েছে ব্যঘ্রমল্ল-ভীমভল্ল চরিত্রের মধ্য দিয়ে। রাজা নন্দ মারা যাবার

পর পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্যেও মনোজ মিত্র দেখেছেন সমকালের কূটনীতি। যে চন্দ্রকেতু বিষ প্রয়োগে রাজাকে হত্যা করেছে সেই দিয়েছে সবচেয়ে বড় পুষ্পার্ঘ্য। নন্দবেশী লম্বোদর কোনো ব্যয়ের মধ্যে যেতে চান না, যতটা পারেন গুছিয়ে নিয়ে যাওয়াই তার লক্ষ্য, রাজত্ব এবং রাজসিংহাসন রক্ষার দায় তার নেই। এই সূত্রেই তিনি কটাক্ষ করেন সমসাময়িক অস্থির রাজনৈতিক অবস্থাকে ঃ "যে সব রাজার অন্তরে ভয় থাকে, সিংহাসন যখন তখন ওল্টাতে পারে, তারা শুধু গোছানোর পথ ধরে।"[৩২] রাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিকতা, স্বজনপ্রীতি, ত্রাণ তহবিলের দুর্নীতি, উৎকোচ গ্রহণ কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। নন্দরাজার স্পষ্ট কথা, নিজের লোক ছাড়া কাউকে তিনি কাজ দেবেন না। আর ঃ "নিজের লোক হলে কোনরকম যোগ্যতার দরকার নেই। মাসান্তে মনে করে বেতনটি নিয়ে যেও বৎস।"[৩৩] স্মর্তব্য যে, মনোজ মিত্র একথা বলছেন ১৯৮১ সালে, যখন কিছুদিন আগেই পশ্চিমবঙ্গে শাসক-বদল ঘটেছে। কিন্তু দূরদর্শী নাট্যকার বুঝে গিয়েছেন, শাসক বদলালেও আসলে শাসনব্যবস্থার গুণগত কোনো পরিবর্তন ঘটে না। রাজা যে রঙের জামা গায়েই আসুক না কেন, প্রজার 'দিন বদলায় না'। ঐ পাগড়ি আঁট হয়ে বসা পর্যন্তই যেটুকু অপেক্ষা। রাষ্ট্র পরিচালনায় নীতি-নৈতিকতা বজায় রাখার চেয়ে অনেক বড় যে গদি রক্ষা করা, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই নাট্যকার মহামাত্যকে দিয়ে বলিয়ে নেন ঃ "রাজত্ব রক্ষা করতে গেলে পিশাচের সঙ্গেও গাঁটছড়া বাঁধতে হয়।"[৩৪] এই ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব কেবল আত্মার জাগরণে, শুদ্ধ চৈতন্যের জাগরণে। সেই জাগরণ ঘটাতে পারে অভিরামের মতো মানুষেরাই। যতদিন লম্বোদরের মতো মানুষের আত্মা লোভের বশে বাঁধা থাকবে সিংহাসনের কাছে ততদিন চৈতন্যের জাগরণ সম্ভব নয়। মনোজ মিত্র বিশ্বাস করেন, মানুষের চৈতন্যের জাগরণ ঘটবেই। সেই জাগরণের ছবিতেই তিনি নাটক শেষ করেন। একে সদর্থক ইচ্ছেপূরণ বলে মনে হতে পারে কিন্তু এটাই মনোজীয় বৈশিষ্ট্য। তবে এই পর্যায়ে তিনি নাটককে নিয়ে যান সব নাটকীয় শর্ত রক্ষা করেই।

'নৈশভোজ' (১৯৮৪-'৮৫) রচনার বাস্তব প্রয়োজনাত্মক দিকটির কথা উল্লেখ করেছেন মনোজ মিত্র তাঁর একটি রচনায়। দীর্ঘদিন থেকে এই নাটকের ভাববীজ ছিল তাঁর মনে কিন্তু একটি বাস্তব পরিস্থিতি এর রূপগ্রহণকে ত্বরান্বিত করল। ১৯৮২ সালের দিকে কয়েকটি নাট্যদল অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর বিপরীতের ময়দানে খোলা আকাশের নিচে নাট্যাভিনয়ের সিদ্ধান্ত নেন। সেই আয়োজনে মনোজ মিত্রের দল 'সুন্দরম্'ও ছিলেন। তিনি লিখেছেন ঃ

> "A spot was chosen. There was a solitary not-very-tall tree on the site. I decided to make use of the tree in its natural setting and to take all the characters there." [৩৫]

সেই গাছকে কেন্দ্রে রেখেই রচিত হ'ল একাঙ্ক 'নৈশভোজ'। পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার সময়ও নাট্যকার জঙ্গলের মধ্যে কাঁঠাল গাছটিকেই একমাত্র 'সেট' হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কুন্ডু বাবুদের সেই কাঁঠাল গাছের তলাতেই মধ্যরাতে হাজির হয়েছে একজোড়া শেয়ালসহ অনেকগুলি মানুষ। গাছে পেকে আছে রসভরা কাঁঠাল। উপবাসী শেয়াল হুক্কা এবং হুয়া অপেক্ষায় আছে সেই কাঁঠাল মাটিতে পড়ার। কিন্তু ভাগীদার সেখানেও। চোর ছকু নয়নতারাকে নিয়ে এসেছে সেই কাঁঠালগাছের নীচে। নিজের বৌ রেলে কাটা পড়ে মারা যাবার পর নয়নতারাকে সে ভালোবাসে। নয়নতারা তুষ্টু চামারের

মেয়ে। এই মেয়ে ছাড়াও তুষ্টুর আছে এক পঙ্গু ছেলে। কিন্তু সংসারের দিকে নজর নেই তুষ্টুর। মাথায় জটা পড়েছে বলে তাকে বলে 'সাধু তুষ্টু'। এই নামের মোহে পড়ে ভগবান নিয়ে ক্ষেপে উঠেছে তুষ্টু। জীবনধর্ম উপেক্ষা করে সে আচার-ধর্ম নিয়ে মেতেছে। চেয়ে-চিন্তে পঙ্গু ভাইয়ের খাবার এবং চিকিৎসার খরচ যোগাতে হয় নয়নতারাকেই। সময়ে-অসময়ে ছকুই তাকে দু-একটা টাকা দেয়। তাই ছকুর ডাক সে উপেক্ষা করতে পারে না। আজও ভাইয়ের চিকিৎসার পয়সার জন্য সে এসেছে ছকুর পিছুপিছু। ছকুর আর নিজের পয়সা কোথায়। কুন্ডুবাবুদের কাঁঠাল গাছই ভরসা। এই গাছ থেকে গোটাকয়েক কাঁঠাল নামিয়ে বেচে দিতে পারলেই টাকা। ছকু আর নয়নতারা মিলে সবে একটা কাঁঠাল নামিয়েছে তখনই উপস্থিত তুষ্টু। নিজের মেয়েকে সে কিছুতেই চৌর্যবৃত্তি করতে দেবে না, এতে যে 'সাধু তুষ্টু'র অপমান। ছকুর সঙ্গে মেয়ের বিয়েও সে দেবে না। কারণ ছকু মদ খায়, জুয়া খেলে, চুরি করে এবং নিজের বৌকে সে ধাক্কা দিয়ে রেল লাইনে ফেলে দিয়েছে বলেই তুষ্টুর বিশ্বাস। চুরি করা কাঁঠাল আবার বেঁধে রাখতে গাছে ওঠে তুষ্টু। এই সুযোগে ছকু প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠেছে। নয়নতারার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় 'সাধু তুষ্টু'কে অপদস্থ করার সুযোগ সে ছাড়বে না। চিৎকার করে সে লোক জড়ো করেছে। তুষ্টু তখন গাছের ওপর, হাতে তার ছেঁড়া কাঁঠাল – তাকে চোর প্রমাণ করতে আর কী লাগে। ঢ্যাঙা চৌকিদার এবং তারপর একে একে স্বর্গীয় নারায়ণ কুন্ডুর তিন পক্ষের তিন ছেলে চক্রধর, গদাধর এবং ধ্বজাধর এসে উপস্থিত হয়েছে। যে জমির ওপর এই গাছ সেই জমি এবং গাছ আসলে কোন্ ভাইয়ের ভাগে তা নিয়েই বিবাদ আছে। প্রত্যেকেরই দাবী, তাদের নিজের নিজের মাকে এই গাছ ভোগের অধিকার দিয়ে গিয়েছিলেন স্বর্গীয় নারায়ণ কুন্ডু। ফলে চক্রধরের ধরা 'চোর' তুষ্টুকে গদাধর আবার গাছে তোলে নিজে ধরে রাইট এস্টাব্লিশ করবে বলে। গাছের অধিকার নিয়ে তিন ভাইয়ের দ্বন্দ্ব যখন চরমে তখনই ঢ্যাঙা হঠাৎ আবিষ্কার করে গাছের ওপর থেকে ঝুলছে তুষ্টু চামারের নিরালম্ব দুই পা – তুষ্টু অপমান থেকে বাঁচতে 'গলায় দড়ি দিয়েছে'।

হুক্কা এবং হুয়া কাঁঠালতলায় সুবিধে না পেয়ে গিয়েছিল তুষ্টুর বাড়িতে। তুষ্টুর পঙ্গু ছেলেটাকে টেনে নিয়ে আসার মুহূর্তে নয়নতারা দিয়েছে ঠ্যাঙার বাড়ি। লেজের আঘাত নিয়ে গাছতলায় ফিরে আসার পরই তাদের চোখে পড়েছে তুষ্টুর ঝুলন্ত দেহ। ব্যথা ভুলে তারা আনন্দে মেতে উঠেছে। আজ রাতে জবর ভোজ হবে তুষ্টুর দেহ দিয়ে। তুষ্টুর হাঁড়িতে ভাত ছিল না বলে কোনোদিন তার হাঁড়ি মারা যায় নি, আজ নিজেই আত্মহত্যা করে সে ভোজের আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু মানুষের লাশে শেয়ালের চেয়ে মানুষের লোভ আরো বেশি। আর সে লোভ কী একজনের! দীর্ঘদিন থেকে তুষ্টুর ভিটের ওপর নজর ছিল চক্রধরের। এতদিন সফল হয় নি, আজ মৃত তুষ্টুর আঙুলের ছাপ নিয়ে ভিটেমাটি গ্রাস করবে বলে লাশটা তার প্রয়োজন। মেজভাই গদাধর কঙ্কাল পাচারের ব্যবসা করে, সুতরাং লাশটা তার চাই। ছোটোভাই ধ্বজাধর ভোটে জিতে পঞ্চায়েত প্রধান হতে চায়, তাই লাশটা তার সবচেয়ে বেশি দরকার। কে না জানে, যে যত বেশি লাশ জোগাড় করতে পারে, রাজনীতিতে তার সম্ভাবনা তত বেশি উজ্জ্বল। লাশের ওপর নজর আছে তান্ত্রিকেরও, সে চায় নরমুন্ডের ওপর বসে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে। এদিকে সব লাশের অলিখিত মালিক পেশাদার মস্তান বাবলা মুখার্জী এসে উপস্থিত। এই লাশ তার কাছে 'আমদানি'র উপায়। তিন ভাইয়ের কাছ থেকেই টাকা খায় বাবলা এবং এক লাশ থেকেই তিন ভাইয়ের প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা করে দেয়। সে তিন ভাইকে বোঝায় : "তোমাদের

তিনজনের মা আলাদা আলাদা কিন্তু বাপ তো একজন! ঈশ্বর নারায়ণ কুন্ডু। কেন ভুলে যাও, তোমরা সেই একই নারায়ণের হাতের ধ্বজাগদাচক্র।''[৩৬] বাবলা মিলিয়ে দেয় হিসেব – প্রথমে চক্রধর নেবে মৃত তুষ্টুর টিপছাপ, তারপর ধ্বজাধর সেই 'বডি' নিয়ে মিছিল করবে আর শেষে গদাধর তুষ্টুর দেহ চালান করবে। সকলে যখন সাফল্যের আনন্দে মশগুল তখন বেঁকে বসে ঢ্যাঙা। এক গরিব দাঁড়ায় আর এক গরিবের পক্ষে। তুষ্টুর দেহ সে কাউকে নিতে দেবে না। সে সরকারি চৌকিদার। তার সামনে থেকে তুষ্টুর লাশ কেউ নিতে পারবে না। এই সময় সকলকে চমকে দিয়ে গাছ থেকে নেমে আসে জ্যান্ত তুষ্টু। গাছের ওপর থেকে তার সত্যদর্শন ঘটেছে। নিচে তাকিয়ে দেখেছে জগতের স্বার্থপরতা আর ওপরে দেখেছে সন্তানের জন্য শকুনের মমতা। নিজের সন্তানদের ক্ষতি করতে গেছে ভেবে শকুন তুষ্টুর জটা খাবলে ছিঁড়ে দিয়েছে, তুষ্টুকে করেছে নির্ভার। সে বুঝেছে, সবচেয়ে বড় ধর্ম নিজের সন্তানদের রক্ষা করা। তীব্র আক্রোশে সে বলেছে ঃ

> ''এই খ্যাতায় তোরা আমার টিপছাপ নিবি... তো এই খ্যাতায় আমি আমার জুতোর হিসেব রাখব। এই ব্যাগে আমার মড়া ভরবি ... তো এই ব্যাগে আমি আমার জুতো সেলাই এর যন্ত্রপাতি ভরব। (ফ্ল্যাগটা তুলে) আর এটা থাকবে তুষ্টু চামারের জুতোর দোকানের মাথায়।''[৩৭]

সাধের ভোজ ভেস্তে যায় শেয়ালের, ভেস্তে যায় শেয়ালরূপী মানুষের। শেয়াল এবং মানুষের গলাজড়াজড়ি করে কান্নার দৃশ্যে নাটক শেষ করে তীব্র রাগের প্রকাশ ঘটান মনোজ মিত্র।

থিমের দিক থেকে মোটামুটি এক হলেও 'সাজানো বাগান'-এ মনোজ মিত্র ছিলেন রসিক, আর 'নৈশভোজ'-এ তিনি প্রচন্ড রাগী। লোভী, স্বার্থপর মানুষ কীভাবে জন্তুর মতো প্রবৃত্তির দাস হয়ে পড়ে তা দেখাতে গিয়ে তিনি একজোড়া শেয়ালকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। গাছের তলায় নৈশভোজের কল্পনায় শেয়াল আর মানুষ একাকার হয়ে গেছে। উভয়ের কাছেই 'সবচেয়ে ভালো খেতে গরিবের রক্ত'। নাট্যকারের রাগ এখানে এত তীব্র যে, অন্যান্য নাটকের মতো কৌতুক বা অসহায়তার মিশ্রণে মন্দ চরিত্রগুলিকে সহনীয় করে তোলার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নি। চক্রধর-গদাধর-ধ্বজাধর-বাবলা-নিত্য-পলাশ চরিত্রগুলি এখানে অবিমিশ্র মন্দ। তিন পক্ষের তিন ভাইকে পিতা নারায়ণ কুন্ডুর হাতের চক্র-গদা-ধ্বজা বলে উল্লেখ করে পুঁজিবাদী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং ঘূণ ধরা রাজনীতির অশুভ আঁতাতের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন তিনি। চরিত্রের এই একমাত্রিকতা সম্পর্কে বলেছেন ঃ

> "The three characters, Chakradhar, Gadadhar and Dhwajadhar, depict three evil motives in man. They don't represent any class as such. That is why no positive human aspect is shown about them."[৩৮]

পক্ষান্তরে, ছকু বা ঢ্যাঙার মতো চরিত্রগুলি মানবিকগুণে ভূষিত। ছকু নিজের অপমানের প্রতিশোধ নিতে যেমন 'সাধু তুষ্টু'কে চোর অপবাদ দেয়, তেমনি আবার তুষ্টুর মৃত্যুতে নিজেকে অপরাধী জেনে অনুতপ্ত হয়। ঢ্যাঙা সরকারি চৌকিদার হয়েও চক্রধরের কাছ থেকে প্রতিদিন চারটে করে রুটি পেয়ে থাকে কাঁঠাল গাছ পাহারা দেবার জন্য কিন্তু সে অন্তরের সাযুজ্য অনুভব করে তুষ্টুর সঙ্গে। তুষ্টুকে চোর

হিসেবে আবিষ্কার করে ঢ্যাঙার প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। যে তুষ্টুকে এতদিন সে সাধু বলে জেনেছে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছে সেই তুষ্টুর অবনমন তাকে আহত করেছে। কারণ তুষ্টু যে ছিল তার বিশ্বাসের জায়গা, গরিব মানুষের বিশ্বাসের জায়গা। সেই বিশ্বাস আহত হয়েছে বলেই ঢ্যাঙার ক্ষোভ ঃ "নিজে আমি চাউকিদার হয়ে চোট্টামি করে খাই! তোরে দেখে ভাবতাম, আছে ... গরিবের ঘরে এখনো ধম্মো আছে! মার্ শালারে ... মার্।"[৩৯] সমাজ-রাজনীতির ভন্ডামির বিরুদ্ধে তীব্র ক্রোধ এবং ক্ষোভ এই নাটকে কটু ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণভাবে রাজনীতির বিচ্যুতির প্রতি খোঁচা আছে ঢ্যাঙার সংলাপে ঃ "নিজের দোষ তুমি ওপর মহলে চাপাতে চাইছ! চুরি করতে এসে তুমি রাজনীতি করছ! লোকে রাজনীতি করতে গে যা যা করে ... তুমি শালা চুরি করতি এসে তাই তাই করছ।"[৪০] ধ্বজাধরের উপস্থিতির পর মনোজ মিত্র দেখিয়েছেন, শোষিত, নিপীড়িত, সর্বহারা মানুষের প্রতি সহমর্মিতার কথা বলে যে রাজনীতি, সেই রাজনীতির লোকেরাও কীভাবে সর্বহারা মানুষকে ব্যবহার করে। শাসক পরিবর্তনে যে শাসন পরিবর্তন হয় না, ফলিত রাজনীতির বৈশিষ্ট্য বদলায় না, তা উপলব্ধি করেছেন মনোজ তখনই। তাই তাঁর নাটকে পলাশ-নিত্য-রফির মতো মস্তানদের ঘাড়ে ভর দিয়ে জননেতা ধ্বজাধর হাস্যোজ্জ্বল মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন আর তার মাথার ওপর ঝুলতে থাকে হৃদ্ধ গরিব তুষ্টু চামারের নিরালম্ব পা। সাধারণভাবেই মনোজ মিত্র দলীয় রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ বলে ধ্বজাধরের প্রতিদ্বন্দ্বী যে টেকো ব্রহ্মের কথা নাটকে বলা হয়েছে তার সম্পর্কেও কোনো উন্নততর ধারণা সৃষ্টি হয় না, তাকেও মুদ্রার অন্য পিঠ বলেই চিনিয়েছেন তিনি। রাজনীতির নীতিহীনতায় ক্ষুব্ধ নাট্যকার নিজের ক্ষোভ প্রকাশে কোনো আগল রাখেন নি, রাজনীতিকেরা তাঁর দৃষ্টিতে ধূর্ত শেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়, তাই তারা 'পলিটিশিয়াল'। দলীয় সংঘর্ষে মারা যায় সাধারণ মানুষ আর নেতারা দূরে বসে আঁচ পোহান। সংঘর্ষ বন্ধে তারা কখনোই আন্তরিক নন, কারণ এরকম সংঘর্ষই টিঁকিয়ে রাখে তাদের অস্তিত্ব। সেদিকেও কটাক্ষ করেছেন ঃ

"হুক্কা ।। দলীয় সংঘর্ষ! সেটা কী!

হুয়া ।। মহোচ্ছব ... মহোচ্ছব রে ছুঁড়া! তবে কিনা খরা বা বন্যেতে আমরা লাশ পাবো গোটা গোটা ... দলীয় সংঘর্ষে কাটা কাটা।

হুক্কা ।। ... দলীয় সংঘর্ষ কবে হবে বুড়ো।

হুয়া ।। হবে কিরে ... সংঘর্ষ চলছে অবিরত। ওটাই তো শেয়ালদের বাঁচিয়ে রেখেছে মুখ্যত।"[৪১]

রাজনীতিতে বাহুবলের অনুপ্রবেশ, মৃতদেহকে দলীয় এবং ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবে ব্যবহার করা প্রভৃতি সবকিছুই নাট্যকারের কটাক্ষের বিষয় হয়েছে। দরিদ্র মানুষ যে কেবল ভণ্ড রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং পচনশীল সামাজিক ব্যবস্থার দ্বারাই পীড়িত হয় তা নয়, ধর্মীয় কুসংস্কারও যে তাদের দুরবস্থার অন্যতম কারণ তা দেখিয়েছেন তিনি তুষ্টুর জীবনের মধ্য দিয়ে। জুতো সারাইয়ের তেল-কালি মাথায় ঘষতে ঘষতে যে জট বেঁধেছে, সংস্কারবশে তাকে 'জটা' বলে ধরে নিয়ে তুষ্টু সংসার বিস্মৃত হয়ে ঈশ্বরে দেহ-মন সমর্পণ করেছে। জীবন-বিচ্যুত এই ধর্মসাধনা যে কখনো সার্থক হতে পারে না, শেষ পর্যন্ত তা উপলব্ধি করেছে তুষ্টু। শকুনের বাৎসল্য দেখে সে বুঝতে পেরেছে নিজের কর্তব্য। উপলব্ধি করেছে যে, নিজের সন্তান এবং সংসার আগলে রাখাই সব চেয়ে বড় ধর্ম।

এই নাটকের বক্তব্য বলিষ্ঠ, নাটকীয় কৃৎকৌশল যথেষ্ট, মনোজ-সুলভ রঙ্গ-ব্যঙ্গ-রসিকতারও অভাব নেই, তা সত্ত্বেও যে 'নৈশভোজ' সৃষ্টি হিসেবে অবিস্মরণীয় হতে পারল না, তার প্রধান কারণ অতি প্রত্যক্ষতা। শোষক-শোষিতের যে লড়াই প্রকট হয়ে পড়েছিল বলে মনোজ মিত্র 'সাজানো বাগান'-এর প্রথম অভিনয়ের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন, সেই লড়াই-শোষণ এবং শেষ পর্যন্ত শোষিতের জয় দেখানোটাই 'নৈশভোজ' নাটকে খুব বেশি করে চোখে ঠেকে। জোড়া শেয়াল প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত কিন্তু সে ব্যবহার স্থূল। একেবারে শেষে তুষ্টুর সংলাপও কেমন যেন আরোপিত মনে হয়। আসলে এই নাটক তাঁর প্রচন্ড রাগের বহিঃপ্রকাশ। আর শিল্পী হিসেবে তিনি যেখানে রাগী তার চেয়ে তিনি অনেক বেশি সফল, যেখানে তিনি নিরাসক্ত অথচ জীবনের প্রতি প্রসন্ন কৌতুকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন।

বাঞ্ছারাম বা সাধু তুষ্টকে ব্যবহার করতে পারে নি স্বার্থান্বেষীরা, কিন্তু ব্যবহৃত হয়েছে ঘন্টাকর্ণ। নিজের ছোট্ট গ্রামে যে কিনু কাহার আর তার থিয়েটার দেখেছিলেন মনোজ মিত্র ছোটো বেলায়, সেই দেশজ আঙ্গিককেই তিনি তুলে ধরেছেন 'কিনু কাহারের থেটার'-এ। কিনুর দলে সে নিজেই নট নাট্যকার এবং মোশন মাস্টার। খোলা আকাশের তলায় ছেঁড়া চটের 'জাজিম' পাতা আসরে কিনুর দল অভিনয় করে স্বল্প আলো আর চড়া মেক-আপে। আধুনিক নাটকে যাকে 'অ্যালিয়েনেশন' বলা হয়, কিনুর দলের অভিনয়ে তা সবসময়ই ঘটত। নাটক থেকে জীবনে এবং জীবন থেকে নাটকে অনায়াস যাতায়াত কুশীলবদের। জীবন আর নাটক একাকার এই অভিনয়ে। পুরাণ-ইতিহাসে স্বচ্ছন্দ বিচরণ অশিক্ষিত কিনুর। এই কিনুর দলের একরাতের অভিনয়কেই তিনি হাজির করেছেন 'কিনু কাহারের থেটার'(১৯৮৮) নাটকে। পুরাণ বা ইতিহাস নয়, কিনু একবার লিখেছিল আদ্যন্ত কল্পকাহিনি 'ঘন্টাকর্ণ'। কিন্তু কোনোদিনই এই নাটক তারা সম্পূর্ণ অভিনয় করতে পারে নি। কারণ রসিক কিনু স্বভাবসুলভ তির্যক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছে মানুষের লোভ-লালসা-রুচি-সংস্কার, এমনকি শাসনব্যবস্থাকে পর্যন্ত। তাই কখনো রাজরোষ, কখনো গাঁয়ের জমিদারের শাসন, কখনো ভদ্রপাড়ার বাবু থিয়েটার, কখনো বা ধর্মগুরুর রক্তচক্ষু লন্ডভন্ড করে দিয়েছে 'ঘন্টাকর্ণ'-এর আসর। তেমনই এক অসমাপ্ত অভিনয়ের দৃশ্যরূপ এই নাটক। পাটের ফেঁসোর মশালের আলোয় সচিত্র পর্দার সামনে শুরু হয়েছে ঘন্টাকর্ণপালা-র অভিনয়।

কিনু কাহারের এই পালায় রাজা-উজির আছে, সাধু আছে, গণিকা আছে, ইংরেজ লাটসাহেব আছে আর আছে ঘন্টাকর্ণরূপী কিনু কাহার এবং ঘন্টাকর্ণের বৌ, বাস্তবেও যে কিনু কাহারের স্ত্রী। অন্য দুই স্ত্রীর মতো এই তৃতীয় পক্ষের জগদম্বাও কিনুকে ছেড়ে যাবার আগেই কিনু তাকে নিজের থিয়েটারের সঙ্গে 'বেন্ধে' ফেলেছে। কাল্পনিক পুতনা রাজ্যে অন্য সব কিছুর দায়িত্ব ইংরেজ সরকারের, কেবল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পুতনার রাজার। সেই কাজে রাজার সাফল্য-ব্যর্থতা বিচারের জন্য রাজসভায় আছেন লাটসাহেব, যার একমাত্র লক্ষ্য কোনো না কোনো ছুতোয় আইন-শৃঙ্খলার সঙ্কট দেখিয়ে বা সৃষ্টি করে রাজার সিংহাসন ফেলে দিয়ে নিজে সেই সিংহাসনে আসীন হওয়া। দিন কে রাত দেখেন যে উজির, তিনি দিনের বেলায় লন্ঠন হাতে উপস্থিত উদাসিনীর ঘরে। নাটকের উজিরের

মতো বাস্তবের অভিনেতা বদ্যিনাথও সুযোগসন্ধানী। উদাসিনী চরিত্রের অভিনেত্রীকে সে অভিনয়ের সুযোগ নিয়ে বুকে টেনে ধরেছে, এমনকি একটা চিমটিও কেটেছে। অভিনেত্রীও সপাটে কষিয়েছে এক চড়। নাটকের মধ্যে ঢুকে গেছে জীবন, অভিনয় পন্ড হবার জোগাড়। ডাকা হয়েছে মোশনমাস্টার কিনুকে। কিন্তু একদিকে শিষ্য বদ্যিনাথ আর অন্যদিকে শ্যালিকা – নিরপেক্ষ বিচার কিনু করে কি করে! তাই বিচারের ভার সে দিয়েছে পুতনার রাজাকে। শেষ দৃশ্যের রাজসভাকে নিয়ে এসেছে সামনে। সেই ভোররাতে 'পাট' বলে রাজা নিশ্চিন্তেই ছিলেন, হঠাৎ ডাকাডাকিতে হেঁচকি তুলতে তুলতে এসে উপস্থিত হলেন। তার ওপর বিচারের ভার দিয়ে অন্য সকলকে তাড়িয়ে নিয়ে কিনু গেছে পর্দার পেছনে। জীবন আবার ঢুকে গেছে নাটকের মধ্যে।

উজির যা করেছে তা অন্য কেউ করলে চোদ্দ ঘা চাবুকের শাস্তি হত, কিন্তু পুতনা রাজ্যে রাজা আর উজির পরম মিত্র, উভয়ে উভয়ের গোপন কথা জানেন – সুতরাং রাজা কিছুতেই উজিরকে শাস্তি দিতে পারেন না। বকেয়া কুড়ি হাজার মামলার সুরাহা হবার পর উজিরের মামলা ধরা হবে বলে তিনি উজিরকে সময় পাইয়ে দেন। এমনকি, তিনিই পরামর্শ দেন সাক্ষীসাবুদ জোগাড় করে প্রমাণ করে দিতে যে, যা ঘটেছে তা করেছে অন্য কোনো লোক, উজির নন। শুরু হ'ল খোঁজ, কে নেবে উজিরের অপরাধের দায়, কে পুতনা রাজ্যকে রক্ষা করবে আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা থেকে। আছে সাংসারিক বোধশূন্য, স্ত্রীগতবুদ্ধি বোকা ঘন্টাকর্ণ। কোনো কাজই সে পারে না, পেয়েছিল এক উলু দেবার চাকরি কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা গেল, তার গলায় উলুধ্বনি আর জাগছে না। সেই সময়ই উজির সাহেব এসেছেন টাকার থলি নিয়ে। তার অপরাধের দায় নিতে হবে ঘন্টাকর্ণকে। দরদস্তুর হয়েছে ঘন্টার বৌ-এর সঙ্গেই। চার থলি টাকার বিনিময়ে ঘন্টা গেছে উজিরের অপরাধ স্বীকার করে সাজা নিতে। নতুন চাকরি তার, তর যেন আর সয় না। যখন ফিরেছে তখন সে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত – হাতে টাকার থলি। বোকা মানুষের কাছে এই চাকরি খুব সোজা – মাথা খাটাতে হয় না, শুধু পিঠ পেতে দিতে হয়। ঘন্টার আবদারে বৌ এই চাকরির একটা নামও দিয়েছে – 'সাজাখেগো অফিসার'।

ঘন্টাকর্ণের মহা আহ্লাদ, পুতনা রাজ্যেও আইন-শৃঙ্খলার কোনো সমস্যা নেই। প্রতিদিন সকালে পেট ভরে ভাত খেয়ে জামার নিচে তুলোর জামা পরে, গালে পান দিয়ে দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়ায় ঘন্টাকর্ণ। চোর, ডাকাত, দাগী আসামীরা এসে ঘন্টার বৌ-এর সঙ্গে দরদস্তুর করে ঘন্টাকে ভাড়া নিয়ে যায়। সকলের অপরাধ মাথা পেতে স্বীকার করে নিয়ে সাজা ভোগ করে ঘন্টা। যেভাবে নিজের দেহে মানুষের পাপ ধারণ করে গণিকা উদাসিনী, সেভাবেই ঘন্টা নিজের দেহে ধারণ করে অসংখ্য অপরাধের বোঝা। তার জীবনের প্রথম উপার্জন এক দুষ্ট লোক আত্মসাৎ করেছিল উদাসিনীর নাম করে। সেই থেকে কেন যেন এই বোকা লোকটির প্রতি উদাসিনীর সহানুভূতি। ঘন্টা বেঁচে থাকলে যার সবচেয়ে বেশি অসুবিধে সেই লাটসাহেব উদাসিনীকে দায়িত্ব দিয়েছে ঘন্টাকে হত্যা করার। কিন্তু উদাসিনী পারে না ঘন্টাকে হত্যা করতে, এসে উপস্থিত হয় পুতনার রাজা। ঘন্টাকে বাঁচিয়ে রাখা যে তার নিতান্ত প্রয়োজন। দেড় হাজার মামলা সাত দিনে নিষ্পত্তি করার চরম সময়সীমা দিয়েছেন লাটসাহেব। সেইসব মামলার ভার চাপানো হয়েছে ঘন্টাকর্ণের ওপর। ঘন্টা অপরাধ স্বীকার করে যাচ্ছে, আর তার ওপর সাজা চাপানো হচ্ছে। এদিকে জগন্নাথের স্বপ্নাদ্য ছাগল মেরে ফেলার

অপরাধে রাজা নিজেই অভিযুক্ত। লাটসাহেব বিচার করে ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং এখন তো ঘন্টাকে আরো বেশি প্রয়োজন।

মরতে ঘন্টাকে হবেই – হয় লাটসাহেবের হাতে, নয় রাজার হাতে। লাটসাহেব তাকে মেরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় রাজার প্রধান সহায়কে সরিয়ে দিতে চান, আর রাজা নিজের অপরাধের দায়ে তাকে ফাঁসিতে চড়াতে চান। 'সাজাখেগো অফিসার' ঘন্টাকর্ণের সামনে চাকরিতে চরম উন্নতির সুযোগ। এতদিন সে ছোটখাট সাজা ভোগ করেছে, এবার একেবারে চরম শাস্তি – ফাঁসি। এ ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেবার ভার ঘন্টার বৌ-এর। যে বৌ-এর ঘর মণিমাণিক্যে ভরে যাবে বলে ঘন্টা ফাঁসিকাঠে মরতে রাজি হ'ল, সেই বৌ-কে লোভ দেখিয়ে বশ করেছেন রাজা। পৃথিবীর উঁচু লোকেদের দাবি নিয়ে গেছে নারীকেও। ঘন্টার বৌ এখন মহারাণী। আর সহ্য করতে পারে নি ঘন্টাকর্ণ। কোনো পাপ না করেও সে পাপী। তাই আজ সবচেয়ে বড় পাপ করে সব পাপকে সে হার মানাতে চেয়েছে। উদাসিনীর হাত থেকে ছুরি ছিনিয়ে নিয়ে বলেছে "আয়রে রাজা আয়রে উজির আয়রে লাটসাহেব ... তোদের বুকের রক্ত দিয়ে ধুয়ে দিই এ জীবনের যত ঘেন্না ... আয় আয় আয় ..."[৪২] কিন্তু ঘন্টার প্রতিশোধ গ্রহণ আর হয়ে ওঠে না। অন্য অনেক দিনের মতো এদিনের অভিনয়ও হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। নাটকে ব্যবহারের জন্য যে ছাগল আনা হয়েছিল এবং নাটকের শেষে 'ফিস্টি'র জন্য যাকে নাটকের মধ্যেই মেরে ফেলা হয়েছিল সেই ছাগল ছিল দারোগাবাবুর। তাই কিনুর আসরে পুলিশ ঢোকে। বেপরোয়া লাঠি চালিয়ে আসর লন্ডভন্ড করে দেয়। নির্জন শূন্য প্রান্তরে ভেঙেচুরে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে কিনু কাওরার সঙের আসর। 'বিধ্বস্ত নৌকার ছেঁড়া পালের মতো' চাঁদের আলোয় ভেসে যেতে থাকে ছেঁড়া পর্দা – কিনুর আসরের পৃষ্ঠপট।

১৯৮৩ সালে লেখা 'কিনু কাহারের থিয়েটার' নামক প্রবন্ধের মধ্যেই আছে এই নাটকের বীজ। মনোজ মিত্রের ছোটোবেলায় নিজের চোখে দেখা কিনু মাস্টারের থিয়েটার ছিল একালের 'ওয়ান-ওয়াল থিয়েটার'-এর সমধর্মী, চিরন্তন থিয়েটারের মতোই প্রতিবাদী। জীবন আর থিয়েটার কিনুর আসরে একাকার ঃ "নাটক না জীবন, বিলিফ না মেক-বিলিফ, রিয়েল না মাইমেসিস, মায়া না মতিভ্রম – সব গুলিয়ে দিয়ে কিনু কাহার হামেশাই আশ্চর্য এক ভুলভুলাইয়া সৃষ্টি করত।"[৪৩] কিনুর থিয়েটারে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-বক্রোক্তি ছিল, কিন্তু বোঝা যেত না যে, সে বুঝে খোঁচা দিচ্ছে না বোকামি করে কোনো কথা বলে ফেলছে। কিনুর এই ভঙ্গিটিই মনোজ মিত্র গ্রহণ করেছেন তাঁর নাটকে। বোকা ঘন্টাকর্ণ মাঝে মাঝেই এমন কথা বলেছে, যা শুনে বোঝা কঠিন, সে ভেবে বলে না হঠাৎ বলে ফেলে। নিজেকে তার মনে হয়, মন্দিরের সেই ডালিম গাছটার মতো, যার গায়ে মানুষ মানত করে অজস্র ইট-পাথর ঝুলিয়ে দিয়েছে। মানুষের পাপের মানত ঝুলছে ঘন্টাকর্ণর সর্বাঙ্গে। সে পাপের ভারে নড়তে-চড়তে পারে না। আকস্মিকভাবেই ঘন্টা বলে ফেলে চরম সত্য – প্রতিটি মানুষই আসলে কোনো না কোনোভাবে ব্যবহৃত। তার মুখেই উচ্চারিত হয় ঃ "পশুতে তো চেষ্টা করেও মানুষের পাপ ধারণ করতে পারে না ... মানুষ ছাড়া মানুষের গতি নাইরে ... পুণ্যেও নাই পাপেও নাই।"[৪৪] আধুনিক নাটকে যেখানে দর্শককে নাটকের অঙ্গীভূত করে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা দেখা যায়, তখন কোনো চেষ্টা ছাড়াই বোকা ঘন্টাকর্ণ পাঠক-দর্শকের সহানুভূতি পেয়ে যায়। চাকরিতে যাবার জন্য উৎসুক ঘন্টা।

পৃথিবীতে সেও যে কিছু কাজ করতে পারে, তা প্রমাণ করার জন্য ঘন্টার মরিয়া চেষ্টায় জাগে বিষণ্ণ কৌতুক। 'দুহাতে অন্ধকার ঠেলে' রক্তাক্ত শরীরে ঘন্টাকর্ণ যখন টাকার থলি হাতে 'চাকরি' থেকে ফেরে তখন জেগে ওঠে নিজেদের ব্যবহৃত হবার যন্ত্রণা। দরজা ধরে রাস্তামুখো হয়ে দাঁড়ানো ঘন্টাকর্ণ যেন হয়ে ওঠে মানুষের ব্যবহৃত সত্তার প্রতীক। সংসারে সকলেই যেন দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে খদ্দেরের আশায়। চাকরিতে যেন নেশা ধরে গেছে ঘন্টার। খদ্দের আসতে দেরি হলে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বউকে অনুযোগ করে ঃ "তোর বড্ড খাঁই! একটা পয়সা কমাতে চাস না! সেই কখন থেকে সেজেগুজে রেডি হয়ে রয়েছি! ... আজ আমারে একটু কম দামে ছাড়বি ..."[৪৫] ইঁদুরে কাটা দেড় হাজার মামলা রাজা চাপাতে চান 'সাজাখেগো অফিসার' ঘন্টার ওপর। চাকরিতে এই উন্নতি দেখে ঘন্টা মহা উল্লসিত কিন্তু তার উল্লাসে পাঠক-দর্শকের চোখের কোণে ঘনিয়ে ওঠে অশ্রুবিন্দু ঃ "বৌ, একসঙ্গে দেড় হাজার মামলার আসামি আমি! আমি দেড়হাজারি সাজাখেগো অফিসার। উঃ কার মুখ দেখে দরজা ধরেছিলুম রে! চলেন মহারাজ ..."[৪৬] এই হিউমারই মনোজের প্রধান অবলম্বন। এই হিউমার প্রয়োগেই সার্থক হয়ে ওঠে ফাঁসি যাওয়া নিয়ে বৌ-এর যুক্তি এবং বিরুদ্ধ যুক্তির মাঝে হাঁফিয়ে ওঠা ঘন্টার সংলাপে ঃ

> "আর বুঝতে পারিনে। ওগো তুমি মোরে একটা সিদ্ধান্ত দাও ! ... একবার ফাঁসিকাঠে চড়ে মরো, একবার নেমে বাঁচো ... বাঁচা মরার মধ্যে আমি যে আর বাঁদরের মতো ওঠানামা করতে পারিনে গো। কোন্‌টা করবো বলো ... একটা বলো ..."[৪৭]

কিনুর এই থিয়েটারে রাজা-উজির আছে, সাধু আছে, গণিকা আছে, স্বপ্নে পাওয়া ছাগল আছে। এদের সকলকে নিয়ে মনোজ মিত্র গেঁথেছেন চিরন্তন শোষণ ও স্বার্থপরতার কাহিনি। গেঁথেছেন ঠিক সেইভাবে, যেভাবে ইংরেজ শাসনের শেষদিকে গাঁ-ঘরে তিনি শুয়োর চরানো কিনু কাহারকে 'থিয়েটার' করতে দেখেছিলেন। নাটকের মধ্যে নাটক নির্মাণের কৌশলটি তিনি চমৎকারভাবে ব্যবহার করেছেন। বৈদ্যনাথ, পঞ্চা, নজরুল প্রভৃতি যাদের নিয়ে কিনুর থিয়েটারের দল তাদের কেউ ছিঁচকে চোর কেউ বা হতদরিদ্র। কিনুর থিয়েটারে তারাই রাজা-উজির-লাটসাহেব। এই থিয়েটার নিতান্ত অশিক্ষিতের দীন-দরিদ্র থিয়েটার। সিংহাসন এখানে রংচটা টিনের বাক্স, চামড়ার বেল্টের কাজ এখানে চলে পাটের দড়িতে। অর্থ সংগ্রহের জন্য থিয়েটারের মধ্যেই লখিন্দরের চিকিৎসা বা কামছাগলের দুধের বিনিময়ে 'কালিকশান' করতে হয়। কিন্তু মনোজ মিত্র দেখাতে চান, যতই দীন হোক না কেন – প্রতিবাদী বক্তব্যে এই থিয়েটারও পিছিয়ে ছিল না। এই থিয়েটারও দেখিয়েছে শক্তিশালীর সঙ্গে দুর্বলের সেই চিরন্তন লড়াই, যে লড়াই উদাসিনীর ষাঁড়ের সঙ্গে ঘন্টাকর্ণের লড়াই এর মতো, ঘন্টাকর্ণ যেখানে 'যুঝতে ও পারে না – পালাতেও পারে না'। থিয়েটারের সমস্যা, লোকশিক্ষায় থিয়েটারের ভূমিকা ইত্যাদি বহু বিচিত্র বিষয় এসেছে এই নাটকে, এসেছে মূল কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই। নাটকে কুসংস্কারে বিশ্বাস দেখাতে নেই, আবার স্বপ্নাদ্য ছাগলের কথা বলে 'কালিকশান' না করলেও পেট চলে না। এই উভয়সঙ্কটের সমাধানে এগিয়ে আসে কিনু কাহার ঃ "তবে আমি দিলে দোষ নাই। আমি তো ঘন্টাকর্ণ! পরের পাপ নিজ অঙ্গে বহন করি! গুরুদেবের এই পাপটা আমি বহন করলাম।"[৪৮] মুহূর্তে বাস্তবের কিনু ঢুকে যায় নাটকের ঘন্টাকর্ণের মধ্যে। জীবন আর নাটক মিলেমিশে যায়। থিয়েটারের ছেলেদের 'ফিস্টি'র প্রয়োজনে নাটকের মধ্যেই ছাগল মেরে ফেলা হয়, সেই ছাগল মারার অপরাধেই পুতনার রাজার ফাঁসির আদেশ হয়। কোরাস বা জুড়ির দলের মতো বাজনদারেরা কিনুর থিয়েটারে

কখনো সভাসদ, কখনো কিনুর প্রতিবেশী, কখনো বা ডাকাত। আধুনিক কালের ব্রেখ্ট-অনুসারী নাটকের মতোই এরা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্ররূপে আসরে অবতীর্ণ হয়েছে। বাংলা থিয়েটারে যখন বিদেশী নাট্যকলার প্রতিধ্বনি তোলাটাই অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন একান্তভাবেই দেশজ নাট্যকার মনোজ মিত্র দেখিয়েছেন, এই নাট্যকলা আমাদের দেশের মাটিতেই ছিল অনেক আগে থেকে। তাঁর আক্ষেপ ঃ

> ''অতিরিক্ত বিদেশমুখিনতায় একটা অত্যন্ত জরুরি কাজ আমরা অবহেলা করেছি। দেশের মাটিতে ছড়িয়ে থাকা দেশজ নাট্যকলার পুনরুদ্ধার সাধন করিনি, তার বিবর্ধনে সচেষ্ট হই নি। তার মৌলশিক্ষা গ্রহণ করে তাকে আমাদের নবনাট্যের বার্তাবহ করে তুলিনি।''[৪৭]

এই আক্ষেপ থেকেই তিনি দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন নিজের কাঁধে। অশিক্ষিত দরিদ্র নিম্নবর্ণের জীর্ণ মলিন থিয়েটারকে ধুলো ঝেড়ে উপস্থিত করেছেন পাঠক-দর্শকের দরবারে। কিনু কাওরার সঙের tone এবং tune অক্ষুণ্ণ রেখেছেন মনোজ। অসঙ্গতি, অসম্পূর্ণতার ওপর কোনোরকম মার্জনার প্রলেপ দেন নি। বেশ কিছু গান ব্যবহার করে এই ধরণের দেশজ নাট্যাঙ্গিকের আবহটি রক্ষা করেছেন। ঐতিহ্যের মধ্যে মনোজ সন্ধান করেছেন চিরন্তন সত্য – থিয়েটারের প্রতিবাদী রূপ। যুগে যুগে থিয়েটার যে মানুষের ভণ্ডামির মুখোশ ছিঁড়েছে, সীমিত ক্ষমতা নিয়েও রুখে দাঁড়িয়েছে অন্যায়-অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে, বারবার আক্রান্ত হয়েও যে বিচ্যুত হয়নি নিজের আদর্শ থেকে, তা-ই এই নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন মনোজ মিত্র।

থিয়েটারের এই প্রতিবাদী সত্তার পাশাপাশি ব্যবস্থার কাছে অসহায় এবং ব্যবহৃত মানুষের যন্ত্রণা ফুটিয়েছেন তিনি ঘন্টাকর্ণ চরিত্রের মাধ্যমে। ঘন্টার মতো চরিত্ররা সব যুগে সব সমাজেই থাকে, যারা অন্যের পাপ নিজের দেহে ধারণ করে, যাদের বুদ্ধিহীনতার সুযোগ নিয়ে কিছু মানুষ অবলীলায় অপরাধ করে চলে। উদাসিনী আর ঘন্টাকর্ণকে পাশাপাশি স্থাপন করে ব্যবহৃত হবার গল্প গেঁথে তুলেছেন। দরজা ধরে রাস্তামুখো হয়ে দাঁড়ানো ঘন্টাকর্ণের মধ্যে আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের identity করি। ঘন্টাকর্ণের মতোই আমরা সামাজিক ষাঁড়েদের আক্রমণে দিশেহারা – যুঝতেও পারি না, পালাতেও পারি না – শুধু পড়ে পড়ে মার খাই। কিন্তু মার খেতে খেতে যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায় তখন ব্যবহৃত মানুষই রুখে দাঁড়ায়। যেমন দাঁড়িয়েছে ঘন্টাকর্ণ। রাজা-উজির-লাটসাহেবের বুকের রক্তে নিজের ধিক্কৃত জীবনের সব পাপ-ঘৃণা ধুয়ে দিতে চেয়েছে। আকস্মিকভাবে ঘন্টাকর্ণের এই রুখে দাঁড়ানো আরোপিত মনে হতে পারে কিন্তু এই নাটককে বিচার করতে হবে কিনু কাওরার সঙের মাপে, আধুনিক নাগরিক থিয়েটারের সূক্ষ্মতা আশা করা যেখানে সঙ্গত নয়। এখানেও গ্রামীণ স্থূলতাকেই রক্ষা করেছেন মনোজ মিত্র, কিন্তু সেজন্য বক্তব্য তরল হয়ে যায়নি। ঘন্টাকর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু কিনু তার থিয়েটারকে ব্যবহৃত হতে দেয় নি। এর ফলে তার আসর ধ্বস্ত হয়ে গেছে, কোনোদিন সম্পূর্ণ অভিনয় করার সুযোগ সে পায়নি। ব্যবহৃত হবার গল্প বলে কিনুর থিয়েটার আসলে ব্যবহৃত না হবার কথা বলতে চায়। এই প্রতিবাদের সূত্রেই কিনু কাওরার সঙ হয়ে ওঠে আধুনিক নাট্য আন্দোলনের সহযোদ্ধা।

ঘন্টাকর্ণ ব্যবস্থার দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে, আর 'আত্মগোপন' নাটকে অর্পণ-স্বপ্নময়রা স্বেচ্ছায় ব্যবহৃত হয়েছে। সামাজিক যে মূল্যবোধের অবক্ষয় মনোজ মিত্রকে ব্যথাতুর করেছে, 'আত্মগোপন'(১৯৯৪) নাটকে সেই অবক্ষয়কেই দেখেছেন ভিন্নতর প্রেক্ষাপটে। ফুটবল মাঠের নোংরামির পাঁকে জড়িয়ে গিয়ে কিভাবে নষ্ট হচ্ছে প্রতিভা, নিজেদের দর বাড়াতে গিয়ে কিভাবে বেশ্যার মতো হাপ্‌সে মরছে ফুটবলাররা, স্বজনের আত্মত্যাগ বিস্মৃত হয়ে কিভাবে আত্মকেন্দ্রিকতার আবর্তে ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে, নিজের দর বুঝতে না পেরে অপেক্ষা করতে করতে কিভাবে শেয়ার বাজারের মতো মুখ থুবড়ে পড়ছে – এসব কিছু নিয়েই এখানে নাটক গেঁথে তুলেছেন। দেখিয়েছেন, সংসার আসলে এক বিরাট বাজার। এখানে প্রত্যেকেই নিজের দর যাচাই করছে, সুযোগ বুঝে দর বাড়িয়ে নিচ্ছে। যারা সুযোগ নিতে ব্যর্থ হচ্ছে তারা হারিয়ে যাচ্ছে, ফুরিয়ে যাচ্ছে। ঘরের মধ্যেই উঠে এসেছে বাজার, একে অস্বীকার করার সাধ্য কারো নেই। কিন্তু এই বাজারসর্বস্বতার মধ্যেও তিনি খুঁজে পান এমন কিছু শুভানুধ্যায়ীর হাত, যা পঙ্কিল আবর্তে তলিয়ে যেতে থাকা মানুষকে টেনে তোলে আত্মপ্রত্যয়ের একখন্ড দৃঢ় ভূমিতে।

ময়দানের চির প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দল আগমনী এবং দিগ্বিজয়ীর ফুটবল ম্যাচের একটি টেলিবর্ণনার মধ্য দিয়ে নাটক শুরু হয় আগমনীর দুর্দান্ত স্ট্রাইকার অর্পণ ওরফে অপার ড্রয়িংরুম থেকে। খেলা দেখছে অপার স্ত্রী পাঞ্চালী এবং কাজের লোক যমুনা। অর্পণ কিন্তু আজ খুবই খারাপ খেলছে, সামনে শূন্য গোল পেয়েও গোল করতে পারছে না। আগমনীর সমর্থকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। নিশ্চিত জেতা ম্যাচ আগমনী হেরেছে ৩-০ ব্যবধানে। পাঞ্চালী কাজের মাসিকে সাবধান করেছে, একরাশ মন খারাপ নিয়ে ফিরবে অর্পণ। অর্পণ বাড়িতে এসেছে, কিন্তু মনখারাপ নিয়ে নয়, বরং প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবের দুই কর্মকর্তা তুষার সেন আর লাড্ডু ঘোষের সঙ্গে হাসতে হাসতে। পাঞ্চালীকে বিস্মিত এবং আহত করেছে এই সংবাদ – অর্পণ ঘুষ খেয়ে ম্যাচ ছেড়ে দিয়েছে দিগ্বিজয়ীকে এবং আসন্ন দলবদলে সে আগমনীর দ্বিগুণ টাকায় দিগ্বিজয়ীতে সই করতে চলেছে। দিগ্বিজয়ীর কর্তারা পাঞ্চালীকে তুষ্ট করতে পাঁচ হাজার টাকা দামের কাঁথা স্টিচের একটি শাড়িও এনেছে। কিন্তু পাঞ্চালী তো স্বপ্নময়ের স্ত্রী নমিতা নয়, সে অন্য ধাতুতে গড়া। সে জানে, অর্থের লোভে প্রতিভা কিভাবে অপচিত হয়। তাই অর্পণকে সে আগলে রাখতে চায় মাঠের নোংরামি থেকে, পাঠাতে চায় জাতীয় প্রশিক্ষণ শিবিরে। অর্পণকে ঘিরে যে অনেক স্বপ্ন তার।

নাট্যকাহিনি এগিয়ে চলার মধ্য দিয়েই উঠে আসে অনেকগুলি তথ্য। পাঞ্চালী প্রথমে বিয়ে করেছিল রাজর্ষিকে, যার মধ্যে একজন বড় চিত্রপরিচালক হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সে ভেবেছিল, তার একের পর এক ছবি ফ্লপ করলেও বড়লোক বাবার মেয়ে পাঞ্চালী নতুন ছবি তৈরির অর্থ যোগান দিয়ে যাবে। এই নিশ্চিন্ততাই তার সর্বনাশ করেছে। লড়াই, জিদ সব শিথিল হয়ে পড়েছে। ক্রমে সে সেক্স-ভায়োলেন্সের রগরগে ছবির জগতে নেমে গেছে। রাজর্ষির গ্রাস থেকে মুক্তি পেয়েছে পাঞ্চালী ডিভোর্সের মাধ্যমে, তবে সন্তান বুবাইকে ছাড়তে হয়েছে সেজন্য। রাজর্ষির সঙ্গে যখন মামলা চলছে ডিভোর্সের, তখনই একদিন পাঞ্চালীর নজরে পড়ে খোলা মাঠের প্লেয়ার অর্পণ। এক নজরেই সে চিনেছে অর্পণের ভেতরের আগুনকে। নিজের গাড়িতে তুলে নিয়েছে প্রথম দিন আর তারপর নিজের

জীবনেও। বয়সে প্রায় সাত-আট বছরের ছোট অর্পণকে সে বিয়ে করেছে। নিজে চাকরি করে, সংসারের সব ঝামেলা মাথায় নিয়ে অর্পণকে সে এগিয়ে দিতে চেয়েছে খেলার জগতে। বেহালার একান্নবর্তী পরিবার থেকে তুলে নিয়ে এসেছে ভি.আই.পি. রোডের ওপর ফ্ল্যাটবাড়ির তিনতলায়। বেহালার বাড়িতেও বেশি যেতে দেয় না তাকে। দারিদ্র্য এবং দাদার অসুস্থতা দেখে ডিপ্রেশনে ভোগে অর্পণ, এর ছাপ পড়ে তার খেলায়। গভীর রাতে ফাঁকা রাস্তায় খুন হতে দেখে গুন্ডাদের শায়েস্তা করতে গিয়েছিল অর্পণের সাহসী দাদা। সাতদিন পর ওকে একটা ভাঙাবাড়ির ঘুপচি ঘর থেকে উদ্ধার করে এনেছিল পুলিশ। সেই আতঙ্ক থেকেই মানুষটা অস্বাভাবিক। কখনও গলা খুলে কথা বলে না, শ্রোতার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে। এই সমস্ত বাধা-বিঘ্ন-প্রতিকূলতা থেকে আড়াল করে অর্পণকে ফুটবল-সাধনায় মগ্ন দেখতে চেয়েছিল পাঞ্চালী। কিন্তু সে আশা তার সফল হয় নি। দুনিয়াজোড়া গড়াপেটার খেলায় জড়িয়ে পড়েছে অর্পণও। পাঞ্চালীর অভিভাবকত্ব এখন তার কাছে অসহ্য। পাঞ্চালীর জন্যই নিজের উপযুক্ত দাম আদায় করতে পারছে না — এমনি তার ধারণা। সেই ম্যাচ হারার রাতেই তাই স্বপ্নময়কে এগিয়ে দিতে গিয়ে স্বপ্নময়ের ট্যাক্সিতে সে চড়ে বসে — গিয়ে ওঠে এক গোপন ডেরায়। পাঞ্চালীকে ফোন করে জানায়, কোন ক্লাবকেই চূড়ান্ত কথা না দিয়ে কৌশলে যেন সে অর্পণের দর বাড়াতে থাকে, যেভাবে স্বপ্নময়ের দর বাড়াচ্ছে তার স্ত্রী নমিতা।

বিশাল এক অট্টালিকার ছাদের কুঠুরিতে এরপর দেখা যায় অর্পণ আর স্বপ্নময়কে। এই বাড়ির প্রতিটি খোপে খাপে চলে পৃথিবীর আদিমতম ব্যবসা। সন্ধ্যার পর এই বাড়িতেই যেন উঠে আসে বাজার। এখানেই লুকিয়ে থেকে নিজেদের দর বাড়াতে চায় অর্পণ-স্বপ্নময়, ঠিক যেভাবে এই বাড়িতে লুকিয়ে থেকে শেয়ারের দর বাড়ার জন্য অপেক্ষা করেন বিভূতিবাবু। কিন্তু কতক্ষণ অপেক্ষা করবে মানুষ? নিজের কোন দামকে চূড়ান্ত বলে বুঝবে? নির্দিষ্ট সেই মুহূর্তটি ধরতে পারাতেই মানুষের লাভ, সেই মুহূর্তটি ফসকে গেলেই দাম পড়তে শুরু করবে। বাজারের হাওয়া চিনতে পারা, বুঝতে পারাটাই আসল কথা। স্বপ্নময়ের স্ত্রী নমিতা এই বাজার ধরার খেলায় স্বামীর সহযোগী আর অর্পণের স্ত্রী পাঞ্চালী স্বামীকে এই বাজারের নোংরামি থেকে মুক্ত রাখতে মরিয়া। তাই নমিতা যখন বিভিন্ন ক্লাবের কর্মকর্তাদের কাছে স্বপ্নময়ের দর বাড়িয়ে চলেছে তখন পাঞ্চালী মিথ্যে করে কাগজে জানিয়ে দিয়েছে, অর্পণের পায়ে চোট আছে। কৃষ্ণ মল্লিক এবং লাড্ডু ঘোষ যত টাকা করে অ্যাডভান্স দিয়েছিল, তার দ্বিগুণ টাকার রসিদ লিখে দিয়েছে পাঞ্চালী। সে এই শয়তানি, এই জোচ্চুরি সহ্য করতে পারে না। একবার রাজর্ষির ব্যাপারে সে ঠকেছে, আর ঠকতে চায় না : "যারা এতটুকু শয়তান, তাদের আমি এতোবড় করে দেখাবো। দেখি তোরা কি করে দাঁড়াস বাজারে ! এসব রাজর্ষিদের আমি ছাড়ব না।"[৫০] বাজারসর্বস্বতার বিরুদ্ধে এ যেন পাঞ্চালীর জীবনপণ লড়াই। এই লড়াই বাজারে দর নামিয়ে দেয় অর্পণের। এদিকে বিভূতিবাবুও নির্দিষ্ট মুহূর্তটি চিনতে ব্যর্থ হন। দাম বাড়ার আশায় থাকতে থাকতে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে তার শেয়ারগুলি বাতিল হয়ে যায়। ছোটো মেয়ের বিয়ের বকেয়া পাওনাগন্ডা এই শেয়ার বিক্রি করেই করবেন বলে ভেবেছিলেন। সেই আশায় শ্বশুরবাড়ির লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করেও মেয়েটি বেঁচে ছিল। কিন্তু শেয়ার বাতিল হতে সেই মেয়ে আত্মহত্যা করে, অথবা শ্বশুরবাড়ির লোকেরাই তাকে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে মারে। টুনির গণিকালয়ে বসে এ সংবাদ পান বিভূতি আর পাঁচতলার ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। শেয়ারের পড়ে যাওয়া মূল্য

চোকান নিজের জীবন দিয়ে। মাঠে দাম না পেয়ে হতাশ, ভাঙাচোরা অর্পণও হয়তো বেছে নিত এই পথ, বিশেষত বিভূতির মৃত্যু যখন তার মধ্যে ভীষণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, কিন্তু মনোজ মিত্র মানুষকে হেরে যেতে দেন না, সবসময়ই আর একটা সুযোগ দেবার পক্ষপাতী তিনি। তাই দাদা, মেজদা, পাঞ্চালী — সবাই পৌঁছে যায় সেই গণিকালয়ে — আগলে দাঁড়ায় অর্পণকে। রূপোর বলপরী দাদা এগিয়ে ধরে অর্পণের দিকে আর সকলের হয়ে পাঞ্চালী উচ্চারণ করে ঃ

> ‘‘না, কিছু হয়নি তোমার। তুমি আবার খেলবে। আমরা তো আছি। আমি, মেজদা, তোমার দাদা। সবাই মিলে তোমায় দাঁড় করাব। যা চাও তুমি সব হবে অপা। গোধূলিবেলায় যে ছেলেটাকে জল কাদার মাঠে দাপিয়ে বেড়াতে দেখেছিলাম, তাকে আমি হারিয়ে যেতে দেব না। কিছুতেই না।’’[৫১]

মনোজ মিত্র নাটকের উপাদান সংগ্রহ করেন নিজের চারপাশের জীবন থেকে। সে জীবনে যখন দেখেন মনুষ্যত্বের অবমাননা, মূল্যবোধের অবক্ষয় - তখন দায়বদ্ধ শিল্পী হিসেবেই সেদিকে আঙুল তোলেন তিনি। এই নাটকে সেই অবক্ষয়কে তিনি দেখেছেন ফুটবল মাঠের নোংরামির প্রেক্ষাপটে, ফুটিয়ে তুলেছেন বাজার সর্বস্ব যুগের মূলমন্ত্র ঃ ‘‘দুনিয়াজোড়া গড়াপেটার খেলা চলছে, ... খেলাটা যেমন খেলা, না-খেলাটাও খেলা ... অল্ ইন দ্যা গেম্।’’[৫২] খেলার মাঠের নোংরা রাজনীতি, ব্যর্থ রাজনীতিক এবং ব্যর্থ প্লেয়ারদের মাঠে জাঁকিয়ে বসা, গদি বাঁচাতে খেলোয়াড়দের পাঁকে নামানো, দর বাড়াবার লোভে খেলোয়াড়ের নৈতিক অধঃপতন — প্রভৃতি সবকিছুকেই মনোজ মিত্র আক্রমণ করেছেন এই নাটকে। দিগ্বিজয়ী, আগমনী এবং ইস্পাহানির কর্মকর্তাদের মধ্যে অনায়াসেই খুঁজে পাওয়া কোলকাতার তিন প্রধান ফুটবল দলের কর্মকর্তাদের। কর্মকর্তারা গুম করে দেবে আশঙ্কায় খেলোয়াড়রাই গুম হয়ে গিয়ে নিজেদের দর বাড়িয়ে নিতে চেয়েছে। গণিকালয়ে তাদের আশ্রয় গ্রহণের বিষয়টি নাটকে দ্বিমাত্রিক ব্যঞ্জনা পেয়েছে। খেলোয়াড়দের সঙ্গে বেশ্যার যে কোনো পার্থক্য নেই, তাই দেখাতে চেয়েছেন তিনি। বেশ্যার মতোই নিজের অঙ্গ বিক্রি করে এই খেলোয়াড়রা কোনো নীতি-নৈতিকতার দিকে না তাকিয়ে। বেশ্যার পক্ষে তবু যুক্তি আছে যে, দেহ ছাড়া তাদের কিছুই নেই। কিন্তু যারা জীবনে অনেক কিছু পেয়েছে তারা যখন দাম না পাবার জন্য আফশোষ করে তখন নাট্যকারের চরিত্র তাদের তিরস্কার করে ঃ ‘‘দাম দর নিয়ে দিবারাত্তির হাপসে মরছ কেন বাপু? হাপসায় আমার মেয়েরা। যাদের কিচ্ছু নেই, তারাই বাজারে বিকোবে বলে হাপসে মরে। জীবনে এতো পেয়েছ, তবু হাপসানি থামে না তোমাদের !’’[৫৩] আবার অর্পণের মেজদার মুখে এই বিষয়টির আরেক মাত্রা উদ্ঘাটিত হয়েছে ঃ ‘‘আত্মীয় স্বজন কারো সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই — বাড়ি থেকে পালিয়ে সে আর কোথায় গিয়ে উঠবে ? অসামাজিক পতিত অঞ্চলই খুঁজবে। সমাজের সঙ্গে যোগ না থাকলে সেটাই তো স্বাভাবিক!’’[৫৪] এই সূত্রেই মনোজ মিত্র আঘাত করেন আধুনিক কালের প্রতিভার আত্মকেন্দ্রিকতাকে। ভারতবর্ষের মতো দেশে যেখানে দারিদ্র্য আজও প্রধান সমস্যা , তখন বিপুল অর্থমূল্যে খেলার মাঠের প্রতিভা-পুজো সমকালীনতা পেয়ে যায় মেজদা ফটিকের সংলাপে ঃ

> ‘‘ট্যালেন্ট — প্রতিভা — জিনিসটা কি সৃষ্টিছাড়া কিছু? তার কোনো সামাজিক দায় কিংবা বন্ধন থাকবে না? সবকিছুকে অস্বীকার করে কেবল প্রতিভা-পুজোর ফল কিন্তু এই হয় পাঞ্চালী। প্রতিভাবানরা তখন নিজেদের ভাবে অলৌকিক! ... কেবল পেতেই চায়, কেবল নিজের বিক্রয়যোগ্যতা দেখে বেড়ায়! কোন্ দেশে জন্ম তার — তার পাশের মানুষটা কী কাজ করে কতো পাচ্ছে, কী খাচ্ছে কিচ্ছু তার মাথায় থাকে না!’’[৫৫]

চরিত্র সৃজনে বহুমাত্রিকতা এই নাটকেও বর্তমান। অর্পণ-পাঞ্চালীর মতো প্রধান চরিত্রগুলি তো বটেই, স্বপ্নময়, মেজদা ফটিক, অপ্রকৃতিস্থ দাদা, বিভূতি, টুনি, এমনকি থাকোহরি পর্যন্ত নাট্যকারের সযত্ন লালনে চরিত্রগুণে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণ মল্লিক, তুষার সেন, লাড্ডু ঘোষ ময়দানি নোংরামির **type** চরিত্র। এই নোংরামির সঙ্গেই পাঞ্চালীর লড়াই। প্রতিভাকে সে লালন করতে চায় সব নোংরা থেকে বাঁচিয়ে, সব প্রতিকূলতা থেকে আগলে রেখে। একবার প্রতিভার অপমৃত্যু সে খুব কাছে থেকে দেখেছে বলে অর্পণের ক্ষেত্রে সে অনেক বেশি সতর্ক। কিন্তু একমুখী ভাবনার ফলে মাত্রাতিরিক্ত সতর্কতার কুফলের দিকটি সে খেয়াল করে নি। সব কিছু থেকে মুক্ত রাখতে গিয়ে অর্পণকে সে যেন করে তুলেছে আত্মকেন্দ্রিক সমাজ-বিচ্ছিন্ন এক জীব। নিজের পরিশ্রম, ভালোবাসা, মমতা দিয়েও অর্পণকে পণ্য হয়ে ওঠা থেকে বাঁচাতে পারে নি সে। বল হাতে যে পরী অর্পণকে উপহার দিয়েছিল পাঞ্চালী, সেই পরীর হাতের বলটি লোফালুফি করতে করতে স্বপ্নময়ের নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া নাটকে প্রতীকী হয়ে উঠেছে। ঐ বলটি যেন অর্পণ, যে বেরিয়ে যাচ্ছে পাঞ্চালীর হাত থেকে, আর পাঞ্চালী রয়ে যাচ্ছে ঠুঁটো পরীটির মতো। মেজদা ফটিক যখন পাঞ্চালীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রতিভাকে সমাজ-বিচ্ছিন্ন করার কুফল, তখন শিউরে উঠেছে পাঞ্চালী। নিজের কৃতকর্মের শোচনীয় ফল দেখে হতাশায় ভেঙে পড়েছে। একেবারে শেষে অর্পণকে ফিরিয়ে আনতে যখন গণিকালয়ে গেছে পাঞ্চালী, তখন আর সে একা নয় – দাদা এবং মেজদাও তার সঙ্গে আছে। অপ্রকৃতিস্থ দাদাই মেঝে থেকে বলটি কুড়িয়ে বসিয়ে দিয়েছে পরীর হাতে – এগিয়ে ধরেছে অর্পণের দিকে। যে দাদার জন্য ডিপ্রেশনে ভোগে অর্পণ, সেই দাদাই অর্পণকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করতে চায়। মানুষের এই যৌথভাবে ঘুরে দাঁড়ানোতেই জোর দেন মনোজ মিত্র, মানুষকে তিনি দেখতে চান পরস্পরের সহমর্মী হিসেবে। এই সহমর্মিতাই আমরা দেখি গণিকালয়ের মাসি টুনির মধ্যে, পাঞ্চালীর কাজের লোক যমুনার মধ্যে। যেখানে সম্পর্ক নিছকই আর্থিক, সেখানেও কোথা থেকে যেন সৃষ্টি হয় সহানুভূতি। দীর্ঘদিনের যাতায়াতের ফলে বিভূতি সে সম্পর্ক অস্বীকার করলে অভিমানও জাগে তার : "জানি জানি, টাকার টানে ভাবতে পারেন ... মানুষের টানে পারেন না! যাবেন যান, আর এমুখো আসবেন না!"[৫৬] মেয়ের মৃত্যুর খবর সে বিভূতিকে দেয়নি মমতাবশেই, বাইরের ঝামেলা থেকে বাঁচাতে পায়ে পড়েও তাকে এই বাড়িতে আটকাতে চেয়েছে। বিভূতি ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করার পর পুলিশের আতঙ্কে ঘর থেকে বিভূতির সব চিহ্ন সরাতে গিয়েও সে আবেগ অনুভব করেছে। একই সহানুভূতির প্রকাশ পাঞ্চালীর কাজের লোক যমুনার মধ্যে। যুক্তিবোধ এবং আবেগের সংযম দেখা গেছে মেজদা ফটিক চরিত্রে। কখনো কখনো মেজাজ হারালেও অপ্রকৃতিস্থ দাদা এবং তার সংসারের দায়িত্ব নিয়েছে ফটিক। খুব উচ্চাশা মধ্যবিত্ত ফটিকের নেই, নিশ্চিন্ততা তার অনেক বেশি কাম্য। সেই মধ্যবিত্ত মানসিকতা থেকেই সে বলেছে : "খেলা আজ আছে কাল নেই। গেল বছর ভাল ফর্মে ছিল -এফ.সি.আই. বড় চাকরির অফার দিয়েছিল। বুঝতে পারছ, রাজি না হয়ে তোমরা কি ভুল করেছিলে.."[৫৭] আপাতদৃষ্টিতে ফটিকের কথাবার্তা একটু তির্যক ও কটাক্ষপূর্ণ মনে হয়, কিন্তু বাক্‌ভঙ্গির এই বিশিষ্টতা তার চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যে 'ছাপোষা গেরস্ত' নিত্যদিনের সমস্যা নিয়ে জেরবার, সমাজ-সংসার-বিচ্ছিন্ন প্রতিভা-পুজো তার দৃষ্টিতে কীভাবে প্রতিভাত হতে পারে, তাই দেখিয়েছেন মনোজ মিত্র ফটিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে। সামান্য অপ্রকৃতিস্থ চরিত্র দাদার মধ্য দিয়ে তিনি একদিকে যেমন মাস্তানির মতো দুষ্কর্মের সামাজিক অভিঘাতকে চিত্রিত করেছেন, অন্যদিকে তেমনি অর্পণের

চরিত্রটিকে ভিন্নতর মাত্রা দিয়েছেন। দাদাকে দেখে অর্পণ ডিপ্রেশনে ভোগে, দাদার ঘর মেরামতের জন্য টাকা প্রয়োজন। দাদাকে সে সুস্থ দেখতে চায়। দাদা গুন্ডাদের সঙ্গে লড়াই করে অসুস্থ, আর অর্পণ গুন্ডাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ভালো আছে। নিজের এই ভালো থাকার গ্লানি অর্পণকে কুরে কুরে খায় বলেই সে পেয়ে যায় পাঠকের সহানুভূতি। এক অসহায় আত্মগ্লানির মধ্যে ফেলে নাট্যকার দেখিয়ে দেন তার ভেতরের মানুষটিকে ঃ

> ''আজ আমি কতো চান্স পেয়েছিলাম - পা ছোঁয়ালে গোল! আমি কিচ্ছু করিনি, ইচ্ছে করে করিনি। ... ফুটবল মানুষ কদিন খেলে ? পাঁচ বছর ... দশ বছর ... পনেরো বছর। কত ছোট্ট সময়। তার মধ্যে একটা দিন নষ্ট হয়ে গেল !''[৫৮]

অর্পণের ক্ষোভ, অসহায়তা গ্লানি স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে স্বপ্নময়ের বিপরীতে। স্বপ্নময়ের সঙ্গী হয়েও অর্পণ মানসিকভাবে তার সঙ্গে মিশে যেতে পারে না, কোথায় যেন সে আলাদা থেকে যায়, সম্পূর্ণ বিস্মৃত হতে পারে না পাঞ্চালীকে। Type চরিত্রগুলির সাহায্যে খেলার মাঠের নোংরামি, মস্তানিকে ফুটিয়ে তুলেছেন মনোজ মিত্র। জীবনে যারা কোনোদিন বলে পা লাগান নি, সেই সব রাজনীতিক আর এক সময়ের ব্যর্থ খেলোয়াড়রা মাঠের রাশ ধরেছেন বলে বাংলার ফুটবলের এই দুর্গতি। এরাই খেলোয়াড়দের টেনে নামায় নোংরামির পাঁকে, আর তারপর তাদের দোষারোপ করে। নিজেদের গদি রক্ষা করতে খেলোয়াড়দের সর্বনাশ করতে এদের বাধে না।

'আত্মগোপন' নাটকে খেলার মাঠের পটভূমির উপযোগী সাদামাঠা সংলাপ এবং সাধারণ পরিচিত কিছু চরিত্রের সাহায্যে নাট্যকাহিনি গেঁথেছেন। মূল্যবোধের যে অবক্ষয়ের প্রতিফলন এবং তার পুনর্স্থাপন তাঁর লক্ষ্য, এই নাটকেও সেই বিষয়ই উঠে এসেছে একটু ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। সর্বব্যাপী অবক্ষয়ের চেহারাটা পাঠক-দর্শকের সামনে তুলে ধরে নষ্ট, ভ্রষ্ট হবার হাত থেকে তিনি মানুষকে বাঁচাতে চান মানুষেরই সাহায্যে। ধুলো ময়লা তো মানুষের গায়ে লাগবেই। মনোজ মিত্রের নাটকে দেখা যায়, সেই ধুলো মুছিয়ে মানুষকে শুদ্ধ করে তোলার প্রয়াস। আলোচ্য নাটকটিও এর ব্যতিক্রম নয়।

'নাকছাবিটা' (২০০০) নাটকে তিনি ব্যবহার করেছেন স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী কালখণ্ড কে। স্বাধীনতা আন্দোলনে সহিংস পথ বেছে নিয়েছিলেন জমিদার বরদাপ্রসন্নের ঔরসে ঝি-এর গর্ভজাত সন্তান বীরেশ্বর। ধরা পড়ে জেল খেটেছেন বীরেশ্বর। স্বাধীনতার পর মুক্তি পেয়েছেন কিন্তু তখন তিনি পঙ্গু, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। ইংরেজের চোখে 'সন্ত্রাসবাদী' ছেলেকে প্রশ্রয় দিলে জমিদারি চলে যায়, তাই বরদাপ্রসন্ন বীরেশ্বরকে ত্যজ্যপুত্র করেছিলেন। ঝি-এর ছেলেকে 'স্যাক্রিফাইস' করার বিনিময়ে পেয়েছিলেন 'রায়বাহাদুর' খেতাব। একমাত্র মেয়ে নুকু-র জন্ম দিয়েই বীরেশ্বরের স্ত্রী মারা গেছে। নুকুকে মানুষ করেছে তার ছোটমাসি চিত্রা, যে কিনা নুকুর চেয়ে মাত্র ন'বছরের বড়ো। জেল থেকে বেরোনোর পর বীরেশ্বরকে জোর করে বিয়ে করেছে চিত্রা, অবশ্য বীরেশ্বরেরও যে ইচ্ছে ছিল তা পরে জানা গেছে। নুকু অবশ্য মনে করে নিজের স্বভাব অনুযায়ী এক্ষেত্রেও স্টান্ট দিতে গিয়ে ফেঁসে গেছে ছোটমাসি। নুকুর মুখে 'মা' ডাক শোনার বড় আকাঙ্ক্ষা চিত্রার, কিন্তু নুকু কিছুতেই ছোটমাসিকে মা ডাকবে না। এই নুকুর বড়বেলা জানকী। নিজের ছোটোবেলাকে জানকীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছে থেকেই গড়ে উঠতে থাকে নাটক। ষাটোর্ধ্ব অবিবাহিতা জানকী-ই এই নাটকের সূত্রধর।

তারই অভিজ্ঞতার পরিচয়সূত্রে নাটকে একে একে এসে উপস্থিত হয়েছে কাব্যতীর্থ, রায়বাহাদুর বরদাপ্রসন্ন, তমাল, তান্ত্রিক, হেমন্ত, রেন্টু প্রভৃতি চরিত্র। নিজের জীবনটাকে আর একবার ফিরে দেখেছে জানকী, ফিরে দেখেছে নিজের নুকু সত্তাকে।

সমুদ্রের তীরে মোহনপুরে এক বাংলো বাড়ি ভাড়া করে বীরেশ্বর এবং নুকুকে নিয়ে হাওয়াবদল করতে এসেছে চিত্রা। সমুদ্রের তীরে আরো অনেক জায়গা হয়তো ছিল, কিন্তু মোহনপুরে আসার পেছনে চিত্রার উদ্দেশ্য অন্য। এখানেই বীরেশ্বরের পিতা বরদাপ্রসন্নের বাড়ি অর্থাৎ চিত্রার শ্বশুরবাড়ি। চিত্রা চায় শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলে বীরেশ্বরের চিকিৎসা আর নুকুর বিয়ের ব্যবস্থা করতে, সে চায় একটা ভরসার জায়গা। বরদাপ্রসন্নেরও এখন বীরেশ্বরকে প্রয়োজন। স্বাধীনতার পর জমিদারি ব্যবস্থা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, ক্ষমতার নতুন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে চলেছে মন্ত্রিসভা। সেই কেন্দ্রে পৌঁছতে গেলে নির্বাচনে জিতে আসতে হয়। বরদাপ্রসন্নের মতো যে জমিদারেরা দীর্ঘদিন ক্ষমতা ভোগ করেছেন, এখন তারা নির্বাচনে জিতে আবার অধিষ্ঠিত হতে চান ক্ষমতার নতুন কেন্দ্রে। যদিও বরদাপ্রসন্ন গ্রামে একজোড়া স্কুল, একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি শ্মশানঘাট তৈরি করেছেন তবু ও 'ইমেজ' তার মোটেই ভাল নয়। বিশেষত এই ভোটের মুখে বীরেশ্বর সপরিবারে এসে মোহনপুরে বাসা নেওয়ায় লোকের মনে পুরনো স্মৃতি জেগে উঠছে। জমিদারি রক্ষার জন্য রায়বাহাদুরের পুত্রত্যাগের বিষয়টি স্বাধীন ভারতে মানুষ ভালভাবে নিচ্ছে না। ফলে বীরেশ্বরের সমর্থন এখন রায়বাহাদুরের বিশেষ প্রয়োজন। চিত্রা এবং রায়বাহাদুরের প্রয়োজন একসূত্রে মিলে যেতেই গাড়িতে করে বীরেশ্বরের জন্য ফলের ঝুড়ি আসে, ভালো ডাক্তার দেখাবার ব্যবস্থা হয়, নুকুর পাত্র হিসেবে স্থির হয় রায়বাহাদুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক তমাল, পাকা দেখার ব্যবস্থা রায়বাহাদুরের বাড়িতে। চিত্রার আবদার এড়াতে না পেরে বীরেশ্বর রাজিও হয়ে গেছে বিকেলে রায়বাহাদুরের প্রাসাদে যেতে, সেখানেই নুকুর পাকাদেখা। কিন্তু অকস্মাৎ এসে উপস্থিত মোহনপুরের ভুবনমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়ের কাব্যতীর্থ মশাই। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হলেও তার পোশাক এবং আচরণ প্রাচীন মানুষের মতো। ছাত্রীরা মান্য করে না বলে এ তার কামোফ্লেজ। এই কাব্যতীর্থ মশাই বা শুধু মশাই বা আরো ছোটো করে 'মশা' এসেই সব গোলমাল পাকিয়ে তোলে।

বাস্তুহারা কাব্যতীর্থ এপার বাংলায় এসে ভুবনমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়ের অঙ্কের টিচার। তার এই উপার্জনের ওপর নির্ভর করে আছে ওপার বাংলার অনেকগুলি প্রাণী। কাব্যতীর্থ হয়তো মশার মতোই ক্ষুদ্রপাণ, এক চাপড়ে তাকে নিকেশ করা যায় কিন্তু তার মধ্যে আছে আদর্শবাদের প্রতি শ্রদ্ধা, দেশের প্রতি আবেগ। তাই দেশমাতৃকার বীর সন্তান বীরেশ্বরের আগমনবার্তা পেয়ে সে ছুটে এসেছে দেখা করতে, অভিনন্দিত করতে। বীরেশ্বরকে কাছে টানার জন্য রায়বাহাদুরের চেষ্টার প্রকৃত কারণ সেই বুঝিয়েছে বীরেশ্বরকে। বীরেশ্বর যেতে রাজি হয় নি রায়বাহাদুরের প্রাসাদে, ফলের ঝুড়িও ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে। সেই থেকে কাব্যতীর্থর সঙ্গে নুকুর সম্পর্ক অম্লমধুর। এদিকে বীরেশ্বর না যাওয়ায় রায়বাহাদুরের আর এক ছেলে রেন্টু মাতাল অবস্থায় এসে বীরেশ্বরকে শাসিয়েছে, কেঁদে পড়ে অনুরোধ করেছে বাবার সঙ্গ দেবার জন্য। ক্ষমতা চলে যাবার আশঙ্কায় রেন্টুরা বিভ্রান্ত। মাতাল ভাইকে তাড়ালেও বীরেশ্বর কিন্তু তমালের মতো ঝকঝকে ডাক্তার ছেলেকে সহজে এড়াতে পারেন নি। এই তমালের সঙ্গেই রায়বাহাদুর নুকুর বিয়ের ব্যবস্থা করছেন, বিয়ের পর দু'জনকে বিলেত পাঠাবার

ব্যবস্থাও করেছেন। মেয়ের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বীরেশ্বরের ভাঙন শুরু হয়েছে। নিজে না গেলেও চিত্রা আর নুকুকে রায়বাহাদুরের বাড়িতে পাকাদেখায় যেতে দিতে রাজি হয়েছেন। এক মিস্টি সকালে চিত্রা নুকুকে তৈরি করছে প্রাসাদে যাবার জন্য। শিখিয়ে পড়িয়ে দিচ্ছে, কীভাবে তাকাতে হবে, কথা বলতে হবে, কোন্ প্রশ্নের কী উত্তর দিতে হবে, নির্জনে তমাল হাত চেপে ধরলে কী করতে হবে। দ্বারভাঙায় মানুষ হওয়া নুকুকে শেখাচ্ছে বাংলা মুলুকের 'কালচার।' হঠাৎ বড় এক হাঁচির সঙ্গে বগলে বেডিং, হাতে টিনের বাক্স, কাঁধের ঝোলায় বইপত্র নিয়ে কাব্যতীর্থর আবির্ভাব। এই লোকটি কি নুকুর জীবনে কুগ্রহ? সব কাজে বাধা সৃষ্টির জন্যই কি এর উপস্থিতি?

কাব্যতীর্থ হারিয়েছে ভুবনমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়ের চাকরি, কারণ ফলের ঝুড়ি সেই তো তুলে দিয়েছিল গাড়িতে। তিন ঘন্টার মধ্যে তাকে মোহনপুর ছাড়ার আলটিমেটাম দিয়েছে রায়বাহাদুরের পারিষদেরা। নুকুকে একটা নাকছাবি উপহার দিয়ে বিদায় নেয় কাব্যতীর্থ। তার জন্য নুকুর মন কেমন করে ওঠে, এমনকি চিত্রাও সহানুভূতি বোধ করে। কিন্তু তার সহানুভূতি বিরক্তিতে বদলে যায় বীরেশ্বর কাব্যতীর্থকে নিয়ে এসে তাদের বাড়িতে আশ্রয় দিলে। চিত্রা জানে, এরফলে শ্বশুরের বিরূপ দৃষ্টিতে পড়তে হবে, তার পরিকল্পনা সব ভেস্তে যাবে। এসব নিয়ে কথা কাটাকাটিতে বীরেশ্বর অসুস্থ হয়ে পড়েন, চিত্রা তাকে নিয়ে ছোটে ডাক্তারখানায়, নুকুর পাকাদেখা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। নুকু সবকিছুর জন্য দায়ী করে কাব্যতীর্থকে, তার ব্যাকরণ কৌমুদী ইঁদারায় ফেলে দেয়। বাইরে মোটরের শব্দ, সম্ভবত তমাল। কাব্যতীর্থকে এখন লুকোতে হয়, কারণ দুপুরবেলা বাইরের লোকের সঙ্গে নুকু বাড়িতে একা রয়েছে — এটা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। নুকুর পরামর্শে ইঁদারায় নেমে আত্মগোপন করে কাব্যতীর্থ, নুকু ইঁদারার ওপর টিনের ঢাকনি চাপায়। কিন্তু দরজা খুলতে দেখা যায় তমাল নয়। রায়বাহাদুর বরদাপ্রসন্ন এসেছেন হেমন্ত নায়েবকে সঙ্গে নিয়ে। প্রথমে ভালোমুখের চেষ্টা বিফল হলে জোর করে নুকুকে তুলে নিয়ে যেতে চান রায়বাহাদুর। মেয়ের জন্য যদি নরম হয় বীরেশ্বর। বিপন্ন নুকু আর্ত চিৎকার করে ডাকে কাব্যতীর্থকে। হট্টগোলের ভয়ে পালিয়ে যায় বরদাপ্রসন্ন এবং হেমন্ত। কিন্তু কাব্যতীর্থ যে ইঁদারা থেকে উঠছে না। নুকু 'মশাই-মশাই' ডাকতে ডাকতে ইঁদারার চারপাশে ঘুরছে। তাহলে কি...

উৎকন্ঠার মধ্যে নাটকের প্রথম অর্ধ শেষ করেন মনোজ মিত্র। দ্বিতীয় অর্ধে ক্রমশ গ্রন্থিমোচন। রায়বাহাদুরের কাছে খবর পেয়ে তান্ত্রিক (পূর্বের দারোগা) এসে কুয়ো থেকে ওঠায় অচেতন কাব্যতীর্থকে। নুকুর নাকছাবির দিকে তার নজর পড়ে। রেন্টু আর সাধন কাব্যতীর্থকে প্রায় ছোঁ মেরে নিয়ে বেরিয়ে যায়। যে ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করছিল বীরেশ্বর, তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়। কাব্যতীর্থর কিছু হয়ে গেলে নুকু বিপদে পড়বে। এদিকে কাব্যতীর্থকে উদ্ধারের দৃশ্য দেখে শক পেয়ে চিত্রার পেটের বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে যায়, আন্তরিক চিকিৎসায় তাকে সুস্থ করে তোলে তমাল। 'মশাই'-এর জন্য নুকুর মন বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। রেন্টু এসে কাব্যতীর্থর মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে পুলিশের ভয় দেখিয়ে বীরেশ্বরকে টানতে চায় নিজেদের দিকে, বরদাপ্রসন্ন আবার উল্টো প্যাঁচ দেন রেন্টুকে আঘাত এবং বীরেশ্বরের প্রশংসা করে। কিন্তু কোনো কৌশলেই বীরেশ্বরকে রাজি করানো যায় না। আগে একবার বরদাপ্রসন্নের গাড়িতে তুলে দিয়েছিল ফলের ঝুড়ি আর এবার দিয়েছে ওষুধের ঝুড়ি। এদিকে তান্ত্রিক লোভে পড়েছে নাকছাবির, দারাগোর দৃষ্টিতে সে বুঝেছে, নাকছাবির পাথর দুর্মূল্য। শঙ্খমুক্তা জোর করে সে ছিঁড়ে নিতে চায়। নাকছাবি রক্ষা করতে নুকু তা ছুঁড়ে দেয় ইঁদারার মধ্যে। কিন্তু ইঁদারায় জল নেই, তান্ত্রিক নেমে গিয়ে

উঠিয়ে নিয়ে আসে শঙ্খমুক্তা। যে পবিত্র, দুর্লভ শঙ্খমুক্তা দিয়েছিল কাব্যতীর্থ তা রক্ষা করতে না পেরে অসহায় ক্ষোভে দীর্ণ হয়েছে নুকু। প্রবল মানসিক যন্ত্রণায় উন্মাদপ্রায় হয়ে ওঠে নুকু, বাবার মৃত্যুর পর তার স্থান হয় উন্মাদ-আশ্রমে। সেরে ওঠার পরও সে সেখানেই থাকে, রোগিণীদের দেখভাল করে, হাতের কাজ শেখায়, গান শেখায়।

নাটকের শেষে ফিরে আসে একেবারে প্রথমের দৃশ্য। নুকু এখন বৃদ্ধা জানকী। নিজের মিথ্যে অসুস্থতার সংবাদ দিয়ে চিত্রা তাকে আনিয়েছে মোহনপুরে। যে বাড়িতে দু'মাসের জন্য হাওয়া বদলাতে এসেছিল চিত্রা, সেখানেই রয়ে গেছে পঞ্চাশ বছর। রায়বাহাদুরের বাড়িতে সে যায় নি। হতে পারে, এও তার এক 'স্টান্ট', কিন্তু পঞ্চাশ বছর ধরে সেই 'স্টান্ট' রক্ষা করাও কম কথা নয়। বিপ্লবীর বিধবা হিসেবে পাওয়া ভাতা দিয়েই তার সংসার চলে, সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে পেয়িং গেস্টও রাখে। কিন্তু সেই পেয়িং গেস্টকে চিনতে পেরে যে জানকীর পুরো জীবনের হিসেবটাই গোলমাল হয়ে যায়। সে যে সেই কাব্যতীর্থ মশাই, যে মরে গেছে জেনে নুকুর জীবনটা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। শেষবেলায় কেন সে আবার ফিরে এল জানকীকে ঠাট্টা করতে। সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা-ভোগ যে আজ মিথ্যে হয়ে গেল, মাঝখান থেকে হারিয়ে গেল জীবনের অমূল্য সময়। নিজেকে আজ জানকীর মনে হচ্ছে প্রতারিত, রিক্ত। কিন্তু মনোজ মিত্রের নাটক রিক্ততার মধ্যে শেষ হয় না। তাই কাব্যতীর্থ জানকীকে আহ্বান জানান জীবনের দিকে ঃ ''জীবন সহজে শ্যাষ হইবার নয়। ফুরাইবার নয়। তুমি অহনো জানো না, পর মুহূর্তে তোমার জন্য কী আছে। হ, লাইফ ইজ ফুল অফ সারপ্রাইজ! আসো না, নতুন কইর‍্যা বাঁচি। সবাই মিলা।''[৫৯] নাকছাবিটা হারিয়ে গেছে। নতুন নাকছাবি গড়েছে চিত্রা আর কাব্যতীর্থ। নুকুর জন্য সব সাজিয়ে রেখেছে। এই নাকছাবির পাথর হয়তো ঝুটা, কিন্তু ঃ ''আগামীকাল কেউ আবিষ্কার করতেও পারে, ঝুটা না, এইখানাই আসল শঙ্খমুক্তা। সমুদ্রের গর্ভে ঝিনুকে জন্ম নিছে...ভারি শুদ্ধ, ভারি পবিত্র ...''[৬০] অনাগত আগামীর এই দুর্মর আশাবাদেই নাটক শেষ হয়েছে।

এই নাটকে সদ্য-স্বাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আবহের পরিচয় আছে কিন্তু তাকে ছাপিয়ে প্রধান হয়ে উঠেছে কাহিনির মানবিক কাঠামো। আদর্শের জন্য লড়াই করে জেলে যাওয়া বীরেশ্বর যখন পঙ্গু অবস্থায় মুক্তি পায় তখন স্বাধীন ভারতবর্ষের নতুন রূপের সঙ্গে নিজের ভাবনা-চিন্তাকে মেলাতে পারেনি। জমিদার শ্রেণি ক্ষমতা দখলে রাখার নতুন উপায় হিসেবে অবলম্বন করেছে নির্বাচনকে। রায়বাহাদুর বরদাপ্রসন্ন একদা ত্যজ্যপুত্র বীরেশ্বরকে কাছে টেনে নির্বাচনী-বৈতরণী পার হতে চান। কিন্তু বীরেশ্বর কিছুতেই নিজের আদর্শের সঙ্গে আপস করতে পারে না। অন্য সকলের কাছে তার এই জেদ হয়তো অর্থহীন কিন্তু তার নিজের কাছে এই আদর্শই অস্তিত্ব। আদর্শের প্রতি আকর্ষণে হয়তো নয়, কিন্তু বাবার প্রতি ভালোবাসাতেই একমাত্র নুকু সবসময় বীরেশ্বরকে সমর্থন করেছে। তবে তার মধ্যেও জেগেছে কিশোরীসুলভ আকাঙ্ক্ষা, তমালের সঙ্গে ঘর বাঁধার স্বপ্নে, বিদেশ যাবার স্বপ্নে তার মনেও রঙ লেগেছে। আবার কাব্যতীর্থ সম্পর্কেও এক অদ্ভুত অনুভূতি তার মনে। এই নুকু তথা জানকীর জীবন কীভাবে ভুলের মারপ্যাঁচে মিথ্যে হয়ে গেল তা নিয়েই গড়ে উঠেছে এই নাটক। এক কিশোরীর রঙিন স্বপ্ন কীভাবে বৃদ্ধার বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাসে বদলে গেল, তাই দেখিয়েছেন মনোজ মিত্র। একই নারীর ছোটোবেলা ও বড়বেলা সৃষ্টি করে নিজের দৃষ্টিতে নিজের জীবনকে দেখার অভিনব আয়োজন করেছেন।

নাটকের শেষে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট মুছে গিয়ে পাঠক-দর্শকের মনে জেগে থাকে জানকীর ব্যর্থ জীবনের জন্য দীর্ঘশ্বাস, মিথ্যে দুঃখভোগের জন্য কারুণ্য।

মনোজ মিত্র নিজে কখনোই কোনো বিশেষ রাজনীতি বা আদর্শের পক্ষে বা বিপক্ষে নন। তাই কোনো পক্ষকে অন্ধভাবে সমর্থন বা অন্ধভাবে কারো বিরোধিতা তাঁর নাটকে নেই। তিনি আসলে খোঁজেন মানুষকে, মানুষের সমস্যা-সঙ্কটকে। বিশেষ পরিস্থিতিতে ফেলে মানুষকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। সে পর্যবেক্ষণ নিরপেক্ষ বলে মানুষের চরিত্রের বিভিন্ন মাত্রা তাতে প্রকাশিত হয়। অবিমিশ্র ভালো বা মন্দ নয় তাঁর মানুষ। তাঁর নাটকে আপাতদৃষ্টিতে যারা 'ভিলেন', তারাও নিজেদের প্রেক্ষণ-বিন্দু থেকে বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ পায়। আলোচ্য নাটকে যেমন রেন্টু বা বরদাপ্রসন্ন চরিত্র। বীরেশ্বরকে হুমকি দিতে এসেও নিজের অসহায়তা গোপন রাখতে পারে না রেন্টু। জমিদারি ব্যবস্থা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, ক্ষমতার নতুন উৎস রাজনীতি এবং নির্বাচন। সেই উৎসে অধিষ্ঠিত হতে না পারার আতঙ্ক রেন্টুকে বিহ্বল করে তুলেছে। বীরেশ্বরকে গরম দেখাতে গিয়েও তাই সে হঠাৎ ভেঙে পড়ে ঃ

> ''অলরাইট ... যেও না ... গুডনাইট ... (চলে যেতে যেতে ঘুরে এসে বীরেশ্বরের পায়ে টলে পড়ে) প্লিজ চলো দাদা ... অবস্থা ক্যানট্যাংকারাস ... জমিদারি সিস্টেম লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ কমপেনসান মিলবে ঠিকই ... কিন্তু ক্ষমতা ... পাওয়ার ... কোথায় পাবো ?''[৬১]

জমিদারি রক্ষার জন্য বিপ্লবী সন্তান বীরেশ্বরকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন যে বরদাপ্রসন্ন তাকেও নাট্যকার সুযোগ দিয়েছেন পাঠক দর্শকের সহানুভূতিতে উত্তীর্ণ হতে ঃ

> ''সেদিন আর কী করতে পারতাম বলো। সাহেবদের খুশি না রাখলে সাতপুরুষের জমিদারিটা চলে যেত। যদি বলো জমিদারি রাখাটাই অপরাধ, আমি অপরাধী। কিন্তু অন্তর থেকে বলছি, বীরেশ্বর আমি তোমকে নিয়ে গর্বও করি, হিংসাও করি ...''[৬২]

এই সরল স্বীকারোক্তির পর বরদাপ্রসন্নের প্রতি পূর্ণ বিরূপতা আর থাকে না। জমিদার শ্রেণির প্রতিনিধি বরদাপ্রসন্নদের ক্ষমতা লোলুপতা যেমন দেখিয়েছেন মনোজ মিত্র, তেমনি বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, শ্মশানঘাট নির্মাণে তাদের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেছেন। কোনো পক্ষাবলম্বনের দায় নেই বলেই তাঁর দৃষ্টিতে এই স্বচ্ছতা আছে। তবে তান্ত্রিকে পরিবর্তিত দারোগার মতো সুবিধাবাদী চরিত্রগুলির প্রতি তিনি বরাবরই নির্মম। এদের হেনস্থা করার সুযোগ তিনি ছাড়েন না। তান্ত্রিককে লাঠি দিয়ে বারংবার ঘেন্না এবং মজায় যে খোঁচা দিয়েছে বীরেশ্বর, সে খোঁচা আসলে নাট্যকারেরই। তীক্ষ্ণ খোঁচায় তিনি খুলে দিতে চান এই সব ভণ্ডদের মুখোশ।

কারো ভাবনাকে দোষারোপ করেন না তিনি, নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে শুধু সেই ভাবনাকে উপস্থাপন করেন। এভাবেই বীরেশ্বরের ভাবনার বিপ্রতীপে উপস্থাপিত হয় আধুনিক কালের যুবক তমালের ভাবনা। নতুন সময়ে তমালের ভাবনাও নতুন। নীতি-আদর্শ আঁকড়ে থেকে জীবন নষ্ট করার চেয়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কেরিয়ার গড়ে তোলা তার মতে উচিত কাজ। রায়বাহাদুরের স্কলারশিপের টাকায় তমাল ডাক্তারি পড়েছে, রায়বাহাদুর তাকে দেখিয়েছেন বিদেশ যাবার স্বপ্ন। সুতরাং রায়বাহাদুরের বিরুদ্ধাচরণ সে করতে পারবে না। নুকুকে নিতে হলে সে রায়বাহাদুরের হাত থেকেই নেবে। আধুনিক যে কোনো যুবকের মতোই সে অভিযুক্তের কাঠগড়ায় দাঁড় করায় অতীত প্রজন্মকে ঃ

> "আপনারা নীতির কাজিয়া করছেন, মার খাচ্ছি আমরা, তরুণরা। চারপাশে হাজার সমস্যা, দিন দিন বেকার বাড়ছে। ... প্লিজ পুরনো আবর্জনা ঝেড়ে ফেলে দিন। ছেলেমেয়েদের জীবন নষ্ট করবেন না, দাঁড়াতে দিন আমাদের বাড়তে দিন ..."[৬৩]

মনোজ মিত্রের কথনভঙ্গির মুন্সিয়ানা এইখানে যে, এই আত্মকেন্দ্রিকতা সত্ত্বেও পাঠক-দর্শকের মন তমালের প্রতি বিরূপ হয় না, বরং তার ভাবনাকেও বোঝার চেষ্টা করে।

নতুন প্রজন্মের এই দাঁড়াতে চাওয়া, বাড়তে চাওয়ার মাঝে, ক্ষমতার জন্য উগ্র লোলুপতার মাঝে, বীরেশ্বরের মতো আদর্শবাদীর অসহায়তাও তাঁর লেখনীতে উজ্জ্বল। এই নতুন সময়ের 'ভোট করানো', মন্ত্রী হয়ে ক্ষমতা করায়ত্ত করা, পরের দাক্ষিণ্যে কেরিয়ার তৈরি করা – প্রভৃতির সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারে না বীরেশ্বর, ক্রমশ সে নিঃসঙ্গ হয়ে যেতে থাকে। যে দেশের জন্য নিজের জীবন বাজি রেখেছিল সেই দেশের এই অদ্ভুত পরিবর্তনে সে কষ্ট পায়। কাব্যতীর্থের মতো কেউ কেউ তাকে এবং তার আদর্শকে সম্মান জানালেও অধিকাংশেরই কাছে সে একজন বাতিল মানুষ। তবু সে আঁকড়ে থেকেছে নিজের আদর্শ। রায়বাহাদুরের নির্বাচনে নিজেকে এবং নিজের বিপ্লবী আদর্শকে ব্যবহৃত হতে দেয় নি। তবে চারপাশের অবস্থা দেখে তার নিজের মধ্যেও জেগেছে দ্বিধা সংশয় ঃ "দেশকে বিদেশীর শাসনমুক্ত করতে অস্ত্র ধরলে, তাকে সন্ত্রাস বলে, না স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে ... সব আমার গোলমাল হয়ে গেছে! বুঝতে পারিনে, ঠিক করেছি না ভুল করেছি।"[৬৪] কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনোজ মিত্র প্রত্যক্ষত বীরেশ্বরের আদর্শের জয়ের কথা না বললেও পরোক্ষে তারই ব্যঞ্জনা দেন। বীরেশ্বরের মৃত্যুর পর চিত্রা যে রায়বাহাদুরের প্রাসাদে গিয়ে ওঠেনি, বরং সেই ভাড়াবাড়িতেই পঞ্চাশ বছর কাটিয়ে দিয়েছে এবং বরদাপ্রসন্নের অনুগ্রহের পরিবর্তে বীরেশ্বরের বিধবা হিসেবে পাওয়া বিপ্লবী ভাতাকেই জীবনধারণের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে তা বীরেশ্বরের আদর্শের জয়কেই ব্যঞ্জিত করেছে। সেই স্মৃতিবিজড়িত বাড়িতে চিত্রার সঙ্গী কাব্যতীর্থ, যে কিনা বিশ্বাস করেছিল বীরেশ্বরের আদর্শে, জীবিকা এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়েও দাঁড়িয়েছিল বীরেশ্বরের পাশে। শঙ্খমুক্তার মতো দুর্লভ এবং পবিত্র শুদ্ধ চৈতন্যের অধিকারী এই কাব্যতীর্থ। সেই শুদ্ধ চৈতন্যই জানকীকে আহ্বান জানিয়েছে নতুন জীবনের দিকে, নতুন ভাবে বাঁচার দিকে। এই শুদ্ধ চৈতন্যে স্থিত হওয়াই মনোজ মিত্রের যে কোনো নাটকের ভাববীজ।

২০০১ সালে রচিত 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' তুমুল হাসির নাটক। বাঙালি শিল্পপতি ধৃতিকান্ত ঘোষাল মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সঙ্গে ক্রমাগত লড়াইয়ে হেরে যাচ্ছেন। অন্য সব প্রোডাক্ট বন্ধ হয়ে গিয়ে এখন চলছে কেবল কাপড় কাচা সাবান আর মশা মারা ধূপ। সে দুটো অবশ্য রমরম করেই চলছে। একদিকে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি অন্যদিকে স্ত্রী সুনন্দা ধৃতিকান্তর জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। সুনন্দা প্রতি বছরই নির্বাচনে দাঁড়ায় আর তার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। নির্বাচনের খরচ দিতে চান নি বলে আগের দু'বার সুনন্দার ইলেকশন ম্যানেজাররা ধৃতিকান্তকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করেছে। এবার তৃতীয় বারে পাঁচ রাজ্যের পাঁচ আসন থেকে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে পড়েছে সুনন্দা, তার ইলেকশন ম্যানেজারেরাও এসে গেছে। যে কোনো মুহূর্তে অপহরণের আশঙ্কায় ধৃতিকান্তর প্রেশার-সুগার যথেষ্ট বেড়ে গেছে, খাসনবীশকে তিনি চব্বিশ ঘন্টার দেহরক্ষী হিসেবে নিয়েছেন।

নাটক শুরু হচ্ছে ধৃতিকান্তর কোম্পানির সেলসম্যান সৌরভের ফ্ল্যাটে। ত্রিপুরায় ট্যুরে যাবার সময় বউকে নিয়ে যেতে চায় সৌরভ। তাই বস্‌কে বাড়িতে ডেকে বউকে দিয়ে আপ্যায়ন করিয়ে অনুমতি আদায় করে নিতে চায়। বউ মুন্নির অদ্ভুত একটি গুণ – সে সব সময় হাসে। মোনালিসার হাসির মতোই সে হাসিরও মানে বোঝা দায়। নিজে সে কিছুই রাঁধতে পারে না, নিচের তেলেভাজাওয়ালিকে দিয়ে কুমড়োফুল, বকফুল, সর্ষেফুল প্রভৃতির বিচিত্র পদ তৈরি করিয়ে বঙ্গীয় রন্ধনশিল্পের মহিমায় ধৃতিকান্তকে একেবারে মুগ্ধ করে ফেলেছে। পরে একদিন কদলীমঞ্জরী অর্থাৎ মোচা রেঁধে খাওয়াবে বলেছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এত কিছু তা সফল হয় নি। সৌরভ বউকে নিয়ে যাবার অনুমতি পায় নি। বরং সৌরভের অনুপস্থিতিতে ধৃতিকান্ত এসে মুন্নিকে দেখাশোনা করবেন বলে জানিয়েছেন। কাল্পনিক মস্তান শেতলার ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করতে চাইলে চব্বিশ ঘন্টাই তাদের ফ্ল্যাটে থেকে মুন্নিকে পাহারা দেবেন বলে জানিয়েছেন। ফাঁকা ফ্ল্যাটে মুন্নি আর ধৃতিকান্ত – ভাবতেই সৌরভের চোখের ঘুম উবে গেছে। মুন্নির জন্য পাহারা চাই, ধৃতিকান্তকে আটকাবার লোক চাই। মুন্নিই পরামর্শ দিয়েছে ক্রনিক বেকার গোগোলকে ডাকার জন্য, যে কিনা মুন্নি-সৌরভের বিয়ের ঘটকালি করেছিল। আবার গোগোলকে আটকাবার জন্য ডাকা হ'ল পমমামা আর লতুমাসিকে। তার ওপর রইল ওপরের ফ্ল্যাটের বালাকণ্ঠী হরিশ্চন্দ্র, ধৃতিকান্ত এলেই যে নিজের গুপিযন্ত্র নিয়ে গানে গানে ধৃতিকান্তকে ব্যস্ত রাখবে। সব মিলে তৈরি হ'ল এক অদ্ভুত গোলকধাঁধা – ধৃতিকান্ত অ্যারো (->) মুন্নি ... গোগোল অ্যারো (->) ধৃতিকান্ত, পমমামা অ্যারো (->) গোগোল, লতিকা অ্যারো (->) পমমামা, হরিশ্চন্দ্র অ্যারো (->) ধৃতিকান্ত। বউয়ের চারপাশে সাত চৌকিদার বসিয়ে সৌরভ গেল ত্রিপুরায়। তারপর?

চারদিক থেকে তাড়া খাওয়া একটা মানুষ ধৃতিকান্ত মুন্নির ফ্ল্যাটেই আত্মগোপন করে থাকতে চান, অন্তত নির্বাচন পর্যন্ত। মুন্নির হাসিমুখ দেখে তিনি ভুলতে চান সব টেনশন। কিন্তু স্বস্তি তার কপালে নেই। গোগোলকে চাকরির টোপ দিয়ে হলদিয়া পাঠাতে না পাঠাতেই এসে উদয় হয় পমমামা আর লতুমাসি। কোনোমতে লতুমাসিকে রান্নাঘরে পাঠাতেই বালাকণ্ঠী হরিশ্চন্দ্র হাজির তার গুপীযন্ত্র নিয়ে। সব মিলিয়ে ধুন্ধুমার নাটক জমে ওঠে সৌরভের ফ্ল্যাটে। খাসনবীশ বুঝে ফেলেছে কৌশল, ধৃতিকান্ত লতিকার দিকে ঝোঁকার ভাণ করলেই পমমামা বোনের 'ক্যারেকটার' বাঁচাতে মুন্নিকে ঠেলে দেবে ধৃতিকান্তর দিকে। সেই কৌশলেই ধৃতিকান্ত এগোতে থাকেন মুন্নির দিকে। মুন্নিকে পাশে নিয়ে তার বয়স যেন অনেকটাই কমে যায়। নিউ মার্কেটে বেড়াতে গিয়ে সুনন্দার গুন্ডারা যখন পিছু ধাওয়া করে তখন ধৃতিকান্ত একশ কুড়ি কিলোমিটার পর্যন্ত স্পিডে গাড়ি চালিয়ে সেই গুন্ডাদের হাত থেকে নিজেকে আর সুনন্দাকে বাঁচান। এদিকে টেলিফোনে গোলমালের আঁচ পেয়ে সৌরভ ত্রিপুরা থেকে এসে শেতলার বেশ ধরে নিজের ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে উঁকি দেয়। ধৃতিকান্ত তাকে দেখে ভিরমি খান। কিছু একটা ভালো-মন্দ ঘটে গেলে তার দায় বহন করতে হবে ভেবে মুন্নি সৌরভকে আবার ত্রিপুরায় পাঠিয়ে দেয়।

অসুস্থ ধৃতিকান্ত নার্সিংহোমে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে খাসনবীশের শেখানো কৌশলে 'লতু-লতু' ডাক ছাড়েন। এদিকে নার্সিংহোম থেকে ধৃতিকান্তকে অপহরণের ছক কষে সুনন্দা এবং তার বাহিনী। কৌশলে মুন্নির কাছ থেকে নার্সিং হোমের ঠিকানা জেনে যায় সে। প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে যায়, ধৃতিকান্তকে অপহরণ করে সে দায় চাপাবে মুন্নিদের ওপর। পমমামা কিন্তু চিনতে পেরে যান

সুনন্দাকে। আর তখন তিনি পারমিশান দেন 'ডিফেন্স' ছেড়ে 'অ্যাটাকে' যেতে, অপোনেন্টের চালে অপোনেন্টকে মাত করতে। তারই পরামর্শে লতিকা আর মুন্নি সুনন্দাদের আগেই ধৃতিকান্তকে অপহরণ করে এনে তুলেছে নিজেদের ফ্ল্যাটে -- দায় চেপেছে সুনন্দার ঘাড়ে। কিডন্যাপের ব্যাপারে মুন্নিকে হারাবে কে! তার যে সেই ছোটোবেলায় মায়ের র‍্যাশন ব্যাগে বসে কিডন্যাপ হবার অভিজ্ঞতা রয়েছে। সৌরভ তাকে উপযুক্ত মর্যাদা দেয় নি, একটা খেলনা ভেবে তার চারপাশে পাহারা বসিয়েছে। কিন্তু ধৃতিকান্ত তাকে একটা সম্পূর্ণ মানুষ ভেবে আত্মসমর্পণ করেছেন, বাঁচাবার জন্য করুণ আর্তি জানিয়েছেন। তাই মুন্নি তাকে না বাঁচিয়ে পারে নি, এই বাঁচানোর মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে তার প্রকৃত ক্ষমতা। সৌরভ ফ্ল্যাটে ফিরে দেখে, সেখানে জয়ের আনন্দে পিকনিক শুরু হয়েছে। সৌরভের ফ্ল্যাটে বসেই ধৃতিকান্ত টি.ভি.-তে দেখেন পাঁচ রাজ্য থেকে প্রার্থীপদ তুলে নিয়েছে সুনন্দা। টি.ভি.-তে সুনন্দার কান্না দেখে ধৃতিকান্তসহ সকলে যখন উল্লসিত তখন ধীর পায়ে খাসনবীশের সঙ্গে প্রবেশ করে সুনন্দা। সুনন্দার কথায় যেন ঘোর ভাঙে ধৃতিকান্তর। নিজের অবনমন স্মরণ করে তিনি লজ্জিত হন। ক্ষুব্ধ হন সৌরভ-মুন্নির ওপর। কিন্তু আসলে তিনি নরম প্রকৃতির লোক বলে মুন্নির কান্না দেখে আবার বিচলিত হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত নাটকের মধুর সমাপ্তিই ঘটান মনোজ মিত্র। সুনন্দা ফিরে আসে মিস্টির বাক্স এবং মুন্নির জন্য কুমড়ো ফুলের বড়া নিয়ে, ধন্যবাদ জানায় তাদের দু'জনকেই বাঁচাবার জন্য। ধৃতিকান্তকে সে জানিয়ে দেয়, রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে এবার সোস্যাল ওয়েলফেয়ারে নামবে এবং সেখানে টাকা লাগবে আরো বেশি। কুমড়ো ফুলের বড়া ধৃতিকান্তর হাতে দিয়ে সে বলে মুন্নিকে খাইয়ে দিতে। হতভম্ব ধৃতি প্রথমে সে বড়া সুনন্দাকে খাওয়াতে যায়, তারপর হাতে নিয়ে মুন্নির দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসে। সে হাসির অন্য সকলের মধ্যে সংক্রমণের মধ্য দিয়েই নাটকের সমাপ্তি।

'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' উতরোল হাসির নাটক। কিন্তু এই নাটকেও মনোজ মিত্রের নাটকের পরিচিত উপাদানগুলি, যেমন – মানুষের নিঃসঙ্গতা, সব কিছুর ওপরে শুভবোধের জয়, বিশিষ্ট জীবনদর্শন প্রভৃতির পরিচয় সহজলক্ষ্য। এইসব উপাদান দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে যে মূল বিষয়টি, তা হ'ল নারীর শক্তির বিকাশ। সাধারণভাবে নারীকে সমাজে অবলা বা দুর্বলা হিসেবেই দেখা হয়। তার চারপাশে সবসময় নিষেধ আর সতর্কতার আগল তুলে নিশ্চিন্ত হতে চায় পুরুষ। হয় তাকে নিজের র‍্যাশন ব্যাগে নিয়ে ঘুরতে চায় অথবা একের পর এক দারোয়ান লাগিয়ে তার 'নিরাপত্তা' সুনিশ্চিত করতে চায়। কিন্তু সেই নারীকেই যদি দেওয়া যায় বিকশিত হবার অনুকূল অবসর, যদি তার কাছে চাওয়া যায় নির্ভরতার আশ্রয়, তবে সেই হয়ে উঠতে পারে দশভুজা। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র মুন্নি সবদিক থেকেই ব্যতিক্রমী। তার মা ডিভোর্সী এবং গ্রামের স্কুলে সংস্কৃত পন্ডিত। সেই 'রেয়ার মাদার' মহিলা সংস্কৃত পন্ডিতের 'রেয়ার ডটার' মুন্নি, যাকে ছোটোবেলায় র‍্যাশন ব্যাগে পুরে মা ট্রামরাস্তা ধরে ছুটে পালিয়েছিলেন। তারপর থেকে নিজেকে বারবার সেই র‍্যাশন ব্যাগের মধ্যেই আবিষ্কার করে মুন্নি ঃ

> " বাবা আমায় তার কাছে আটকে রেখেছিল। একদিন মা করল কি, বাবা যখন ঘুমোচ্ছে, একটা র‍্যাশনব্যাগ নিয়ে বাড়িতে ঢুকে, আমায় তার মধ্যে বসিয়ে নিয়ে দে ছুট ... পড়িমরি ট্রামরাস্তা ধরে ছুট ... ছুট ... ছুট ... (হাসতে শুরু করে) সেই থেকে মনে হয়, আমি যেন একটা হাতব্যাগের মধ্যেই বসে আছি ... কারো না কারো হাতে ঝুলছি ... কখনও মায়ের হাতে, কখনও সৌরভের হাতে ... কখনও ... হাতে হাতে ঝুলছি। সব মেয়েই বোধহয় তাই, না স্যার ?"[৬৫]

শেষের এই প্রশ্নেই মুন্নি সাধারণীকৃত হয়ে যায় যে কোনো নারীতে। অন্য রান্না তো দূর, মুন্নি ভাতের ফ্যানটাও ঝরাতে পারে না। এক গান সে দুবার এক সুরে গাইতে পারে না। একটা জিনিসই সে পারে – তা হ'ল এই সাত ঝঞ্ঝাটের পৃথিবীতে সবসময় হাসতে। সেই অদ্ভুত হাসির মানে খুঁজে পাওয়াই কঠিন। বাবা-মায়ের ডিভোর্সের কথা বলতে গিয়েও সে হাসে, আবার গোগোলের কাছে ধৃতিকান্তর অপদস্থ হবার কথা শুনেও সে হাসে। এই হাসিই তাকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। এই হাসিতেই ভুলেছেন ধৃতিকান্ত। ক্রমাগত আতঙ্ক যখন তাকে তাড়া করে ফিরছে,তখন মুন্নির হাসিতেই তিনি পেয়েছেন নির্ভরতার আশ্রয়। খাসনবীশ এই হাসিকে তুলনা করেছে মোনালিসার হাসির সঙ্গে। নিজের জাঁদরেল স্ত্রী সুনন্দা যার কাছে আতঙ্ক, ছেলেমেয়েরা যাকে ছেড়ে পশ্চিমী দুনিয়ার বাসিন্দা, সেই ধৃতিকান্ত ঘোষাল শান্তির আশ্রয় খুঁজেছেন মুন্নির কাছে। আপাতদৃষ্টিতে ধৃতিকান্তকে পরস্ত্রীর সান্নিধ্যলোভী শিথিল চরিত্রের মানুষ মনে হলেও মনোজ খুঁজেছেন তার ভেতরকার নিঃসঙ্গ আশ্রয়প্রার্থী মানুষটিকে। কর্মক্ষেত্রে সফল হয়েও পারিবারিক জীবনে শান্তির সন্ধান পান নি ধৃতিকান্ত। সেই অসহায় মানুষের আর্ত রোদন ধরা পড়েছে তার সংলাপে ঃ

> উৎখাত করছে ...ছেলেমেয়েরা সব বিদেশে, তারা আর এ বাংলায় ফিরবে না ... ব্যবসা-পত্তর কে রক্ষা করবে ... গলা পর্যন্ত দেনায় ডুবে আছি ... ওঃ মুন্নি, আমার সব সময় মনে হয় কিডন্যাপাররা তেড়ে আসছে ... আমায় ধরে নিয়ে যাবে ...গুম করে রাখবে ... ভয়! ভয়! ভয়!''[৬৬]

এই ভয়ের জন্যই ধৃতিকান্ত একটা 'তাড়া খাওয়া মানুষ'। হঠাৎ করেই সেই মানুষটির সামনে জেগেছিল একটু শান্তির, একটু স্বস্তির আশ্রয়ের ইঙ্গিত। কিন্তু তাকে লম্পট ভেবে স্ত্রীকে রক্ষা করতে তারই কর্মচারী সৌরভ একদল লোক এনগেজ করে রেখে গেছে নজরদারির জন্য। সেই লোকেরা –সেই গোগোল, পমমামা, লতুমাসি আর হরিশ্চন্দ্র তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। এক সময় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। মুন্নিকে তার সুনন্দার চেয়েও বড় পলিটিশিয়ান মনে হয়েছে। এমনকি তিনি সৌরভ-মুন্নির বিরুদ্ধে থানাতেও যেতে চেয়েছেন। কিন্তু মনোজ মিত্র শেষ পর্যন্ত চরিত্রের ইতিবাচক দিকটিকেই ফুটিয়ে তোলেন। তাই ধৃতিকান্তর সেই পরিচয়টিই সত্য হয়ে ওঠে, যিনি 'সত্যিই কারো সর্বনাশ করতে পারেন না'। নিজের নাট্যরচনার বৈশিষ্ট্য মেনেই সুনন্দাকেও তিনি উত্তীর্ণ করে দেন পাঠক-দর্শকের সহানুভূতিতে। নিজের ভুল সে বুঝতে পারে। অপরাধ শুধরে নেবার প্রতিশ্রুতি দেয়।

আরো দুটি নিঃসঙ্গ মানুষ আছেন এই নাটকে – পমমামা এবং লতুমাসি। বোনের ক্যারেকটারের দিকে সারা জীবন কড়া নজর রেখেছেন পমবাবু, কিন্তু বোনের জন্য পাত্র জুটিয়ে উঠতে পারেন নি। নিজেও অবশ্য বিয়ে করেন নি। বোনের নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে এনে দিয়েছিলেন একটি বেড়ালছানা। সেই আদি উৎস থেকে ক্রমে ঘর ভরে উঠেছে অসংখ্য মার্জারে – বাড়ির নামই হয়ে গেছে 'বেড়ালবাড়ি'। লতিকা থাকে সেই বেড়ালদের নিয়ে আর পমবাবু থাকেন বেড়াল খেদানো লাঠি আর দাবার বোর্ড নিয়ে। সৌরভের বউকে পাহারা দিতে এসেছে এই দুই ভাইবোন। জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে পেছন ফিরে তাকিয়ে অনেক না পাওয়ার জন্যই তাদের দীর্ঘশ্বাস পড়ে কিন্তু নিজেরাই নিজেদের সান্ত্বনা দেন ঃ ''দুজনের জীবন তো কেটেই গেল। (লতিকার মাথায় হাত বোলায়) ভাইবোনে খারাপ যে কাটল তাও তো না।'' [৬৭] তারা পরস্পরের আশ্রয়। যা কিছু কথা তারা পরস্পর ভাগ করে নেয়, একা কোনো কিছু খেতেই তাদের মন চায় না। বাইরে যতই তারা পরস্পরকে দোষারোপ করুক, একে অন্যের ত্রুটি

জোরগলায় প্রচার করুক, অন্তরের টান তাদের গভীর। তাই ধৃতিকান্ত লতিকার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে হাস্যকর করে তুলছেন দেখে পমবাবু পরম মমতায় বলেন ঃ "বুঝিস না, ধৃতিকান্ত তোকে নিয়ে তামাশা করছে, হাসির খোরাক বানাচ্ছে।"[৬৮] লতিকা এটা বোঝে না, এতটা বোকা তাকে মনে হয় না। আসলে জীবনে যা হয়নি অথচ হতে পারত – তাকে নিয়ে এ যেন একধরণের সুখবিলাস। এই বিলাসের সাময়িকতা এবং অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে সচেতন থেকেও মানুষ এর মোহ এড়াতে পারে না। লতিকা তাই ধৃতিকান্তকে 'কান্তিদা' বলে ডেকে, তার জন্য ইলিশ মাছের ভাপা রেঁধে, অসুখে সেবা করে নিজের অতৃপ্ত বাসনাকে নিয়ে যেন কিছুক্ষণ খেলা করতে চেয়েছে। ধৃতিকান্ত বারবার তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন, মুন্নির কাছে যাবার উপায় হিসেবে তাকে ব্যবহার করেছেন, কোনোরকম বাধা পেলেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন – এসব দেখে এবং সম্ভবত বুঝেও ধৃতিকান্তর জন্য স্নেহের আশ্রয় সাজাতে চেয়েছে। এ যেন একজন নিঃসঙ্গ মানুষের জন্য আরেকজন নিঃসঙ্গ মানুষের সহমর্মিতা। সেই সহমর্মিতার বশেই শেষপর্যন্ত পমবাবুও মুন্নি আর লতিকাকে পারমিশান দেন ধৃতিকান্তকে দেখতে যেতে, পরামর্শ দেন ডিফেন্স ছেড়ে অ্যাটাকে যেতে, সুনন্দা ঘোষালের আগেই ধৃতিকান্তকে অপহরণ করতে। এই সহমর্মিতাই মনোজ মিত্রের যে কোনো নাটকের প্রধান জোর।

নাটকের এই ব্যাখ্যা থেকে 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' নাটকটিকে গুরুগম্ভীর নাটক বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মনোজ মিত্রের নাটক গেঁথে তোলার মূল বৈশিষ্ট্যই হ'ল – চরিত্রগত স্বাভাবিক কৌতুকপ্রবণতাকে তিনি কখনোই বিসর্জন দেন না। আলোচ্য নাটকেও বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে কৌতুককর পরিস্থিতি এবং তদুপযোগী সংলাপের যোগ্য সঙ্গতে। পাঠক-দর্শক উতরোল হাসিতে ফেটে পড়তেও পড়তেও একাত্ম হয়ে যায় মুন্নির মতো নারীর অমর্যাদা, ধৃতিকান্তর মতো আপাতসফল মানুষের রিক্ততা আর পমমামা-লতুমাসির নিঃসঙ্গতার সঙ্গে। কৌতুকের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত বলেই বক্তব্য ভার হয়ে চেপে বসে না, স্বচ্ছন্দ নির্ভার এক আবহাওয়া সৃষ্টি করে।

সামাজিক একাঙ্কগুলির দিকে তাকালে দেখা যাবে, সেই প্রথম দিকে অর্থাৎ ছয় ও সাতের দশকে মনোজ মিত্র ক্রোধী। পরে ক্রমশ তিনি খুঁজে পেয়েছেন নিজের নাটক রচনার বিশিষ্ট ধরণটি। ১৯৬৮ সালে লেখা 'কালবিহঙ্গ' একাঙ্কটিতে তিনি রীতিমত ক্রুদ্ধ। মালিক শ্রেণি কীভাবে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন দমন করতে ধর্ম এবং কুসংস্কারকে কাজে লাগায় এবং দীর্ঘদিনের অভ্যাসে মানুষ কীভাবে নিজের প্রিয়জনকে এমনকি নিজেকেও ফাঁকি দিতে অভ্যস্ত হয়ে যায় – তাই নিয়েই তিনি এই নাটক গেঁথেছেন। ভক্তরাম টিয়েপাখিকে ত্রিকালজ্ঞ কালবিহঙ্গ রূপে প্রচার করে ব্যবসা ফেঁদেছে। ভিন্ন ভিন্ন মন্তব্য লেখা কতগুলি কার্ডে মৃদু মাদক গন্ধ মেশানো আছে। ভক্তরামের খুশিমতো যার বেলায় যে লেখা তুলতে হবে সেই কাগজের গন্ধ হাতের কৌশলে ঠিক আগের মুহূর্তে পাখিটাকে শুকিয়ে দেওয়া হয়। পাখি সেই কার্ড তোলে, কখনও কখনও মানুষের জীবনের ঘটনার সঙ্গে তা মিলেও যায় – আর ভক্তরামের পসার বেড়ে ওঠে। এই জালিয়াতির চরম বিরোধী নিজের ছেলে খোকার কাছে পরীক্ষা দিতে গিয়েও যন্ত্র চালিতের মতো হাত-সাফাই সে করে চলে। ভক্তরামের এই জালিয়াতিকে নিজেদের প্রয়োজনে কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘট ভাঙতে কাজে লাগায় মালিকপক্ষ। ত্রিকালজ্ঞ বিহঙ্গের মুখে কাগজ উঠেছে, কারখানায় যোগ দিলে ভাগ্য ফিরবে। ভাঙন শুরু হয়েছে শ্রমিকদের দলে। মালিক শ্রেণির প্রতিনিধি ডাক্তার নিপুণ কৌশলে ধর্মঘট বানচাল করতে চেয়েছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কৌশল

সফল হয় নি। ডাক্তারের পেটোয়া লোকেদের হাতে ভক্তরামের ছেলে খোকা প্রহৃত হয়েছে। নিজের চালাকির কাছে নিজেই বাঁধা পড়ে গেছে ভক্তরাম। স্ত্রী-পুত্র সবকিছু তার তলিয়ে গিয়েছে, নিজের অজ্ঞাতসারেই সে ব্যবহৃত হয়ে গেছে। বিহঙ্গকে দৈবী পাখি বলে ভেবে অন্য সকলের সঙ্গে নিজেকেও ধোঁকা দেয় ভক্তরাম, আর সেই সুযোগে স্বার্থান্বেষীরা তাকে ব্যবহার করে।

এই নাটকে শোষক-শোষিতের চিরন্তন লড়াই আছে, শোষকের পক্ষে ধর্মের সহায়তা আছে, শেষপর্যন্ত সঙ্ঘবদ্ধ শোষিত মানুষের জয়ের ইঙ্গিতও আছে। জীবনে অনেক লড়াই-সংগ্রাম করে লক্ষ্যে পৌঁছতে হয়। এইসব দৈববাণীর ভড়ং সেই লড়াইকে পিছিয়ে দেয়। তাই শ্রমিক নেতা সূর্য তীব্র বিদ্রূপ হানে এই সহজ সিদ্ধির লোভে মত্ত মানুষের দিকে ঃ

> ''সর্বদা দেখি, একগাদা লোক পথের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। এক এক সেকেন্ডে এক একটা লোকের ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাচ্ছে। দিব্যি কারবার ... না মূলধন ... না পরিশ্রম ... কত সোজা ... যেন এই মাথার ঘাম পায়ে ফেলা ... এই লড়াই ... সবটা বোকামি ! জীবনটা মাত্র একটা টিয়েপাখির মামলা ...''[৬৯]

নাটকের শেষেও সূর্যর স্পষ্ট বক্তব্য ঃ ''মানুষের ভাগ্য চিরকাল লড়াই করে ফেরাতে হয়েছে, চিরকাল তাই হবে। পাখির ঠোঁটে চাকা ঘোরে না।''[৭০] এই স্পষ্ট ও দৃঢ় বক্তব্য সত্ত্বেও একথা কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে, এ ধরণের নাটক মনোজ মিত্রের হাতে যথার্থ প্রাণ পায় না। শেষ বাক্যে ঃ ''ভাঙ... ভাঙ খাঁচা ... পখিটাকে ছেড়ে দে খোকা ... উড়িয়ে দে ...''[৭১] সংলাপও নিতান্ত আরোপিত বলেই মনে হয়। আসলে এই সময় পর্যন্তও তাঁর পথসন্ধানের কাল। কোন্ পথে তাঁর প্রতিভার মুক্তি — তা তখনও পর্যন্ত স্পষ্ট করে চিনে উঠতে পারেন নি। পাশাপাশি, সমকালীন সমাজে মালিক-শ্রমিক বিরোধ এবং সেই বিরোধে মধ্যস্থানীয়দের আখের গোছানোর চেষ্টা প্রত্যক্ষ বাস্তব। সেই বাস্তবতাকেই আশ্রয় করেছেন তিনি এই নাটকে।

মদন সিরিজের দুটি নাটক লেখেন মনোজ মিত্র ১৯৭৪ সালে — 'আমি মদন বলছি' এবং 'মদনের পঞ্চকান্ড'। দুটিই মদনের একক সংলাপ। 'খাটো ধুতি, সস্তা জামা, ছেঁড়া চটি আর ময়লা গামছায়' মদন আমাদের চিরপুরাতন গৃহভৃত্য। সেই গ্রামের মদনের দৃষ্টিতে তিনি দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন সমকালীন নাগরিক সভ্যতা এবং নাগরিক মানুষকে। গৃহভৃত্য হবার সুবাদে মনিবের জীবনের সব অলিগলিতেই মদনের অবাধ যাতায়াত। ফলে বাইরের ঝকঝকে পালিশের আড়ালে যে রংচটা রূপ তা সহজেই তার চোখে পড়ে। এই কারণেই কোথাও তার চাকরি বেশিদিন টেঁকে না। নিজের জীবনের গোপন কথা চাকরের কাছে ফাঁস হয়ে গেলে কোন্ মনিব আর সেই চাকরের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেন! তাই মদনকে বিদায় না করা পর্যন্ত তারা স্বস্তি পান না। আর মদনও ক্রমাগত বিতাড়িত হতে হতে কাজের সন্ধানে ফেরে। শহুরে কর্তাগিন্নি দু'জনেই পরনারী এবং পরপুরুষে আসক্ত। মদনকে দুজনের ওপরই স্পাইগিরি করতে হয় দুজনের নির্দেশে। কিন্তু মদন কারো কাছেই সত্য প্রকাশ করে না। একদিন নিজেদের অপকর্ম নিয়ে মুখোমুখি পড়ে যান কর্তা-গিন্নি। প্রথমে তীব্র চিৎকার, গালাগাল আর শাসানি আর তারপর চোখের জলে ক্ষমা প্রার্থনা। যখন আমে-দুধে মিশে গেল তখন উভয়েরই ক্রোধের কারণ মদন। কারণ ঃ ''এরপরে সাহেব কি মেমসাহেব আর মদনের দিকে

চোখ রেখে কথা বলবেন কী করে? মদন যে তেনাদের গোপন জীবনের সাক্ষী।"[৭২] বিতাড়িত মদন এরপর কাজ পায় কুঁদো মস্তানের কাছে। নিজের এলাকায় কুঁদো দোর্দন্ডপ্রতাপ। সামাজিক নানা বিরোধ নিষ্পত্তি থেকে শুরু করে ভাড়াটে উচ্ছেদ পর্যন্ত কুঁদোর কর্মকান্ডের অন্তর্গত। শিক্ষাক্ষেত্র কুঁদোর খাজনা আদায়ের সবচেয়ে বড়ো তালুক। ভর্তি থেকে শুরু করে পরীক্ষা পর্যন্ত সবই তার 'আন্ডারে' চলে, যদিও সে নিজে প্রথম শ্রেণিও উত্তীর্ণ হয় নি। রাজনৈতিক নেতারাও ভোট-বৈতরণী পেরোতে একান্তভাবে নির্ভর করেন এই কুঁদো মস্তানের ওপর। নির্বাচনে কুঁদো যাকে সাহায্য করেছিল, নানা চেষ্টা সত্ত্বেও যখন তিনি হেরে গেলেন তখন ভয়েই মদন পালিয়ে গেল। কিন্তু পরে দেখা গেল, মদন মিছেই ভয় পেয়েছিল — জার্সি বদল করে কুঁদো ঢুকে গেছে জয়ী প্রার্থীর দলে।

মদনের তৃতীয় মনিব অচিনবাবু। সেই অচিনবাবুর স্ত্রী লায়লা। সংসারে শত অভাব সত্ত্বেও ফ্যাশনে তার কোনো কম নেই। বাড়িতে র‍্যাশন ওঠে না, বাজার হয় না — অথচ লায়লা বৌদির সাজগোজের বিরাম নেই। পাড়ায় 'প্রেস্টিজ' রাখতে কালার টিভি তার চাই, টেলিফোন না হলেও চলে না। লজ্জা নিবারণ করতে অচিনবাবু টেবিলক্লথ জড়িয়ে ঘরের কোণে শুয়ে থাকেন আর যেখানে যা কিছু সঞ্চয় ভেঙে বৌয়ের আব্দার মেটান। বিয়ের সময় নিজের উপার্জন বাড়িয়ে বলার খেসারত এভাবেই তিনি দিয়ে চলেন। নিজে যখন কঠিন অসুখে পড়লেন তখন তার স্ত্রীর একবার কাছে বসারও সময় নেই — সে তখন এক বিয়েবাড়িতে যাবার জন্য হাইহিল পরে হাঁটা অভ্যাস করছে। মদন এ সবই সহ্য করেছিল কিন্তু যেদিন অচিনবাবু তার কাছে ওষুধ কেনার টাকা চাইলেন সেইদিন অচিনবাবুরই দেওয়া চার মাসের মাইনে হাতে তুলে দিয়ে মদন বিদায় নিয়েছে। যে মনিব চাকরের কাছে হাত পাতেন তার কাছে মদন নিরাপত্তা বোধ করে কী করে! চতুর্থবারে মদন আশ্রয় পেয়েছে দাড়িবাবার কাছে। দাড়িবাবার দাড়িতে সুমিষ্ট দুধ ঝরে। সমস্যাগ্রস্ত মানুষ একবার সেই দাড়ি চুষে দুধ পান করলেই সব সমস্যা থেকে মুক্তি পায়। তবে সেই দাড়ি চোষার সুযোগ মেলে উপযুক্ত দক্ষিণার বিনিময়ে। যে যত পাপই করুক, একবার দাড়ি চুষলেই সব পাপ থেকে মুক্তি। মদনও ভেবেছিল, বাবার পদসেবা করে দাড়ি চোষার সুযোগ নিয়ে সব পাপ-তাপ থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু দাড়ি চুষতে গিয়ে শেকড় সুদ্ধ তিনহাত লম্বা দাড়ি উপড়ে তার হাতে উঠে এলো। স্পঞ্জের দাড়ির মধ্যে দুধের থলি রেখে বাবা ভক্তদের ধোঁকা দেন। স্পঞ্জের সেই গুরুকে ত্যাগ করে মদন আবার পথে নামে। পঞ্চকান্ডের শেষ কান্ডটি মদনের জীবনে ঘটেছে গদাই পালোয়ানের বাড়িতে। সারাদিনে প্রচুর খান গদাই পালোয়ান আর মদনকে শরীর-স্বাস্থ্য রক্ষা সম্পর্কে বিবিধ উপদেশ দেন। নিজে অত্যন্ত দুর্বল বলে গদাই পালোয়ানের আশ্রয়ে থেকে মদন অত্যন্ত খুশি। কিন্তু রাত নামতেই বোঝা গেল, জগতশ্রী পালোয়ান রাতের বেলা ভূতের ভয়ে ভীত। গোঁ গোঁ করতে করতে সে পড়েছে মদনের বুকের ওপর। মদন কোনোক্রমে ভূতের ভয় দেখিয়ে নিজেকে মুক্ত করে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে। যে গদাই দাবনার শোভা বাড়াতে একাই হাটবাজার গিলে ফেলছে, যার খাদ্যের সিকিভাগ পেলে মদনের গাঁয়ের মানুষ বর্তে যেত, যার 'ভেতরে ফোঁপরা, বাইরে পোদর্শন'— তার কাছে আর ফিরে যাবে না মদন। তাই সে আবার বেকার।

'আমি মদন বলছি'-তে মদনের গ্রাম এবং পরিবারের পরিচয় দিয়েছেন মনোজ মিত্র। হাসনাবাদ

লাইনের তেঁতুলে-বিষ্টুপুর গ্রামের ঈশ্বর ঘোঁতন মন্ডলের সেজো ছেলে মদন মন্ডল। গ্রাম বড়ো 'অসোন্দর'। সেখানে রাস্তাঘাট নেই, ব্রীজ নেই, আলো নেই, চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। তাই কোমলচিত্ত, সুন্দরের পিপাসু মদন সুন্দরের খোঁজে আসে শহর কোলকাতায়। কিন্তু ক্রমে তার কাছে উন্মোচিত হয় এই শহরের প্রকৃত রূপ। ঝকঝকে পালিশের আড়ালে কদর্য মুখটাকে আবিষ্কার করে সে বিস্মিত, হতভম্ব হয়ে পড়ে। 'মদনের পঞ্চকান্ড'তে মদন মনিবদের দ্বারা বিতাড়িত হয়েছে আর 'আমি মদন বলছি'-তে সে নিজেরই একের পর এক মনিব 'ক্যান্সেল' করেছে। প্রথম সে ঠাঁই পেয়েছিল রেলের ঘুষখোর বড়বাবুর বাড়িতে। রেলের বসার আসন, আলো, পাখা – সবই এসে স্থান পায় বড়বাবুর বাড়িতে। মদন সেসব গোছায় আর মনের সুখে গান গায়। কিন্তু যেদিন সে মনিবের ডায়াবেটিসের কথা জেনেছে সেদিনই চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছে। কারণ যে সুন্দরের ছবি সে মনের মধ্যে এঁকে রেখেছে তার সঙ্গে ডায়াবেটিস খাপ খায় না। একাধিক মনিব 'ক্যান্সেল' করার পর মদন ফটিক দালালের হাত ধরে এসে ওঠে চিত্রাভিনেত্রী নন্দিনী দেবীর বাড়িতে। যে নন্দিনীর সৌন্দর্যে বহুদিন থেকেই মুগ্ধ মদন, তাকে একেবারে সামনাসামনি দেখা। এ যে একেবারে কল্পনারও অতীত। মদন সারাদিন কাজ করে আর দু'চোখ ভরে সেই সৌন্দর্য দেখে। মনে তার দারুণ সুখ। লুকিয়ে-চুকিয়েও সে দেখে নন্দিনীদেবীর সৌন্দর্য। এই দেখাই তার কাল হ'ল। ড্রেসিংরুমের দরজার ফাঁক দিয়ে চোখ চালিয়ে মদন তো অবাক – যাকে নিয়ে সবাই এত উচ্ছ্বসিত তার মাথায় কিনা একটাও চুল নেই – বসে বসে সে কিনা টাকের ওপর ফলস চুল সাজাচ্ছে। সুন্দরের আবরণ খসে যেতেই মদন সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েছে। এসে জুটেছে একেবারে হরনাথবাবুর বৈঠকখানায়। সেখানেও সে মাস তিনেকের বেশি টিঁকতে পারে নি। তারপর থেকে একের পর এক মনিব সে বাতিল করেছে, অনাহারে মৃতপ্রায় হয়েছে কিন্তু অসুন্দরের দাসত্ব করেনি। সেই সময়ই সে কোলকাতার রাস্তায় দেখেছে ছুরি-বন্দুক আর বোমবাজি, দেখেছে গাড়িতে আগুন ধরানো আর স্ট্যাচু ভেঙে ফেলা। মানুষকে ক্রমাগত অসুন্দর হতে দেখে মদন পীড়িত হয়েছে। শহরে থেকেই সে জেনেছে গ্রামের সংবাদ – সেখানে মড়ক লেগেছে, ফসল যা হয়েছে মিলিটারির খাবার জন্য ক্রোক করা হয়েছে, তার বাবা ধান নিয়ে লড়াই করতে গিয়ে পুলিশের গুলি খেয়ে মরেছে। মদন কিন্তু কিছুতেই আর ফিরবে না তেঁতুলে-বিষ্টুপুরে। সে তখন কলেজের মাস্টার ডাকসাইটে পন্ডিত হরনাথবাবুর বাড়িতে কাজ করে। সেখানে বৈঠকখানায় কত বিচিত্র ব্যক্তির আড্ডা, কত বিষয়ে রাজা-উজির মারা। কিন্তু সেখানেও যে প্রদীপের নিচে অন্ধকার। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়ার সময় বেরিয়ে আসে তাদের কদর্য চরিত্রের কথা। অশ্লীল ভাষায় দু'জনে আক্রমণ করে দু'জনকে। সুন্দরের সন্ধান না পেয়ে মদন সেখান থেকেও বেরিয়ে পড়ে। সেখান থেকে মদন যায় নেতা 'কালীনাথ বোক্ষোচারী'র কাছে। মদনদের তেঁতুলে-বিষ্টুপুর থেকে ভোটে জিতে কালীনাথ এখন দেশসেবক। সেই দেশসেবকের খাস চাকর হয়ে মদনের উপার্জনও ভালোই। কারণ চাকরকে খুশি না রাখলে বাবুর কাছে পৌঁছনো যায় না। একদিন সে দেখে ফেলে স্বামীর ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য সাহায্য চাইতে আসা এক অসহায় মহিলা কীভাবে 'গান্ধীবাবা' কালীনাথের লালসার শিকার হয়। কাঁপতে কাঁপতে মদন সিঁড়ির নিচে গিয়ে ঢুকেছে। সে বুঝেছে ঃ"এ সংসার পচে গেছে ... আমি গেঁড়ে মদন ; পচা কাঁঠালে সোন্দর কোষ খুঁজতিছি।"[৭৩] তাই আর সে বাড়ি পাল্টাবে না, মনের মতো বাবু না পেয়ে সে এবার বাবুদের মনের মতো হবে। কিন্তু মাঝরাতে মাতাল কালীনাথ সিঁড়ির নিচে থেকে টেনে বের করেছে মদনকে, পুলিশ ডেকে চুরির অপরাধ ধরিয়ে দিতে গেছে মদনকে, নিজের অপকর্মের

কোনো প্রমাণ সে রাখবে না। কোনোমতে পালিয়ে মদন নেমেছে রাস্তায়, ঘোড়দৌড়ের মাঠের পাশে কয়েকজনকে দেখে সব খুলে বলে সাহায্য চেয়েছে। কিন্তু তারাই যে কালীনাথের জাগ্রত যুবশক্তি। রেসে যা হেরেছে তার অন্তত পঁচিশ টাকা তারা বিকভার করতে চায় মদনকে 'ভেসেকটমি' করিয়ে। পথ খুঁজে পায় না তেঁতুলে-বিষ্টুপুরের গেঁড়ে মদন – তাকে কি খোজা হয়ে এই শহরে বন্দী হয়ে থাকতে হবে – এই প্রশ্নের মধ্যেই নাটক শেষ হয়।

এই দুটি নাটকে মনোজ মিত্র বিশ শতকের সাতের দশকের অস্থির সময়ে নগর কোলকাতার সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ত্রুটি ও অসঙ্গতিগুলিকে তুলে ধরেছেন গ্রাম্য যুবক মদনের দৃষ্টিতে। বাইরে থেকে আসা যে কোনো মানুষের মতোই মদনের চোখেও প্রথম পড়েছে শহরের ঝাঁ চকচকে বাইরের রূপটি, কিন্তু গৃহভৃত্য হবার সুবাদের সে যত কাছে থেকে দেখেছে মানুষগুলিকে ততই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নাগরিক সভ্যতার কদর্য দিকটি। বাইরের পালিশের আড়ালে মানুষের অন্তঃসারশূন্য রূপ তার বিশ্বাসবোধকে আহত করেছে। বিচিত্র মদনের অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতার সূত্রেই প্রকাশ পেয়েছে নাট্যকারের সমাজ-সচেতনতা। সমকালীন নগর কোলকাতায় তথাকথিত শিক্ষিত মানুষদের চারিত্রিক যে অধঃপতন দেখা গিয়েছিল, পরিবার-জীবনে যা রোপণ করছিল অশান্তির বীজ, তা দেখেছে মদন অভিজাত অঞ্চল নিউ আলিপুরে রায়সাহেবের বাড়িতে এবং কলেজ স্ট্রীটের বিখ্যাত কলেজের ডাকসাইটে অধ্যাপক হরনাথবাবুর বাড়িতে। ভোগবাদ সমাজে তখন সবে থাবা বসাতে শুরু করেছে। সেই ভোগবাদের সর্বনাশা ফল মদন প্রত্যক্ষ করেছে অচিনবাবুর স্ত্রী লায়লার মধ্যে। বাড়িতে প্রতিদিন চলছে ঝিঙেপোস্ত, অথচ যে ভাবেই হোক রঙিন টি.ভি চাই, টেলিফোন চাই। অন্তঃসারশূন্য সেই আড়ম্বরকে মদন ব্যাখ্যা করে তার মতো করেই – "ঘরেতে শাক জোটে না, বৈঠকখানায় লাল বিছানা।" এই বাবুয়ানিকে, এই ভোগসর্বস্বতাকে মনোজ মিত্র সমাজের ক্ষতিকারক দিক হিসেবেই দেখেছেন এবং মদনের মাধ্যমে তাকে কৌতুকে-ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছেন। ঘুষখোর রেলের বাবু, ভণ্ড সাধু দাড়িবাবা, গান্ধীবাবা কালীনাথ ব্রহ্মচারী, মস্তান কুঁদো – সকলেরই মুখোশের আড়ালের মুখটাকে দেখেছে মদন আর শিউরে শিউরে উঠেছে – এত অসুন্দর নাগরিক সভ্যতা, এত কুৎসিত সেখানকার মানুষেরা!

স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মদন-সিরিজের এই দুটি নাটকে সমাজের বিভিন্ন প্রান্তকে ছুঁয়ে গেছেন মনোজ মিত্র। বাংলাদেশের যে গ্রামগুলি একসময় ছিল প্রাণশক্তির উৎস, সেই গ্রামের দুর্দশার চিত্র ফুটেছে মদনের বর্ণনায় ঃ "খানাখন্দ ডোবা নালা ... বর্ষাকালে এই তক্ পাঁক ... পাটপচা দুর্গন্ধ ... ঘরে হাঁড়ি চড়ে না ... কোমরের কাপড় মাথায় তুলে পার হতে হয় কৈখালির বিল ..."[৭৪] চিকিৎসা বলতে সেখানে হাতুড়ে হেকিম। যুদ্ধের সময় গ্রামের ফসল ক্রোক করা হয়েছে মিলিটারির খাবার জন্য, লড়তে গেলে জুটেছে পুলিশের গুলি। বিদ্যুৎ সেখানে দূরকল্পনা, বিজলি বাতির খাম্বাও তখনো ঢোকে নি গ্রামে। সেই কংকালসার গ্রাম থেকে, অসুন্দর গ্রাম থেকে গেঁড়ে মদন এসেছে নগর কোলকাতায় -- এসেছে সুন্দরের আশায়। কিন্তু সাতের দশকের সেই উত্তাল সময়ে নগরজীবনে কোথায় সৌন্দর্য? সেখানে তখন চলছে মস্তানরাজ, চলছে রাজনীতিক-মস্তানের নিবিড় যোগসাজশ। নগরে মস্তান যেন গ্রামের জমিদারের মতো প্রতাপশালী। এককে মস্তানের এক এক অঞ্চল। কয়েকজন মস্তান এলাকা ভাগ করে তখন কোলকাতা শাসন করে। সমকালের কোলকাতায় এ ছিল নিতান্ত বাস্তব। সেই বাস্তবতাকেই

মনোজ মিত্র তুলে ধরেছেন মদনের জবানীতে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা তখন শিক্ষায়। ভর্তি থেকে পরীক্ষা — সবেতেই মস্তানের একচ্ছত্র প্রভাব। অশিক্ষিত সেই মস্তানদের শিক্ষাজগৎ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মদন বলে : " ও বাবু যারা মড়া পোড়ায় তারা তো আজ্ঞে 'ক' অক্ষর চেনে না, তবে তারা বি. এ., এম. এ. পাশ করা লোক পোড়ায় কি করে ? আপুনিও তেমুনি বাবু ইস্কুল কলেজের মড়ি পোড়াচ্ছেন।"[৭৫] এই ধরণের সংলাপ মনোজ মিত্রের বিশিষ্ট রচনাভঙ্গিটিকে চিনিয়ে দেয়। বুঝেই খোঁচা দেয়, না না-বুঝে, তা যেন ঠিক ধরে উঠতে পারা যায় না। এই মস্তানদের ঘাড়ে চেপেই তখন ভোটে জেতেন নেতারা — ফলে নেতাদের কাছে তারা পরম আদরের জন। মোটরবাইকে চেপে মস্তানদের ওয়াগন ভাঙতে যাওয়া, শিক্ষাক্ষেত্রে মাস্তানি, ভোটের বাজারে জিপ হাঁকিয়ে মস্তানদের ঘুরে বেড়ানো, দেশনেতার 'জাগ্রত যুবশক্তি'র উল্লেখ, ভেসেকটমি-আতঙ্ক প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের একটি বিশেষ সময়ের সামাজিক অবস্থাকেই স্মরণ করায় সত্য, কিন্তু সময় এবং রাজনীতির পরিবর্তনে সমাজের আদৌ কোনো মূলগত পরিবর্তন ঘটেছে কি? আজো কি ভণ্ড দাড়িবাবারা সমাজের বুকে জাঁকিয়ে বসে নেই, আজো কি রাজনৈতিক নেতাদের আশ্রয়ে সমাজবিরোধীরা লালিত হচ্ছে না, বাইকবাহিনী কি রাজনীতির অনুষঙ্গে আজো ত্রাসের কারণ নয়? আসলে রাজা বদলালেও দিন বদলায় না। এই নাটক তাই সমকালকে ধারণ করেও চিরকালের।

১৯৮২ সালে লেখা 'কাকচরিত্র' একাঙ্কটিতে মনোজ মিত্র এক ভূয়োদর্শী কাক চরিত্র সৃষ্টি করে তার মাধ্যমে আবিষ্কার করেছেন সমাজের গভীরে স্থিত ভিন্নতর সত্যকে। বাস্তববাদী নাটকার বলে নিজেকে দাবি করেন রাষ্ট্রপতি-পুরস্কারপ্রাপ্ত নাট্যকার ব্যোমকেশ ভৌমিক। তিনি গর্ব করেন : "আমি ব্যোমকেশ ভৌমিক বাস্তব জীবন থেকে তুলে এনে বসাই ! যাকে বলে বাস্তববাদী ... জীবনবাদী লেখা ..."[৭৬] কিন্তু কাকের দৃষ্টি দিয়ে তিনি যখন জগৎকে চেনেন তখন উপলব্ধি করেন : "গজদন্ত মিনারে বসে আমি এতোকাল বাস্তববাদী লেখক হবার গর্ব করছিলাম।"[৭৭] তিনি নিজের নাটকে নায়ক করেছিলেন বেঁটেখাটো দ্বিজুবাবুকে। কারণ দ্বিজুবাবু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে লোকের বাড়ির আরশোলা ছারপোকা টিকটিকি মেরে লোকের উপকার করেন। ছোটোখাটো মানুষের এইসব ছোটোখাটো মহত্ত্বকে নিয়েই নাটক লিখতে চান ব্যোমকেশ। কিন্তু দ্বিজুবাবুর ঘর থেকে কাক যে মানিব্যাগ, যে দামী পেন, যে হাতঘড়ি নিয়ে এসেছে সেগুলো তো ব্যোমকেশেরই। বুক-র‍্যাকের উই মারতে এসে দ্বিজুবাবু সেগুলো সরিয়েছেন। কাকই জানিয়েছে, দ্বিজুবাবু এই পরোপকারের নাম করে লোকের বাড়ি থেকে বিভিন্ন জিনিস হাতিয়ে নিয়ে আসে আর দ্বিজুর বৌ সব বেচে দেয়। নিজের নায়কের এই পরিচয় পেয়ে হতভম্ব ব্যোমকেশ সমস্ত লেখাটা নষ্ট করে ফেলেছেন। এরপরই তিনি সন্ধান পেয়েছেন আরেক নায়কের। তাঁরই পাড়ার ডাক্তার দাশ নিজের বাড়িতে দুর্ঘটনায় মৃত রাজমিস্ত্রি ছেদিলালের মর্মর মূর্তি স্থাপন করে ব্যোমকেশকে দিয়েই তা উদ্বোধন করাতে চান। শ্রমজীবী মানুষের প্রতি এই ভালোবাসাই ডাক্তার দাশকে মহৎ করে তোলে ব্যোমকেশের দৃষ্টিতে। তিনি ডাক্তার দাশকে নায়ক করেই নাটক লিখতে বসে যান। কিন্তু কাক তো ভূয়োদর্শী। ডাক্তারের পাশের বাড়ির অ্যান্টেনায় বসে সে দেখেছে প্রকৃত সত্য। কালো টাকা রাখবার গোপন কুঠুরি বানিয়ে দিয়েছিল ছেদিলাল, কিন্তু উপযুক্ত মজুরি না পেয়ে লোক জানাজানির ভয় দেখালে মই ঠেলে ফেলে দিয়ে ছেদিলালকে খুন করেছে ডাক্তার। ব্যোমকেশ আবার বুঝেছেন — বাইরে থেকে মানুষকে কতটা কম বোঝা যায়! যে ডাকাতেরা ব্যোমকেশের নিরুদ্দেশ মামা এবং বর্তমানে সাধু পরিচয়

দিয়ে ব্যোমকেশের কাছে 'শেলটার' চেয়েছিল তাদেরও প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটন করেছে কাক। কিন্তু দ্বিজুবাবু বা ডাক্তার দাশ বা ডাকাত তো বাইরের লোক, ব্যোমকেশ যে নিজের ঘরের লোকটিকে চিনতেও ভুল করেছেন। নিচের তলায় দরজা বন্ধ করে দুপুরবেলায় রেডিওতে তারই লেখা নাটকের অভিনয় শুনছে তার স্ত্রী – এরকমই মনে করতেন ব্যোমকেশ। কিন্তু কাক-ই তাকে জানিয়েছে, নাটক নয় – নিচে যা ঘটছে তা চরম বাস্তব। প্রত্যেক দুপুরে ব্যোমকেশ যখন ওপরে বসে লেখেন, তখন নিচে তার স্ত্রীর কাছে আসে অন্য পুরুষ। এত সত্য সহ্য করার ক্ষমতা মানুষের নেই, তাই বোধহয় মানুষ বানিয়ে তোলো সত্যকেই প্রকৃত সত্য বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। নিজের চেতনাসহ সেই সত্য যেদিন ভেঙে পড়ে সেদিন ব্যোমকেশের মতোই সকলে রক্তশূন্য মুখে ফ্যাকাশে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

এই ছোটো নাটকটিতেও মনোজ মিত্র তাঁর সমাজচেতনার পরিচয় দিয়েছেন। সামাজিক মানুষের মুখ আর মুখোশের খেলা উন্মোচন করেছেন ভূয়োদর্শী কাকের দৃষ্টিতে। আবার এই আস্তাকুঁড়-ঘাঁটা কাকই হয়ে উঠেছে নাটকে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি, যে মানুষ ভুখা, যার কাছে ব্যোমকেশের রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এক টুকরো রুটি ঃ "রাষ্ট্রপতি তোমায় পুরস্কার না দিয়ে আমায় যদি একখানা রুটি দিত গা।"[৭৮] একজন সাধারণ মানুষের জীবনদৃষ্টি কত সহজ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে এখানে। যে মানুষেরা বিপ্লবের কথা, সমাজতন্ত্রের কথা বলে তাদের প্রতি ব্যঙ্গের তীর নিক্ষিপ্ত হয়েছে ডাক্তার দাশের অন্তঃসারশূন্য বিপ্লবী বাণীতে ঃ "বিপ্লব চাই ... খেটে খাওয়া মানুষকে মর্যাদা দিতে চাই আমাদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব! এই ঘূণধরা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কঙ্কালের ওপর বসে তারই সাধনা করতে হবে ব্যোমকেশবাবু! কায়েমী স্বার্থ নিপাত যাক"[৭৯] যে কোনো ব্যাপারেই মেকি বিপ্লবিয়ানা দেখিয়ে এই মানুষেরা বিপ্লবকে খেলো করে তুলেছিলেন। সত্য-মিথ্যা নিয়ে এই নাটকে যেন ব্যোমকেশ আর কাকের মধ্যে এক অদ্ভুত খেলা চলেছে। যে সত্যজ্ঞান ব্যোমকেশের গর্বের কারণ ছিল তা কাকের দৃষ্টিতে একের পর এক মিথ্যে বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। নিজের স্ত্রী সম্পর্কে শেষতম মোহভঙ্গটি ব্যোমকেশের কাছে চরম আঘাত। এই সত্যের মুখোমুখি হতে তিনি সাহস পান নি। তাই কাকের আহ্বানে নিচে যান নি সত্য যাচাই করতে। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে থাকলে তো সত্য কখনো মিথ্যে হয়ে যায় না। সত্য যতই রূঢ় হোক, তার মুখোমুখি হতে হয় – সেটাই জীবন। জীবনের সেই শিক্ষাই ব্যোমকেশকে দিয়েছে কাক ঃ

> "নিজের ভেবে পরের ডিমে তা দিই ... ফোটাই ... আদর করি ... তারপর একদিন কুহু কুহু!
> দুখানা ডানা নাড়তে নাড়তে তারা চলে যায়, পিছু ফিরেও চায় না ... কোন্ আকাশে হারিয়ে যায় ...
> (থেমে, গলার বিষণ্ণতা ঝেড়ে ফেলে) তা বলে ভেঙে পড়লে চলবে কেন? যা সত্যি তার মুখোমুখি
> দাঁড়াতে হবে.."[৮০]

মনোজ মিত্র বলতে চান, সংসার আসলে কাকের মতোই পরের ডিমে তা দেওয়া – ডানায় বল হ'লে মায়া-মমতা ভুলে সকলেই উড়ে যাবে নিরুদ্দেশের পানে।

'প্রভাত ফিরে এসো' (১৯৮৮) একাঙ্কটিতে দেখানো হয়েছে, ক্রমাগত অপব্যবহার কীভাবে মানুষের সরলতার অপমৃত্যু ঘটায়। সৌম্য-ঝুমুরের বসার ঘরে শুরু হয়েছে এই নাটক, যে ঘরটিকে

ঝুমুর সাজিয়েছে অন্যের কাছ থেকে চেয়ে আনা আসবাবে এবং নিজেও সেজেছে ধার করা অলঙ্কারে। এই সাজসজ্জার পেছনে বিশেষ একটি উদ্দেশ্য আছে। নাট্যকার সৌম্যকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল ঝুমুর। কোলকাতার উত্তাল সময়ে নতুন থিয়েটার, রাগী থিয়েটার যখন সমাজদেহে নির্মম চাবুক চালাচ্ছে তখন দুর্দান্ত সৌম্য নাটক লেখে, নাটকের দল চালায়। সেই সৌম্য এবং ঝুমুরের মধ্যে প্রেম হয় এবং তারপর বিয়ে। কিন্তু বিয়ের পরই সৌম্যর হার্টের গোলমাল দেখা দিল। কৃত্রিম হৃদ্‌যন্ত্র বসানোর জন্য যে টাকা প্রয়োজন তা ঝুমুর আদায় করেছিল নিজের বিধবা মায়ের প্রেমিক নীলুমামার কাছ থেকে। এজন্য সে স্কটিশ কলেজে তার একদা সহপাঠী গ্রাম্য সরল প্রভাতের সঙ্গে নিজের এক মিথ্যে সম্পর্কের ফাঁদ পেতেছিল। কারণ কেলেঙ্কারির ভয় না দেখালে নীলুমামার থেকে টাকা আদায় করা যেত না। স্কটিশ কলেজে ঝুমুরকে দেখে, ঝুমুরের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ছিল প্রভাত। গ্রাম্য প্রভাতের সেই সরল মুগ্ধতাকে ব্যবহার করে ঝুমুর এবং তার শহুরে বান্ধবীরা তাকে বানিয়েছিল 'মোর্গা'। বারাসাতে বাবার চিংড়ি মাছের কোল্ড স্টোরেজের ক্যাশ ভেঙে প্রভাত আসত প্রেম জমাতে আর বসন্ত কেবিন-সাঙ্গুভেলিতে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে, প্রচুর খেয়ে ঝুমুর সেই ক্যাশের 'সদ্‌গতি' করতো। প্রভাতের সরল ধারণায়, সেটাই ছিল প্রেম। নিজের মিথ্যে জন্মদিনের কথা বলে ঝুমুর প্রভাতের কাছ থেকে হাতঘড়িও আদায় করেছিল। আজ দীর্ঘদিন পর ঝুমুরের সেই মিথ্যে জন্মদিনকে মনে রেখে প্রভাত আবার আসবে বলে চিঠি দিয়েছে। কুয়েতে তেলের ব্যবসা করে সে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেছে। ঝুমুর আবার ফাঁদ পেতে প্রস্তুত। এবারে তার প্রয়োজন পঁচিশ হাজার টাকা। প্রভাতের বুকের পেসমেকারটা গোলমাল করছে। টাকাটা না পেলে যে কোনো মুহূর্তে তা 'ডেড-স্টপ' হয়ে যেতে পারে। প্রভাতের নির্বোধ সরলতাই এখন একমাত্র ভরসা। ঝুমুর নিশ্চিত, আজো প্রভাত তার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে অনায়াসে টাকাটা দিয়ে দেবে। প্রভাতের আসাকে কেন্দ্র করে ঝুমুরের উচ্ছ্বাস দেখে সৌম্য প্রথমে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, তারপর নিজের চিকিৎসার টাকা পাওয়া যাবে জেনে উল্লসিত ও উৎকন্ঠিত, শেষে প্রভাতকে ঠকাবার জন্য ঝুমুরের পরিকল্পনা শুনে ব্যথিত ও গ্লানিজর্জর। সৌম্যর এই আচরণ ঝুমুরের বিবেককে জাগিয়ে তোলে, প্রভাতকে নিয়ে নিষ্ঠুর অভিনয়ের পীড়ন তাকে বিদ্ধ করে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে যখন প্রভাত আসে তখন ঝুমুরের মানসিকতা বদলে গেছে। বিনা প্রয়োজনে বিনা স্বার্থে আজ প্রভাতের সঙ্গে সে সময় কাটাতে, গল্প করতে, খাওয়াতে চায়। কিন্তু অনেক বড় চমক অপেক্ষা করে ছিল ঝুমুরের জন্য। বাইরে সেই সরল নির্বোধ গ্রাম্য প্রভাতের রূপ থাকলেও প্রভাত নামে মানুষটা ভেতর থেকে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সবাই ঠকিয়ে ঠকিয়ে তাকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। প্রবঞ্চিত সরলতা তাই আজ ক্রূর হয়ে উঠেছে। নিজের সেই পুরনো রূপটাকে সামনে রেখে চেনা-আধচেনা মানুষদের বাড়িতে গিয়ে সে এখন ডাকাতি করে। কুয়েত, তেলের ব্যবসা ইত্যাদি সবই গল্পমাত্র। ঝুমুরকেও সে মুখ-হাত বেঁধে রেখে ঘরের সব জিনিস নিয়ে চলে যায়। হতভম্ব ঝুমুর বিস্মিত হয়ে দেখে সরলতার অপমৃত্যু — যে মৃত্যু ঘটানোর দায় আরো অনেকের সঙ্গে সমানভাবে তারও।

প্রভাত এই নাটকে সরলতার প্রতীক। মানুষের অপব্যবহারে সরলতা কীভাবে কদর্য হয়ে যায় — তাই দেখানো হয়েছে এই চরিত্রটির পরিণতির দ্বারা। সামাজিক ব্যবস্থায় প্রভাতের স্নিগ্ধতা রক্ষিত হতে পারে না, শেষ পর্যন্ত প্রভাতকে ফিরিয়ে আনার আর্তি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় মানুষেরই অপকর্মের

ফলে। সিরিয়স বিষয়কেও কৌতুকস্নিগ্ধ করে প্রকাশেই মনোজ মিত্র সিদ্ধহস্ত। কিন্তু কৌতুকধারা যেখানে স্তব্ধ সেখানেই তাঁর দুর্বলতা প্রকট। আলোচ্য নাটকটিও সেরকম একটি দুর্বলতার নিদর্শন। দু'একজায়গায় সংলাপের দ্যুতি নাট্যকারের জাত চেনালেও সামগ্রিকভাবে কোথায় যেন অপূর্ণতার খেদ থেকে যায়। বিশেষভাবে লক্ষণীয় গঠনকৌশলের দুর্বলতার দিকটি। অনেক জায়গাই অনাবশ্যক দীর্ঘ। ফ্ল্যাশব্যাকে ঝুমুরের মা এবং নীলুমামার দৃশ্যটি গঠনগত দিক থেকে নাটককে শিথিল করেছে। শেষ পর্যন্ত এই একাঙ্কটি তাঁর খুব সার্থক সৃষ্টি বলে গণ্য হবে না।

'বৃষ্টির ছায়াছবি' (১৯৯৩) একাঙ্কটিতে মনোজ মিত্র ধরেছেন একটু উচ্চবিত্ত সমাজকে। সল্টলেকের একটি ফ্ল্যাটে একা থাকে অভিনেত্রী চন্দনা। অভিনেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার পথে যাদের আনুকূল্য বিতরণ করতে হয়েছে তাদের অন্যতম প্রযোজক রাহুলবাবু। তিনি মাঝেমাঝেই চন্দনার ফ্ল্যাটে রাত কাটান, একপ্রস্থ জামাকাপড়ও তার এখানেই থাকে। এক ঝড়বাদলের সন্ধ্যায় চন্দনা নিজের ফ্ল্যাটে রাজা অয়দিপাউস নাটকে রাণী ইয়োকাস্তের ভূমিকার মহড়া দিচ্ছে। হঠাৎ পাশের ফ্ল্যাটের ঈশিতা ফোন করে জানায়, বর্ষার সন্ধ্যায় সে যখন বাচ্চার খাবার কিনতে বেরিয়েছিল তখন 'মাথা ভর্তি চুল গাল ভর্তি দাড়ি কালো ট্রাউজার নীল শার্ট' একজন লোক তার ছাতার তলায় ঢুকে গিয়ে প্রশ্ন করেছে - 'চিনতে পারো'? ফোনালাপ চলতে চলতেই সেই মানুষটি উপস্থিত হয়েছে চন্দনার ফ্ল্যাটের দরজায়, মুখে সেই একই প্রশ্ন - 'চিনতে পারো'? চন্দনা কিছুটা যেন মজা করতেই লোকটিকে ভেতরে ডেকে আনে, কৌতুক করেই তাকে চিনতে পেরেছে বলে জানায়। লোকটি চন্দনাকে নিজের স্ত্রী বলে ভুল করতে থাকে, যে স্ত্রী মানসিক অসুস্থতার জন্য তাকে ছেড়ে চলে গেছে। চন্দনাও লোকটির ভুলে সায় দিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু লোকটি যখন ঘর ছেড়ে আর যেতে চাইছে না তখন মজা কেটে গিয়ে আস্তে আস্তে জাগতে থাকে বিরক্তি। এদিকে শুটিং-এর জায়গায় দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে চন্দনার ফ্ল্যাটে এসেছেন রাহুল এবং বলা বাহুল্য, সেই পাগল লোকটিকে দেখে খুশি হন নি। রাহুল-চন্দনার জীবনের ঘটনার সঙ্গে পাগল মানুষ মিশিয়ে দেয় নিজের স্ত্রী নন্দিতার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার কাহিনি। চন্দনা বুঝতে পারে, পৃথিবীর সব গল্পই অদ্ভুতভাবে ঘুরে ফিরে একরকম। তার মনে হয় – 'সব চন্দনারাই নন্দিতা ... সব নন্দিতারাই ...'। ক্ষুধার্ত পাগল মানুষকে চন্দনা যখন খেতে দেয় তখন জানালায় হঠাৎ ভেসে ওঠে পুলিশ সার্জেন্টের মুখ। সার্জেন্ট জানান, এই লোকটি বছর দুয়েক আগে নিজের বাবাকে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। কারণ তার প্রেমিকা নন্দিতাকে দখল করে নিয়েছিল তারই জন্মদাতা বাবা। রাজা অয়দিপাউস-এর নতুন ভাষ্য সেদিন শোনা যায় সল্টলেকের ফ্ল্যাটে। বাসব অর্থাৎ সেই প্রেমিকের বিচার শুরু হতেই পাগলামির লক্ষণ প্রকট হয়ে ওঠে। পাঠানো হয় মানসিক চিকিৎসাকেন্দ্রে। সেখান থেকেই সে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু তার পাগলামি সত্যি না ভাণ তা বুঝে উঠতে পারেন নি ডাক্তাররাও। শেষ পর্যন্ত চন্দনার উন্মুক্ত পিঠে 'হ্যাঁ' লিখে বাসব জানিয়ে দেয় – সে সুস্থ। তার মাথাই সবচেয়ে সজাগ। আসলে ছেলেটির সেই কথাই চরম সত্য : ''পৃথিবীর সব লোককেই প্রমাণ করতে পারো অসুস্থ, আবার সুস্থও বলতে পারো। মানে অসুস্থ বলেও চিনতে পারবে না, আবার সুস্থ বলেও না ...''[৮১] নাটকের শেষে চন্দনার কণ্ঠে অয়দিপাউস নাটকের সংলাপ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, বাঁচতে হলে, সুস্থভাবে বাঁচতে হলে জীবনের অনেক ভয়াবহ ঘটনাই আমাদের ভুলে যেতে হয়।

এই নাটকে মনোজ মিত্র দার্শনিকের দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন সামাজিক কলুষের দিকে। সমাজে

প্রতিনিয়ত যে ওপরে ওঠার লড়াই চলছে, সেই লড়াই জিততে গেলে ছাড়তে হয় অনেক কিছু, ভুলতে হয় অনেক কিছু। এই শহরে ঈশিতার মতো উচ্চবিত্ত গৃহবধূরা টি.ভি.-সিনেমায় মুখ দেখাবার জন্য নিজেদের বিকিয়ে দিতেও প্রস্তুত। অনির্বাণ ভোগাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির জন্যই অনুষ্ঠিত হচ্ছে সামাজিক ব্যভিচার। অনেক কর্দমাক্ত ভূমি মাড়িয়ে পৌঁছতে হয় যশ এবং প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল ক্ষেত্রে। প্রত্যেকের জীবনের গল্পটাই ঘুরে-ফিরে একইরকম। যারা এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে, সব কিছু ভুলে থাকতে পারে – পৃথিবীতে তারাই সুস্থ মানুষ হিসেবে বিবেচিত হয়, আর যারা ভুলতে পারে না – তারাই অসুস্থ – তারাই পাগল। সুস্থ-অসুস্থের বোধ গুলিয়ে দিয়ে মনোজ দেখান, অয়দিপাউস নাটক আসলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভিনীত হচ্ছে প্রায় প্রতিটি পরিবারেই।

নাট্যকার হিসেবে মনোজ মিত্র নিজের সময় এবং সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। সামাজিক বর্গের নাটকগুলিতে তাঁর সেই দায়বদ্ধতা প্রকাশিত। চারপাশের যেসব সামাজিক কলুষ তাঁকে পীড়িত করেছে, বেদনার্ত করেছে - কৌতুকের শরে তিনি সেগুলিকে বিদ্ধ করেছেন। বাইরে থেকে সমালোচনা নয়, এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজেরই একজন হিসেবে তিনি আঙুল তুলেছেন এর অসঙ্গতির দিকগুলিতে। এই আঙুল তোলা সমাজশোধনের বাসনায়। সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি যেমন দেখেছেন রাজনীতির নীতিহীনতা এবং সুবিধাবাদী চরিত্র, তেমনি দেখেছেন ধর্মের কৌশলী ব্যবহার। এই দুটি অবক্ষয়ের ক্ষেত্রই প্রধানভাবে আক্রান্ত হয়েছে তাঁর নাটকে। এছাড়াও তিনি সমাজে প্রত্যক্ষ করেছেন, মানুষের দ্বারা মানুষের ব্যবহৃত হবার চিরন্তন ইতিহাস। প্রভুত্ববাসনা মানুষের সহজাত। সেই বাসনা থেকেই মানুষ অন্য অনেক মানুষকে নিজের পদানত করতে চায়, আজ্ঞাবহ করতে চায়। অসহায়তার সুযোগ নিয়ে একজনকে মাড়িয়ে অন্যে ওপরে উঠতে চায়। এই কাজে মানুষের সহায়ক প্রধানত অর্থ এবং ক্ষমতা। এই দুয়ের জোরেই বশীভূত করা হয় অন্য মানুষকে। সেই ব্যবহারকারী এবং ব্যবহৃত মানুষেরাও প্রবলভাবে বর্তমান মনোজ মিত্রের নাটকে। নাটকীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেই তিনি স্বরূপ উন্মোচন করেছেন সুবিধাবাদী রাজনীতিক, ভন্ড ধর্মধ্বজী আর উঁচুতলার শোষকের। অবক্ষয়ী সমাজের নিছক চিত্রাঙ্কনেই কিন্তু শেষ হয়ে যায় না তাঁর সামাজিক নাটক, বরং এই অবক্ষয় থেকে উত্তরণের দিশা দেখান তিনি। সে দিশা স্পষ্ট হয় কখনো শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সর্বাত্মক সংগ্রামে, কখনো বা তীব্র জীবনীশক্তির প্রাবল্যে, কখনো মানুষের ভেতরকার শুভবোধের জাগরণে, কখনো প্রান্তিক মানুষের জীবন ও চরিত্রোপযোগী প্রতিবাদ-প্রতিরোধে, আর কখনো কিছু সহৃদয় মানুষের আন্তরিক সহযোগিতায়। 'শিবের অসাধ্যি' বা 'কিনু কাহারের থেটার'-এর মতো কোনো কোনো নাটকে দিশা খুব স্পষ্ট নয় বলে নাট্যপরিণতি কিছুটা আরোপিত মনে হ'লেও অধিকাংশ নাটকেই নাট্যকারের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট ও ঋজু। বিশেষ কোনো রাজনৈতিক তত্ত্বের আধারে না হ'লেও এসব নাটকে তিনি মূলত দেখাতে চেয়েছেন শোষিত, প্রান্তিক, সাধারণ মানুষের জয়। সেই জয়ের উপযোগী পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করাই তাঁর অভিপ্রায়। এই সৃষ্টির কাজটি তিনি করেন সমস্তরকম নাটকীয় শর্ত মেনে। তাই বক্তব্য তাঁর নাটকে ভার হয়ে থাকে না, জীবনের সহজ চলনের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ - কুন্তল চট্টোপাধ্যায় - রত্নাবলী-৩৯ এ পটুয়াটোলা লেন -কোলকাতা-০৯ -চতুর্থ সংস্করণ - অক্টোবর, ২০০৪

২) The Types of Drama - Problem Play - The Anatomy of Drama - Kalyani Publishers - New Delhi - Ludhiana - 1999, পৃ.১৪৯-৫০

৩) বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড) - আশুতোষ ভট্টাচার্য - এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড-২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, ষষ্ঠ সংস্করণ-বইমেলা, ২০০৪, পৃ.৪৩।

৪) ঐ, পৃ.৪৭৬।

৫) কিছু লোক কিছু নাটক - মনোজ মিত্র - বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ - সৃষ্টি প্রকাশন-কলকাতা - ০৯ প্রথম প্রকাশ - বইমেলা, ২০০১, পৃ.১৪

৬) বাঞ্ছারাম ঃ থিয়েটারে সিনেমায় - মনোজ মিত্র - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ-মাঘ ১৪০৬, পৃ.১২২

৭) ঐ, পৃ.১২৩

৮) ঐ, পৃ.১২৪

৯) ঐ, পৃ.১২৫

১০) সাজানো বাগান - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র-দ্বিতীয় খন্ড-মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ-অগ্রহায়ণ ১৪০১, পৃ.১১

১১) ঐ, পৃ.২৩-২৪

১২) ঐ, পৃ.৪১

১৩) ঐ, পৃ.৪৭

১৪) ঐ, পৃ.৪৮

১৫) ঐ, পৃ.৪৯

১৬) ঐ, পৃ.৪৯

১৭) সাজানো বাগানে চোখ রেখে - দেবাশিস মজুমদার - দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান - ৬ আগস্ট ২০০৫

১৮) ঐ

১৯) মনোজ মিত্রের সাক্ষাৎকার (বিপ্রতীপ দে) - দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান - ৬ আগস্ট ২০০৫

২০) সাজানো বাগান - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৩১

২১) সাজানো বাগান - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৩৩

২২) সাজানো বাগান - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৪৪

২৩) বাঞ্ছারাম ঃ থিয়েটারে সিনেমায় - মনোজ মিত্র, পৃ.১৩৩

২৪) নাট্যকার মনোজ মিত্র অভিনেতা মনোজ মিত্র - শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় - অমৃত - ০৭.০৪.১৯৭৮

২৫) সাজানো বাগান - অশোক মুখোপাধ্যায় - বারোমাস, জুলাই, ১৯৭৮

২৬) দেশ - ২৮ জানুয়ারি, ১৯৭৮

২৭) সাজানো বাগানে চোখ রেখে - হাসান আজিজুল হক - দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান - ৬ আগস্ট ২০০৫

২৮) রাজদর্শন – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র-দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.১৩৫

২৯) ঐ, পৃ.১৩৬

৩০) শিবের অসাধ্যি – মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৩১৯

৩১) রাজদর্শন – মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.১২৮

৩২) ঐ, পৃ.১১২

৩৩) ঐ, পৃ.১১৯

৩৪) ঐ, পৃ.১২৩

৩৫) The tree haunted me - Manoj Mitra - PCP - 25-10-1986

৩৬) নৈশভোজ - মনোজ মিত্র – মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ-মাঘ ১৪০৩, পৃ.২৮৬

৩৭) ঐ, পৃ.২৯১

৩৮) The tree haunted me - Manoj Mitra - PCP - 25-10-1986

৩৯) নৈশভোজ- মনোজ মিত্র — মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.২৬০

৪০) ঐ, পৃ.২৫৮

৪১) ঐ, পৃ.২৮০-২৮১

৪২) কিনু কাহারের থেটার - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড-মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ-মাঘ ১৪০২,পৃ.২৭৪

৪৩) কিনু কাহারের থিয়েটার - মনোজ মিত্র - বাংলা নাট্য: হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ, পৃ.১৪১

৪৪) কিনু কাহারের থেটার - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.২৭৩

৪৫) ঐ, পৃ.২৫৪

৪৬) ঐ, পৃ.২৫৬

৪৭) ঐ, পৃ.২৭১

৪৮) ঐ, পৃ.২৬৫

৪৯) কিনু কাহারের থিয়েটার - মনোজ মিত্র - বাংলা নাট্য: হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ, পৃ.১৪৪

৫০) আত্মগোপন - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৩২১

৫১) ঐ, পৃ.৩৩৩

৫২) ঐ, পৃ.২৯২

৫৩) ঐ, পৃ.৩৩০

৫৪) ঐ, পৃ.৩২৪

৫৫) ঐ, পৃ.৩২৫

৫৬) ঐ, পৃ.৩২৭

৫৭) ঐ, পৃ.২৮৭

৫৮) ঐ, পৃ.৩০৩

৫৯) নাকছাবিটা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ-'রাসপূর্ণিমা', কার্তিক ১৪১০, পৃ. ৫৩

৬০) ঐ, পৃ.৫৩

৬১) ঐ, পৃ.২২

৬২) ঐ, পৃ.৪৬

৬৩) ঐ, পৃ.২৫

৬৪) ঐ, পৃ.২২

৬৫) মুন্নি ও সাত চৌকিদার - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.১৮৫

৬৬) ঐ, পৃ.১৮৫

৬৭) ঐ, পৃ.১৬৪

৬৮) ঐ, পৃ.৯০

৬৯) কালবিহঙ্গ - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৩৯০

৭০) ঐ, পৃ.৪১০

৭১) ঐ, পৃ.৪১০

৭২) মদনের পঞ্চকান্ড - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.৩৮২

৭৩) আমি মদন বলছি - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৪৫৫

৭৪) ঐ, পৃ.৪৪৩

৭৫) মদনের পঞ্চকান্ড - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ.৩৮৫

৭৬) কাকচরিত্র - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.৩৫৯

৭৭) ঐ, পৃ.৩৭১

৭৮) ঐ, পৃ.৩৫৯

৭৯) ঐ, পৃ.৩৬৩

৮০) ঐ, পৃ.৩৭২

৮১) বৃষ্টির ছায়াছবি - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৪০৬

পারিবারিক নাটক

পারিবারিক নাটকের পৃথক পরিচয়কে স্বীকৃতি না দিয়ে অধিকাংশ সমালোচকই একে সামাজিক নাটকের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। কোন একটি সময়ের সামাজিক সমস্যা ও সংকট নিয়ে নাটকই সাধারণত সামাজিক নাটক। কৌলীন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক সমস্যার কথা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। আরো পরে যৌথ পরিবারের বিলুপ্তি সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে জীবনের জটিলতা যত বেড়েছে সমস্যার প্রকৃতিও তত বদলেছে। এইরকম সমস্যার নাট্যরূপায়ণ হলে সেই সামাজিক নাটককে Problem Play বলা হয়ে থাকে। সমালোচকদের মতে, পরিবার-আশ্রিত নাটকে যেসব সমস্যার কথা বলা হয় তা যেহেতু বৃহত্তর অর্থে সামাজিক সমস্যাই, সেহেতু এই শ্রেণির নাটককে সামাজিক বর্গের অন্তর্ভুক্ত করাই সমীচীন। একথা সত্য যে, পারিবারিক নাটক বৃহত্তর অর্থে সামাজিক নাটকের সমধর্মী। কিন্তু যে কোন সামাজিক নাটককেই পারিবারিক নাটক বলা চলে না। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব', দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' বা 'সধবার একাদশী' আসলে সামাজিক নাটক। আবার মনোজ মিত্রেরই 'চাক ভাঙা মধু' বা 'সাজানো বাগান'ও সামাজিক নাটক। এদের কোন ভাবেই পারিবারিক নাটক বলা চলে না। যদিও প্রতিটি নাটকেই পরিবারের কথা আছে। এখান থেকেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সামাজিক বর্গ থেকে পারিবারিক নাটককে পৃথক করার। একটি বা দুটি পরিবারের মধ্যে যেখানে নাট্যকাহিনি সীমাবদ্ধ, নাটকের কেন্দ্রীয় সমস্যা যেখানে পারিবারিক সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সঙ্গে সম্পর্কিত, বাইরের জগতের বা পরিবারের ভিতরের কোন সমস্যায় বিপর্যস্ত পরিবার-জীবন যখন নাটকের উপজীব্য তখন তাকে পারিবারিক নাটক বলা হয়ে থাকে। তবে মনে রাখতে হবে যে, একটি পরিবারের বিশেষ সমস্যার মধ্যে যখন বৃহত্তর সমাজের সমস্যা উপলব্ধ হয় তখনই তা সামাজিক নাটকের দিকে এগোয়। পরিবার বিশেষের সমস্যা যদি সমাজেরও সাধারণ সমস্যা হয় তাহলে তা সামাজিক নাটকের পর্যায়ে পড়ে।

আমাদের দেশে, বা বলা চলে পৃথিবীর যে কোনো দেশেই গোষ্ঠীজীবন ভেঙে গিয়ে পরিবার তৈরি হয়েছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা থেকে। ব্যক্তিত্বচেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ চাইল গোষ্ঠীর সম্পদের ওপর অধিকার। কিন্তু সে অধিকার নিরঙ্কুশ হ'ল না বলেই পরিবারের মতো এককে বিভক্ত হয়ে গেল গোষ্ঠী। কিন্তু আরো পরে দেখা গেল, পরিবারের সম্পত্তিও 'ব্যক্তিগত' হচ্ছে না। মানুষ আরো ক্ষুদ্রতর বৃত্তে ভোগের অধিকার চাইল। একই পরিবারের একাধিক মানুষের উপার্জন সমান নয়, কাজ করার ক্ষমতা সমান নয়— খুব বেশিদিন তা মেনে নিতে পারল না অধিক উপার্জনশীল বা অধিক কর্মক্ষম মানুষ। ফলে পরিবারের মধ্যেও ভাঙন ধরল। ক্ষুদ্রতম বৃত্তে ভোগের আয়োজনকে নিরঙ্কুশ করল মানুষ। সেই নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে যার কাজ নেই, উপার্জন নেই, সে চিহ্নিত হ'ল বাতিল, অপ্রয়োজনীয় মানুষ হিসেবে। মনোজ মিত্র নিজের নাট্যরচনার সময় চারপাশে দেখেছেন পরিবার পুরনো অর্থে

আর নেই। প্রকৃত অর্থে পরিবার যখন ছিল তখন সমাজ ভোগবাদী ছিল না। আধুনিক ভোগবাদী সমাজের পরিবারে অর্থের কাছে সম্পর্ক মূল্যহীন। সবচেয়ে করুণ অবস্থা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের। তাঁর যেন পরিবারের কাছে 'বোঝা'। উপার্জন নেই, কাজের ক্ষমতা নেই – ফলে তাকে বহন করা 'লাভজনক' নয়। বৃদ্ধাশ্রমের ধারণাও তখন তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। ফলে নিতান্ত অনিচ্ছাতে হলেও সেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে পরিবারেই স্থান দিতে হচ্ছে। কিন্তু সে দেওয়া সম্মানের নয়, করুণার।

মনোজ মিত্র দেখেছেন, আধুনিক পরিবার Physically আছে কিন্তু Psychologically নেই। নামে যিনি 'হেড অব দি ফ্যামিলি' তাকে বাইরে বের করে দেওয়া যাচ্ছে না কখনো চক্ষুলজ্জার কারণে, কখনো সম্পত্তির লোভে। এই লোভকে জিইয়ে রেখেই সংসার প্রাসঙ্গিক থাকতে চান মনোজ মিত্রের বৃদ্ধরা। এরা প্রবলভাবে জীবন-পিয়াসী, তাই সমাজ এবং সংসারে লগ্ন হয়ে থাকতে চান। নিজেকে অন্যের কাছে গুরুত্বপূর্ণ দেখে তৃপ্তি পেতে চান। এ যেন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবার ভয় থেকে মরিয়া চেষ্টা। কিন্তু মুশকিল হ'ল একসময় তাঁরই হাতে গড়া পরিবার তাঁকে আর সেই দৃষ্টিতে দেখে না। এঁরা সংসারকে ভালোবাসতে চাইলেও সংসার এদের ভালোবাসে না। স্ব-সৃষ্ট এই বৃদ্ধদের সম্পর্কে মনোজ মিত্র বলেছেন ঃ

> ''আমার বৃদ্ধেরা কেউ বৃতী পুরুষ নয়, নয় সমাজসংসারে প্রভাবপ্রতিপত্তিশীল গণ্যমান্য হোমরাচোমরা। সবাই বড় তুচ্ছ মানুষ, টুটাফাটা, সংসারে যাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। প্রায় সবাই উত্তরপুরুষের হাতে লাঞ্ছিত, অসম্মানিত। আমার বৃদ্ধেরা যেন ঝিলপুকুরে বঁড়শি ফেলে মাছ ধরতে বসেছে। উত্তরপুরুষ সেই মায়ার বঁড়শি ছিঁড়ে বেরোতে চায়।''[১]

এই বৃদ্ধদের অসম্মান এবং লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দেবার জন্যই পারিবারিক বর্গের নাটকে মনোজ মিত্রের লড়াই। তাঁর চরিত্ররাও লড়াই করে – বেঁচে থাকার লড়াই, প্রাসঙ্গিক থাকার লড়াই। মনোজ মিত্র এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

> ''এ লড়াই খুব একটা উচ্চস্তরের নয়, যথেষ্ট অভিজাত নয়। তবে জীবন ক্ষুদ্র তুচ্ছ বলে লড়াইটাও অকিঞ্চিৎকর, এমন সর্বনাশা সিদ্ধান্তে না আসাই তো উচিত। আমার বৃদ্ধেরা কেউ হারে না, বিনা যুদ্ধে এক ছটাক জমি ছাড়ে না ... শেষ হাসিটা তারাই হাসে।''[২]

১৯৫৯ সালে মনোজ মিত্রের প্রথম নাট্যরচনা 'মৃত্যুর চোখে জল'। একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার উদ্দেশ্যে রচিত সেই এক বিনিদ্র রাতের ফসলে তিনি নিজের পরিবারের অতি চেনা কিছু ব্যক্তির জীবন তুলে ধরেছেন বলে নিজেই জানিয়েছেন। সেই প্রথম প্রয়াসের পর আরো বহুবার নিজের রচনায় তিনি মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারকে আশ্রয় করেছেন। সমাজ বা রাষ্ট্রর মতোই মধ্যবিত্তের পারিবারিক জীবনেও তিনি লক্ষ করেছেন মূল্যবোধের অবক্ষয়, মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা, মানবিক বোধে স্বার্থের ঘুণপোকার দংশন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাস মানুষের ওপর। তিনি প্রত্যয়ী, মানুষের মধ্যেই আছে শুভ চেতনা এবং কল্যাণশক্তি। তাই তাঁর নাটকে মানবিকতার অবক্ষয়ের মধ্যেও স্নেহ-মায়া-মমতা-

ভালবাসার দীপশিখাটি অনির্বাণ থাকে। নেতিদর্শন ঘটিয়ে আমাদের শেষ পর্যন্ত ইতিবাচক অবস্থানে পৌঁছে দেন তিনি, কোন বক্তব্য আরোপ করে নয়, বরং সহজ স্বাভাবিক অসংখ্য নাট্যমুহূর্তের মালা গেঁথে।

মনোজ মিত্রের পারিবারিক বর্গের অন্তর্ভুক্ত পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলি হল 'কেনারাম বেচারাম', 'পরবাস', 'দম্পতি', 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা', 'শোভাযাত্রা', 'স্মৃতিসুধা', 'আত্মগোপন' এবং 'পালিয়ে বেড়ায়'। এই বর্গের একাঙ্ক সৃষ্টিগুলি 'মৃত্যুর চোখে জল', 'পাখি', 'টাপুর টুপুর', 'সন্ধ্যাতারা', 'আঁখিপল্লব' এবং 'আকাশচুম্বন'। ১৯৫৯ সালে লেখা 'মৃত্যুর চোখে জল' থেকে শুরু করে ১৯৯৯ সালে রচিত 'পালিয়ে বেড়ায়' পর্যন্ত দীর্ঘ ৪০ বৎসরব্যাপী এই বর্গের বিস্তার। নাটকগুলির রচনাকাল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ১৯৫৯ এবং '৬০ সালে 'মৃত্যুর চোখে জল' এবং 'পাখি' রচনার পর এই ধারার নাটক আবার পাচ্ছি ১৯৬৭-তে ('টাপুর টুপুর')। এর মাঝে তিনি 'অশ্বত্থামা' রচনা করে ঘুরে এসেছেন পুরাণের জগৎ থেকে। পারিবারিক বর্গে প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক রচিত হল ১৯৭০ সালে 'কেনারাম বেচারাম' (পুনর্লিখন ১৯৭৭) এবং 'পরবাস' (পুনর্লিখন ১৯৭৫)। এরপর আট বছরের ব্যবধানে 'দম্পতি' (১৯৭৮) এবং আরো দশ বছর পর 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' (১৯৮৮) এবং 'শোভাযাত্রা' (১৯৯০)। ৭০-৭৮-এর মধ্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য নাট্যসৃষ্টি 'নরক গুলজার' (১৯৭৪) এবং 'সাজানো বাগান' (১৯৭৬-৭৭)। ৭৮-৮৮- র মধ্যে মধ্যে লিখেছেন 'মেষ ও রাক্ষস' (১৯৭৯), 'রাজদর্শন' (১৯৮১) এবং 'নৈশভোজ' (১৯৮৪-৮৫)। 'স্মৃতিসুধা' (১৯৯৩) এবং 'আত্মগোপন' (১৯৯৪) রচনার আগেই 'গল্প হেকিমসাহেব' এর মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে মনোজের অতীতচারণা। 'দেবী সর্পমস্তা' (১৯৯৫) এবং 'ছায়ার প্রসাদ' (১৯৯৭-৯৮) নাটকে তারই অনুবর্তন। 'পালিয়ে বেড়ায়' (১৯৯৯) নাটকের মধ্যে দিয়ে আবার পারিবারিক বৃত্তে ফিরে এলেন তিনি।

পারিবারিক বর্গের নাটকগুলিকে অন্তত তিনটি উপবর্গে বিভক্ত করা যায়। এর মধ্যে একটি উপবর্গে প্রধান হয়ে উঠেছে আশ্রয়ের সমস্যা। আশ্রয় দু'রকমের হতে পারে – বাসস্থানের দিক থেকে এবং অস্তিত্বের দিক থেকে। মনোজ মিত্র এই দু'রকম আশ্রয়ের সমস্যাই দেখিয়েছেন। 'দম্পতি', 'পরবাস' ও 'সন্ধ্যাতারা' নাটকে বড় হয়ে উঠেছে বাসস্থানের সমস্যা। তার মধ্যে 'পরবাস'-এ বাসস্থানের পাশাপাশি অস্তিত্বের সমস্যাও দেখা দিয়েছে। 'মৃত্যুর চোখে জল' এবং 'কেনারাম বেচারাম' নাটকে অস্তিত্বের প্রশ্নই মুখ্য। পারিবারিক বৃত্তে মানবিক আবেদন, মমতা, সহানুভূতি এবং অনিবার্য পতনের বিষণ্ণতা প্রকাশ পেয়েছে 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা', 'শোভাযাত্রা' ও 'পালিয়ে বেড়ায়' নাটকে। পারিবারিক ক্ষেত্রে দাম্পত্যের বিচিত্র রূপ তুলে ধরেছেন মনোজ 'দম্পতি', 'পাখি', 'টাপুর টুপুর', 'আঁখিপল্লব', 'স্মৃতিসুধা' ও 'আকাশচুম্বন' নাটকে।

'কেনারাম বেচারাম' (১৯৭০) প্রথমে গ্রুপ থিয়েটারের জন্য লেখা হলেও পেশাদার

রঙ্গমঞ্চে (রঙমহল) দীর্ঘদীন অভিনীত হয় 'বাবাবদল' নামে। নিরুদ্দেশ সম্পর্কিত একটি ঘোষণার মধ্যে দিয়ে নাটক শুরু হয় এবং সেই ঘোষণাতেই জানা যায়, সত্তর বছরের বৃদ্ধ বেচারাম চাটুজ্যে, যার চুল পাকা, মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি, পরিধানে লাল লুঙি ও গেরুয়া পাঞ্জাবি, নিরুদ্দেশ হয়েছেন। সন্ধান দাতা উপযুক্ত পুরস্কার পাবেন। পর্দা সরতেই দেখা যায় সন্ধান জানাবার ঠিকানা অর্থাৎ নিরুদ্দিষ্ট বেচারাম চ্যাটার্জীর বাড়ির বসার ঘর। এই বাড়িতে আছে বেচারামবাবুর দুই পুত্র, এক পুত্রবধূ, এক নাতি এবং চাকর শ্রীধর । গৃহকর্তা নিরুদ্দেশের সংবাদ পেয়ে এলাহাবাদ থেকে এসেছে মেয়ে-জামাই বুড়ি এবং প্রদীপ, এসেছেন বড় পুত্রবধূ দীপ্তির বাবা চারুচন্দ্র চ্যাটার্জী, বার- অ্যাট-ল, বসিরহাট থেকে এসেছ দূর সম্পর্কের ভাগ্নে ভৈরব। বেচারামবাবুর জন্য উদ্বেগে নয়, এরা প্রত্যেকেই এসেছেন উদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগ নিতে। পুত্রবধূ এবং কন্যার মধ্যে দ্বন্দ্ব মায়ের গয়নার বাক্স নিয়ে, সিন্দুকের চাবি নিয়ে। বেচারামবাবু বলেছিলেন, তিনি বর্তমান থাকতে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি কিছুই ভাগ হবে না। কিন্তু এখন যেহেতু তিনি 'অবর্তমান', সুতরাং সম্পত্তি ভাগ হতে কোনো বাধা নেই। সেই আশায় অফিসে 'উইদাউট পে' হয়েও বুড়িকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে জাঁকিয়ে বসে আছে প্রদীপ আর শ্বশুরকে খুঁজে বের করার জন্য একেক দিন একেকটা নতুন নতুন পরিকল্পনা করছে। দীপ্তি-শুভেন্দুও কিছুতেই সম্পত্তির ভাগ দেবে না। মায়ের গয়না আর বাবার সম্পত্তি নিয়ে ব্যবসা দাঁড় করানো এবং ছেলেকে দার্জিলিং-এ হস্টেলে রেখে পড়ানোর স্বপ্ন তাদের। তাদের পক্ষে আছেন দীপ্তির বাবা চারুচন্দ্র চ্যাটার্জী, বার-অ্যাট-ল। তিনি যে মক্কেলকে ধরেছেন তারই মাথায় কাঁঠাল ভেঙেছেন। সম্পত্তি এবং গয়নার বাক্সের অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব যখন তুঙ্গে তখন আবির্ভাব বর্ধমানের নগেন পাঁজার, যে কিনা ঘর-পালিয়েদের খুঁজে এনে যথাস্থানে 'ফিট করে' দেয়। সবসময় যে সে ঠিক মানুষটিকেই ধরে আনতে পারে এমন নয়, তবে বক্তৃতার তোড়ে আর সুযোগের সদ্ব্যবহারে তার আনা মানুষকেই প্রকৃত মানুষে পরিণত করে ফেলে। নগেন পাঁজা বেচারামবাবুর ফিরে আসার সংবাদ দিতেই সকলে মুষড়ে পড়ে। সম্পত্তির আশু বাঁটোয়ারা ভেস্তে যেতে সকলেই হতাশ হয়। নগেন বহু ঘাটের জল খেয়েছে। মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে তার বিপুল অভিজ্ঞতা। সহজেই সে বুঝতে পেরেছে সকলের অখুশি হওয়ার কারণ এবং দিয়েছে মোক্ষম চাল ঃ "তাই বেচারামবাবু পথে আসতে আসতে আমায় বলছিলেন, এবার বিষয়সম্পত্তি সব ছেড়ে দেবেন। যে তাঁকে খুশি করবে, তার হাতেই সব তুলে দেবেন।"[৩] নগেনের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই শুরু হয়ে যায় খুশি করার প্রতিযোগিতা। কচি ডাব, পাকা বেল, ক্ষীরকদম, পিতৃভোগ, পপকর্ণ, ছানার জিলিপি, পয়োধি, মায় মেটুলি চচ্চড়ি পর্যন্ত অর্ডার হয়ে যায় 'বেচারামবাবু'র জন্য। আপাদমস্তক প্লাস্টারে মোড়া 'বেচারাম'কে হাজির করলে শুরু হয় তাকে আপন করে নেবার প্রতিযোগিতা। সকলেই নিজের ভালোবাসা জাহির করতে ব্যস্ত। কিন্তু গোল বাঁধল মেটুলি চচ্চড়ি খাওয়াতে গিয়ে। প্লাস্টারে মুড়ে নগেন যাকে নিয়ে এসেছে সে আসলে কেনারাম। দীক্ষা নিয়েছে বলে যে কিনা পাঁঠা-মুরগী-রুই-কাতলা-বোয়াল-সিঙ্গি ছোঁয় না। জোর করে মেটুলি খাওয়াতে গেলে 'ধর্ম' রক্ষায় অগত্যা তাকে মুখের ব্যান্ডেজ খুলে 'না' করতেই হয়। আর তখন ধরা পড়ে যায় ফাঁকি। কিন্তু নগেন পাঁজা ভাঙলেও মচকায় না। মনোজ মিত্রের ধারালো সংলাপের জোরে সে কেনারামকেই বেচারামের শূন্যস্থানে 'ফিট করতে' তৎপর হয়ে ওঠে। কেনারামকে সে শিখিয়ে দেয় বেচারামের

অভিনয়। একের পর এক সন্দেহের নিরসন করে চলে তার নিজের সৃষ্ট যুক্তিতে। বেচারামবাবুর বাত ছিল কিন্তু কেনারামের নেই — এই বৈসাদৃশ্য ঢাকতে নগেনের যুক্তি ঃ

''নগেন ।। আচ্ছা, আপনারা কি চান বেচারামবাবুর পায়ে চিরকাল বাত থাকুক ?

বুড়ি ।। নিশ্চয় না!

নগেন ।। বাত সেরে গেলে আনন্দ করবেন কিনা!

বুড়ি ।। ষষ্ঠীতলায় হরির লুট দেবো!

নগেন ।। তবে দিন হরির লুট – বাত সেরে গেছে!''[৪]

বেচারামবাবুর দাঁত ছিল না শুনে কেনারামবাবুর দাঁত সাঁড়াশি দিয়ে তুলে দিতে উদ্যত নগেন। এটা তার কাছে কোনো সমস্যাই নয় ঃ ''আমি বুঝতে পারছি না - মেজর মেজর পয়েন্টে যেখানে মিলে যাচ্ছে, সেখানে খুচরো দুটো দাঁতে কেন আটকাচ্ছে ? বেশ, তুলে দিচ্ছি''[৫] কৌতুকের এই আবহ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে যখন নগেন কেনারামকে বেচারামবাবুর চেয়ে সবদিক দিয়েই 'বেটার বাবা' বলে প্রতিপন্ন করে ঃ

> ''বেচারামবাবু দুবেলা ভাত খেতেন ... ইনি একবেলা খাবেন, দরকার হলে এটো কাঁটা খাবেন ... বেচারামবাবুকে কাপড় দিতে হত ... ইনি শ্রীধরের ছেঁড়া গামছা পরে লজ্জা নিবারণ করবেন! বেচারামবাবুকে বিছানা বালিশ দিতে হত, ইনি রোয়াকে থান ইট মাথায় দিয়ে শোবেন — মাঝে মাঝে ঠ্যাঙাতেও পারেন।''[৬]

নিঃস্ব, নিঃসঙ্গ কেনারাম বেচারামবাবুর সংসারে 'ফিট হতে' গিয়ে পুত্র-কন্যা-পুত্রবধূ-নাতি-সহ সম্পূর্ণ সংসারের লোভে পড়ে গেছেন। এই ভরা সংসার ছেড়ে তিনি যেতে চান না, নগেনের শিক্ষা অনুসরণে পুত্র-কন্যাকে কাছে টেনে নিতে চান। অদ্ভুত অদ্ভুত মজার situation তৈরি করে নাটক এগোতে থাকে। পাড়ার ছেলেদের পরামর্শে জামাই প্রদীপ বোমের ব্যাগ নিয়ে এসেছ নগেনকে তাড়াতে, থানাতেও খবর দিয়ে এসেছে। কিন্তু সেই বোমের কারণে নগেনই পুলিশের ভয় দেখায় প্রদীপকে। শুভেন্দুকেও একমাস যাবৎ নিরুদ্দিষ্ট থাকা বাবার রেশন কার্ড সারেন্ডার না করার জন্য পুলিশে ধরিয়ে দেবার ভয় দেখায়। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, প্রদীপ নগেনকেই জিজ্ঞেস করে তাদের তাড়াবার উপায়! তুখোড় নগেনের কৌশলের কাছে সকলেই মাৎ। ভোটপ্রার্থী ন্যাড়াজ্যাঠা নগেন-কেনারামকে তাড়াতেই এসেছিলেন, কিন্তু নগেন ফলস্ ভোটের লোভ দেখিয়ে তাকে কব্জা করে ফেলে ঃ

''নগেন ।। শ্রীধরের কাছে শুনলাম, ন্যাড়াবাবু আপনি নাকি ফলস্ ভোট খুঁজে বেড়াচ্ছেন...

ন্যাড়া ।। ডেফিনিটলি! ফলস্ ভোট ছাড়া আজকের দিনে কোন্ শালা ইলেকশানে ফাইট করতে পারে।

নগেন ।। রাইট... ভেরি রাইট! আর তাইতো আপনার জন্য ন্যাড়াবাবু, আমি বর্ধমান থেকে কেনারাম বাঁড়ুজ্যেকে ধরে নিয়ে এলাম। একাই পঞ্চাশটা ভোট দেবে...

ন্যাড়া ।। এইরকম কেনারাম তোমার কাছে আরও আছে ?

নগেন ।। আছে মানে কি, আমি তো সাপ্লায়ার। ইলেকশানের সময় আমি তো শত শত কেনারাম সাপ্লাই করি ...

ন্যাড়া ।। অনেক কেনারাম চাই আমার ! আমি কিনবো! এক একটা কেনারাম কিনতে কত পড়বে ?

শুভেন্দু ।। ন্যাড়া জ্যাঠা, কী ফুলতু বকছেন!

ন্যাড়া ।। না – ফালতু নয়। কেনারামকেই তুমি বাবা বেচারাম বলে চালিয়ে নাও শুভেন্দু।''[৭]

শেষ ভরসা পুলিশ। কিন্তু সেখানেও নগেন প্রখর। ইনস্‌পেক্টরকে সে 'ফিট করতে' চায় নেতাজীর শূন্যস্থানে ঃ

''নগেন ।। ...আমি আপনাকে ধরেছি! (গম্ভীর গলায়) কার মনে আছে ... কার মনে আছে, কোন বীর সন্তান, গায়ে এমনি খাকির পোশাক, বুকে এমনি চামড়ার বেল্ট, এমনি চওড়া কপাল ... বাংলা মায়ের বুক খালি করে দেশান্তরে হারিয়ে গেছে... বলুন, কে বলতে পারেন ...

ইন্‌স ।। কার কথা বলছেন মশাই ... নেতাজী সুভাষ চন্দ্র!

নগেন ।। সে বুক আজো খালি... আজো খাঁ খাঁ করছে। স্যার, স্যার আপনাকে সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে।''[৮]

নগেন জানে, এদেশে একবার কোনো কিছু রটিয়ে দিতে পারলেই হল। তারপর আসল-নকলের মীমাংসা হতে হতে জীবন কাবার। নগেনের দর্শন স্পষ্ট ঃ ''একবার চালিয়ে দিলে বাকিটা জনগণই চালিয়ে নেবে''[৯] ইনস্‌পেক্টর এবার নগেনের হাত এড়িয়ে পালাতে পারলে বাঁচেন। কিন্তু নগেন তাকে ছাড়বে না ঃ ''আমি আপনাকে ফিট করে দেবো স্যার। আজাদ হিন্দ ফৌজে ফিট করে দেবো... আবার ভারত সীমান্তে হানা দেবো... আবার সেই কদম কদম বাড়ায়ে যা – যা – যা – কদম কদম বাড়ায়ে যা''[১০] নগেনের অনুপস্থিতির সুযোগে শুভেন্দু আর প্রদীপ কেনারামকে রাস্তায় বের করে দিতে যায়, কিন্তু এবার একসঙ্গে রুখে দাঁড়ায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বিনী দীপ্তি এবং বুড়ি। কারণ নগেন ততদিনে তাদের মাথায় সম্পত্তি আর গয়নার লোভ ঢুকিয়ে দিয়ে দুজনকে দিয়েই কেনারামকে 'বাবা' ডাকিয়ে ছেড়েছে। এখন

তাদের লক্ষ্য বাবাকে ফিরে পাওয়া নয়, যে কোনো উপায়ে সম্পত্তি হস্তগত করা। তাই ফলস্ বাবাকে তারা কিছুতেই হাতছাড়া করবে না। কিন্তু সকলের সব আশায় ছাই দিয়ে বেচারামবাবুর ছোট ছেলে পিন্টুর জাঁহাবাজ প্রেমিকা কাকাতুয়া ইলেকট্রিক যন্ত্র দিয়ে সিন্দুক কেটে ফেলে আর পিন্টু গয়নার বাক্স নিয়ে হাওয়া হয়ে যায়। সেই মুহূর্তেই দরজায় দেখা দেন বেচারামবাবু – সেই লাল লুঙি, গেরুয়া পাঞ্জাবী, কালো ছাতা, খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর পাকাচুল সমেত। তার মুখেই জানা গেল, গয়নার বাক্সে কিছু টিনের চাকতি ছাড়া আর কিছুই নেই। ছেলেমেয়েদের লেখা পড়া শেখাতে, মেয়ের বিয়ে দিতে , বাড়ি করতে স্ত্রীর সব গয়না শেষ হয়ে গেছে। টিনের চাকতি সিন্দুকে ভরে প্রতিদিন রাতে না বাজালে এরা যে অনেক দিন আগেই তাকে বিদায় দিত, সে তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন। এতদিন তবু গয়নার বাক্সের মোহ ছিল, এখন যখন সে রহস্যও ফাঁস হয়ে গেছে তখন যে বাড়িতে আর তার স্থান নেই – একথা ভালোই বোঝেন বেচারামবাবু। তাই নাতি টোটন কেনারামকে তাড়িয়ে দিতে বললে তিনি বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাসে বলেন ঃ ''আমি কে! আমি তো নেই! এতোকাল গয়নার বাক্সটা ছিল... এখন তাও ফাঁস হয়ে গেছে ! কেউ আমায় জায়গা দেবে না। ছেড়ে দে, আমি যাই...''[১১] কিন্তু মনোজ মিত্র তো মানুষের পরাভব দেখাবেন না, বিশেষত অসহায়, বিপন্ন মানুষের, তাই কিশোর টোটনকে দিয়ে তিনি ফিরিয়ে আনেন বেচারামকে। 'ফিট করে' দেন নিজের সংসারে ঃ ''না। তুমি যাবে না! এসো (দরজা থেকে বেচারামকে ফিরিয়ে আনছে) – বলো যাবে না, আর কখনো যাবে না!''[১২] টোটনের কথায় স্বার্থান্ধদের চোখ ফুটল, বেচারামবাবু সংসারে নিজের জায়গা ফিরে পেলেন আর নগেন কেনারামবাবুকে নিয়ে চললেন কলাবাগানে — হারিয়ে যাওয়া এক মাসের শিশুর জায়গায় 'ফিট করতে'।

'কেনারাম বেচারাম' নিঃসন্দেহে হাসির নাটক, কিন্তু নাটকের মূল সমস্যা যথেষ্ট গভীর। মনোজ মিত্রের নাটকের সাধারণ লক্ষণ মান্য করেই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র কেনারাম একজন বিপন্ন, অসহায় মানুষ, যে কিনা রেল লাইনে গলা দিয়ে আত্মহত্যা করার কথা ভাবছিল। নিঃসঙ্গ এই মানুষটির হাহাকারে হৃদয় যেন ব্যথায় মুচড়ে ওঠে ঃ ''আমার যে কেউ নেই নগেন, এ সংসারে আমি একা''[১৩] বর্ধমানের 'বাড়ি-থেকে-পালিয়ে-ধরা' নগেন পাঁজা রেল লাইনের ধার থেকে কেনারাম বাঁড়ুয্যেকে তুলে এনেছেন নিরুদ্দিষ্ট বেচারাম চাটুজ্যের জায়গায় 'ফিট করতে'। বেচারামের ভরা সংসার দেখে লুব্ধ হয়ে পড়েছে নিঃসঙ্গ, পথের ভিক্ষুক কেনারাম। সংসারের মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে তীব্র আকুলতা কেনারামের ঃ

> ''পারবে, পারবে নগেন, এই সব আমার করে দিতে পারবে ? নগেন, আমি নিঃস্ব, পথে পথে ভিক্ষে করে খাই, তুমি তো জানো, কেউ নেই আমার ! এর ওর দোকানে শুয়ে রাত কাটাই। ... পারবে, সব আমার করে দিতে ?''[১৪]

একজন অনিকেত মানুষের এই আশ্রয়লুব্ধতাকে মনোজ মিত্র দেখেন সহানুভূতির চোখে। কিন্তু তাঁর নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্ররা কখনোই ভালো-মন্দের স্পষ্ট বিভাজনে বিভাজিত নয়।

কেনারামও তাই নগেনের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ক্রমশ ধুরন্ধর হয়ে ওঠে, প্যাঁচে ফেলে বুড়ি, দীপ্তি, এমনকি শুভেন্দুকে দিয়েও 'বাবা' ডাকিয়ে ছাড়ে। বুড়িকে দিয়ে বাবা ডাকানোর সময় ধুরন্ধর কেনারাম আর সংসারলুব্ধ, অসহায়, বিপন্ন কেনারামকে যেন পৃথক করা যায় না ঃ

''কেনারাম ।। একবার ডাক মা, বাবা বলে ডাক।

নগেন ।। নিন, চোখ কান বুঁজে ডেকে ফেলুন ...

বুড়ি ।। (দ্বিধান্বিত ভাবে) বাবা ...

কেনা ।। আবার বল্ ...

বুড়ি ।। বাবা ...

কেনা ।। আবার বল্ ...

নগেন ।। আরে দূর মশাই, আপনার মতো এরকম খোচোপার্টি আমি জীবনে পাইনি! বলছে তো!

কেনা ।। দু'বার বলেছে! নগেন, তিনবারে যে সত্যি হয় –

নগেন ।। বলুন তো মা আর একবারটি! ...

বুড়ি ।। বললাম তো ...

কেনা ।। বলেছিস ঠিক...কিন্তু আমার যে প্রাণটা ভরেনিকো,

নগেন ।। বলুন ... তিনবার বলুন তো মা ...

বুড়ি ।। বাবা ... বাবা ... বাবা ...''[১৫]

এই কেনারামকেই আবার ধূর্ত বলে মনে হয়, যখন পর মুহূর্তেই সে বলে ঃ ''বুড়ু ও বুড়ু ... (ভেতরে যেতে গিয়ে ঘুরে) হচ্ছে নগেন ?''[১৬] কেনারামের সংসার নেই, আর বেচারাম সংসারে থেকেও নিরাশ্রয়। স্ত্রী বহুদিন গত হয়েছেন। ছেলেদের সংসারে তিনি এখন অবাঞ্ছিত। সংসারে উপার্জনহীন বৃদ্ধের করুণ অবস্থার দিকটি মনোজ মিত্র তুলে ধরেন বেচারামের সংলাপের মধ্যে দিয়ে ঃ

''বেচারাম ।। ... একটা জিনিস খেতে চাইলে পাবো না ... পরতে চাইলে পাবো না। মুখটি বুজে থাকো ! বাড়িতে ভদ্দরলোক এলে, ছেলে বলবে, গেট আউট ... পার্কে গিয়ে বসো ... তুমি সামনে গেলে, আমার মান যাবে। বাপু হে, সংসারে আমাদের মতো বুড়ো বাপের অবস্থাটা কী রকম জানো ...

নগেন ।। বলুন তো ...

বেচা ।। অ্যাপসট্রপির মতন !

নগেন ।। অ্যাপসট্রপি !

বেচা ।। হুঁ, ইংরেজি ভাষার অ্যাপসট্রপি ! মাথার পরে সাজানো থাকে ... কোনো উচ্চারণ নেই ! আমরা বুড়ো মা-বাপ ও তাই। হেড অব দি ফ্যামিলি ... নো প্রোনানশিয়েশান।"[১৭]

বেচারাম ঠেকে শিখেছেন ঃ "এ সংসারে কেউ নিজের না। টাকা ! নিজের কেবল টাকা ! ... বাপুহে টাকা থাকলে ছেলেমেয়ে কেনাও যায় ... বেচাও যায়।"[১৮] বাক্‌সে ভরা কিছু টিনের চাক্‌তির জোরে সংসারে টিঁকে থাকতে থাকতে ঘেন্না ধরে গেছে জীবনে, তাই নিরুদ্দেশ হয়ে স্বস্তি পেতে চেয়েছিলেন। গানের গলা শুনে যাত্রাপার্টিতে বিবেক সাজতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাঁকে, কিন্তু সেখানেও দেখলেন সংসারেরই হাল ঃ "এক নম্বর অ্যাক্টর মাছের মুড়ো খাবে ... দু নম্বর খাবে ধড় ... তিন নম্বর খাবে পোঁচা ... তার বিবেক টিবেক চুষবে কাঁটা ..." [১৯] ফলে সেখানেও তিনি নিজেকে 'ফিট করতে' পারলেন না। নাট্যকার শেষ পর্যন্ত বেচারামকে নিজের সংসারে 'ফিট করে' দেন ঠিকই কিন্তু সত্য হয়ে থাকে বেচারামের, বেচারামের মতো সংসারে অবাঞ্ছিত বৃদ্ধদের আর্তি ঃ "হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা জায়গা আমার দরকার ... উটকো শ্যাওলার মতো আর ঘুরতে পারিনে ... একটা জায়গা ... নিজের জায়গা ..."[২০] বেচারামের মতোই অনিকেত নগেন পাঁজাও। হারিয়ে যাওয়া, পালিয়ে যাওয়া লোক ধরে এনে সংসারে 'ফিট করে' দেয় যে নগেন, সেও নিজের সংসারে 'ফিট হতে' পারে নি। কৌতুকময় এই চরিত্রের গভীরে বেদনার যে প্রস্রবণ রয়েছে তার চকিত উদ্ভাস লক্ষ্য করা যায় নাটকে নগেনের একটি মাত্র সংলাপে। শুভেন্দুর ভাগ্নে ভৈরবকে নগেন 'ফিট করতে' চায় নিজের জায়গায়। দুর্বল নগেন পাঁজা নিজের ভাঙা ঘর জোড়া লাগাতে পারে না, তাই সে কাজে লাগাতে চায় শক্তসমর্থ ভৈরবকে ঃ

> "(কঠিন মুখে) পারবি হতে নগেন পাঁজা ? কিছু করতে হবে না ... শুধু একটা বৌয়ের দিকে নজর রাখবি। দেখবি সে কোথায় যায়, কি করে, কার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, আমায় ছেড়ে সে কাকে চায় ? ... কেন, তার অভাব কিসের ? (লকলকে করাতের ফলার মতো নগেনের মুখ চোখ কণ্ঠস্বর) তুই বলবি আমিই নগেন পাঁজা! আমি সে আগের নগেনের মতো দুর্বল না। আমার ভাঙা ঘর জোড়া লাগাবো আমি! বল্ যাবি, বল্। ওই ফল্‌স লোকটাকে শক্ত হাতে ভাগিয়ে দিবি ? বল্, আমায় বাঁচাবি।" [২১]

মানুষের এই অনিকেত সত্তার পাশাপাশি নাটকে ব্যঞ্জিত হয় আরেকটি গভীরতর সত্যও — সংসারে কোথাও ঠিক জায়গায় ঠিক মানুষটি নেই — সকলেই 'মিসফিট'। এর ইঙ্গিতও

আছে নগেনের সংলাপে ঃ ''একটা জায়গা দেখাতে পারেন, যেখানে আসল লোকটি বসে আছে ? মন্ত্রী থেকে শিক্ষক, রাজ্যপাল থেকে ঝাড়ুদার, পাহারাদার থেকে হরিদ্বার সর্বত্রই কি একটা ভুয়ো লোক জাঁকিয়ে বসে নেই ? বলুন, আমরাই কি তারে বসিয়ে রাখিনি।''[২২]

পারিবারিক বৃত্তে স্বার্থপরতা, সম্পর্কের চেয়ে সম্পত্তির প্রতি অধিক আকর্ষণ প্রভৃতির পাশাপাশি মনোজ মিত্র তাঁর অন্যান্য নাটকের মতো এই নাটকেও পরিচিত প্রতিবেশের ভণ্ডামিকে বিদ্রূপ করেছেন। সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, পরীক্ষা ব্যবস্থায় বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব, মন্ত্রিসভা গঠনের সময় এম. এল. এ.-দের দর বাড়ানো, রাজনীতির নীতিহীনতা, ভোটের আগে ও পরে নেতার দুই রূপ ইত্যাদি সবকিছুই তাঁর ব্যঙ্গের লক্ষ্য হয়েছে। তবে সবটাই নাটকীয় পরিবেশকে রক্ষা করে এবং কৌতুকময়তার আবরণকে বিঘ্নিত না করে। নিরুদ্দেশ শ্বশুরমশাইকে খুঁজতে জামাই প্রদীপ একবার পুলিশ-কুকুর কাজে লাগাবার কথা বললে শুভেন্দুর সংলাপে নাট্যকার খোঁচা দেন সরকারি অফিসারদের ঃ ''আর ভুল সে করবেই। গভর্নমেন্টের টপমোস্ট অফিসাররাই যখন সর্বদা উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে যাচ্ছেন তখন তাঁদের হাতে গড়া কুকুর যে ...''[২৩] নগেন পাঁজা 'বাড়ি-থেকে-পালিয়ে-ধরা'। বিশেষ বিশেষ মরসুমে, যেমন – বিয়ে, ভোট বা পরীক্ষার মরসুমে তার কাজ অনেক বেড়ে যায়। সমসাময়িক কালে পরীক্ষা ব্যবস্থার গলদের দিকে এখানে মনোজ মিত্র ইঙ্গিত করেছেন সুযোগ পেতেই ঃ ''ইদানীং অবিশ্যি পরীক্ষার সিজিনে কিছু হচ্ছে না ... কারণ পরীক্ষাই উঠে গেছে। ... গণটোকাটুকির ব্যবস্থা! একদম ডাল যাচ্ছে সিজিনটা।''[২৪] বিভিন্ন শ্রেণির 'পালিয়ে'র জন্য ভিন্ন ভিন্ন রেট আছে নগেন পাঁজার। তার মধ্যে এম.এল.এ.-রাও আছেন। অবস্থা বিশেষে এম.এল.এ.-দের ধরে আনার রেটের পার্থক্য আছে ঃ

> ''মন্ত্রিসভা গঠনের আগে যে সব এম.এল.এ.গা ঢাকা দিয়েছেন, যদি খোঁজ খবর এনে দিতে পারি, তাহলে জন প্রতি ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার। আবার রাষ্ট্রপতির শাসন কালে ঐ এম.এল.এ.-রাই এক টাকা চার আনা।''[২৫]

কোনো বিশেষ দল বা মতাদর্শকে আক্রমণ না করেও মনোজ মিত্র সাধারণভাবে ভণ্ড রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত করেছেন ন্যাড়া জ্যাঠাকে, যিনি রাজনীতিতে নেমেছেন ঃ ''টু সার্ভ মাই মাদারল্যান্ড! অ্যান্ড টু এনলার্জ মাই পার্সোনাল ফান্ড!''[২৬] ভোটের বাজারে সব ধর্মের মানুষের মন জয় করার জন্য তার মাথায় মুসলমানী টুপি, গলায় খ্রীস্টানদের ক্রশ, কপালে মহাকালীর সিঁদুর। সঙ্গে গীতা, কোরাণ, বাইবেল। তার কর্মসূচী খুব পরিষ্কার ঃ

> ''যারা আমায় ভোট দেবে, তাদের বাড়ীর ময়লা গাড়ি করে তুলে নিয়ে গিয়ে, যে শালারা দেবে না, তাদের বাড়ির দরজায় ঢেলে দেব! যারা আমায় জেতাবে তাদের পাড়ায় পাড়ায় হাসপাতাল গড়ে দেব ... যারা আমায় ল্যাং মারবে তাদের ঘরে ঘরে হাসপাতাল গড়ে দেব!''[২৭]

চারপাশের ভণ্ডামির প্রতি নাট্যকারের যেন সহজাত ক্রোধ। তাই যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন, সেখানেই তিনি ভণ্ডামিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীরে বিদ্ধ করেছেন।

অনিকেত মানুষের সমস্যা আরো প্রকট আকারে এসেছে 'পরবাস' নাটকে। ১৯৬৯ সালে একাঙ্ক আকারে লেখা হয়েছিল 'কোথায় যাবো' নামে। ১৯৭০ সালে সে একাঙ্ককে বাড়িয়ে রচনা করেন পূর্ণাঙ্গ 'পরবাস'। পুনর্লিখন ১৯৭৫-এ। দুটি অঙ্কে বিভক্ত এই নাটকে কোন দৃশ্য বিভাগ নেই। দৃশ্যপট একটিই — পাঁচের বারো গলু ওস্তাগার লেনে করালী দত্তের বাড়ির তিনতলার একটি ঘর। এই ঘরের ছত্রিশ বছরের ভাড়াটে গজমাধব মুকুটমণি। তিরিশ বছর কোর্টে লড়াই করে 'সময় স্বাস্থ্য টাকাকড়ি মনের আনন্দ ফূর্তি — সব ঐ আলিপুরে নিবেদন করে' করালী দত্ত গজমাধবকে উচ্ছেদ করার রায় পেয়েছেন। করালী দত্তের বাবার আমলের নিয়ম, বাড়িতে ব্যাচেলর ভাড়া দেওয়া হবে না। গজমাধব ছত্রিশ বছর আগে করালী দত্তের বাবার কাছে মিথ্যে 'বিবাহিত' পরিচয় দিয়ে ঘর ভাড়া নিয়েছিল। ক্রমে সত্য প্রকাশ হতেই আদালতে মামলা, সে মামলা গড়ায় ত্রিশ বৎসর। ইতিমধ্যে করালীর বাবা গত হয়েছেন, মালিক হয়েছে করালী। বহু প্রতীক্ষার জয় এসেছে, আজ তিনি অবিবাহিত ভাড়াটে গজমাধবকে উচ্ছেদ করছেন। আজ করালী দত্তের 'রেড লেটার ডে'। নাটকের শুরুতেই দেখা যায়, গজমাধবের বিদায়ের আয়োজন চলেছে। সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটি জিনিস একত্র করা হয়েছে। একই বাড়ির অন্য ভাড়াটে দাদু, ভুতু ও পরাগ বাঁধাছাদায় সাহায্য করছে, দীর্ঘদিনের প্রতিবেশীর বিদায়ের দিনে তারাও কিছুটা যেন বিষন্ন। আদালতের পেয়াদা কোর্টের রায় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছে। গজমাধব যাত্রার জন্য প্রস্তুত। তার পরিচয় দিতে গিয়ে মনোজ মিত্র লিখেছেন :

> "পরনে ধুতি পাঞ্জাবি, গলায় পাকানো চাদর, মাথায় সাজানো টেরি। গজমাধব একটা প্রাচীন মানুষ, চলনে কথনে। গজমাধব চলে দুলে দুলে - গোঁফের শাখায় সারাক্ষণ একটা মনোহর হাসি তুরতুর করে নাচে।"[২৮]

নাটক একটু এগোতেই বোঝা যায়, এই ঘরটির বাইরে গজমাধবের যাবার কোনো জায়গাই নেই। ছত্রিশ বছর আগে কাঁকড়াপোতা গ্রামে প্রেমিকাকে রেখে সেই যে এসে ঢুকেছিল গলু ওস্তাগারে তারপর আর গ্রামে ফিরে যাওয়া হয়নি তার। প্রেমিকাকে আর স্ত্রীর পরিচয় দেওয়া হয়ে ওঠে নি, ভিটেমাটির সঙ্গেও সম্পর্ক আর থাকে নি। পরবাসেই স্থায়ী হয়ে গেছে গজমাধব। এই ছত্রিশ বছর পর সেই ঘর থেকে উৎখাত হয়ে কোথায় সে যাবে তা জানে না অথচ যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ। করালী দত্তের নতুন ভাড়াটেও এসে গেছে — মন্দিরা আর রতন, যারা বিবাহিত পরিচয় দিয়ে গজমাধবের এই ঘরটি ভাড়া নিয়েছে কিন্তু আসলে যাদের বিয়ে হয়নি। অনাথ আশ্রমে মানুষ হওয়া মন্দিরা একটা মনের মতো ঘর খুঁজে না পেয়ে বারবার বিয়ের তারিখ পিছিয়েছে। চালচুলোহীন গজমাধব যাবার ভঙ্গি করে কিন্তু যায় না, নানা উপায়ে 'টাইম কিল' করে। কখনও একটা মগ, কখনও বা হরলিক্সের বোতল (যাতে

নারকেল তেল রাখা হয়) খুঁজতে সময় নষ্ট করে। বিদায় উপলক্ষে অন্যদের প্রাথমিক বিষণ্ণতা ক্রমে বিরক্তির পর্যায়ে পৌঁছে যায় কিন্তু গজমাধব নড়বার নামটিও করে না। পথের সব বিপদ সম্পর্কে সচেতন করে দিয়ে সকলে যখন আসন্ন বিদায়ের জন্য প্রস্তুত তখনই গজমাধব নেই মোক্ষম প্রশ্নটি উত্থাপন করেছে ঃ "যে সব নির্দেশ দিলেন ... ওসব মেনেগুনে কোথায় যাবো আমি?"[২৯] সকলেই হতচকিত। তার ওপর গজমাধব যখন বলে ঃ "কেন ভাবছেন আমার জন্যে! আর কোনো উপায় না হলে আপনাদের ঘর তো আছেই ..."[৩০] তখন সকলেই একে একে সরে পড়ে। আশ্রয়ের বড়ো অভাব। নিজেদেরই থাকার স্থান সঙ্কীর্ণ। তার ওপর আরেক জনকে কে আশ্রয় দিতে যাবে। যে ভয়ে গজমাধবের আত্মীয়েরা 'গা ঢাকা দিয়ে' আছে, সেই ভয়েই গা ঢাকা দেয় প্রতিবেশীরা। ইতিমধ্যে চলে আসে মন্দিরা আর রতন। সুন্দরী মহিলাকে সাহায্যে উদগ্রীব হয়ে ওঠে গজমাধবের প্রতিবেশীরা। গজমাধবকে তখন তাদের মনে হয় নিতান্ত অবাঞ্ছিত। বাড়িওয়ালা করালী দত্ত 'ব্যাড ইম্প্রেশনে'র ভয়ে মন্দিরা-রতনকে ভাড়াটে উচ্ছেদ সম্পর্কে কিছু জানায় নি, সেই সুযোগে গজমাধব সময় নিয়ে নিচ্ছে। মন্দিরাকে প্রয়োজনের পেরেক-হাতুড়ি দিয়ে, রান্না শিখিয়ে দেবার প্রস্তাব দিয়ে গজমাধব তার শুভানুধ্যায়ী হয়ে উঠেছে। অনাথ-আশ্রমে মানুষ মন্দিরা আর নিঃসঙ্গ গজমাধব বেদনার সেতু বেয়ে পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে। মন্দিরার সামনে নিজের আত্মীয়-পরিজন-সহ পরিপূর্ণ পরিবারের মিথ্যে ছবি এঁকে গজমাধব এক অদ্ভুত তৃপ্তি পেয়েছে। কিন্তু মন্দিরা যখন জানতে পেরেছে গজমাধবের নিঃসঙ্গতা, তখন সে গজমাধবকে নিজের কাছে রেখে দিতে চেয়েছে, এ যেন একজন নিঃসঙ্গ মানুষের প্রতি আর একজন নিঃসঙ্গের বাড়িয়ে দেওয়া হাত ঃ "(গজমাধবের হাত ধরে) কোথায় যাবেন! এ জগতে কেউ কারো না! কতো কষ্ট পাবেন ... আমার কাছে থাকুন!"[৩১] গজমাধবকে এভাবে কেউ কোনোদিন থাকতে বলে নি। কিন্তু গজমাধব মন্দিরার সুখের ঘরে কাঁটা হতে চায় নি। প্রেমিকাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন তার সফল হয়নি বলেই সে বোঝে ঘরের মর্ম। সেই ঘরের সুখ থেকে বঞ্চিত করতে চায় নি মন্দিরা-রতনকে। নিজের ছত্রিশ বছরের আস্তানা ওদের ঘর বাঁধার জন্য ছেড়ে দিয়ে নিঃসঙ্গ গজমাধব রাস্তায় নেমেছে। হাসির নাটক শেষ হয়েছে গভীর বিষাদে।

নিরাশ্রয়, নিরালম্ব গজমাধবের বাসস্থানের সমস্যাকে ঘিরেই নাটক ঘনিয়ে তুলেছেন মনোজ। "কোন একটা একস্ট্রীম (বাংলা করে নিন) অবস্থায় পৌঁছে নিরুপায় একজন মানুষ কীভাবে আচরণ করতে পারে, শেষ পর্যন্ত এসে কীভাবে সে অবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করে"[৩২] তার দৃষ্টান্ত এই নাটক। প্রস্তাবনা দৃশ্যে শহরে গজমাধব আর কাঁকড়াপোতায় প্রেমিকার মধ্যে যে পত্র বিনিময় দেখানো হয়েছে তা থেকে জানা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার কোলকাতায় জাপানী বোমাতঙ্ক, অফিসে ছুটি নেবার কোনো উপায় নেই — ছুটি নিলেই ইনক্রিমেন্ট বন্ধ। তাই বিয়ের শুভলগ্ন পেরিয়ে যায়, কাঁকড়াপোতায় প্রেমিকার কাছে ফেরা হয় না গজমাধবের। নগর কোলকাতায় জীবন-জীবিকার লড়াই তীব্র। গজমাধব প্রেমিকাকে

লেখে — "স্বাধীনতা! ভুল! ভুল! মহাভুল! বাঁচিবার কোন পন্থা নাই!"[৩৩] মনোজ মিত্র বোধহয় বলতে চান, যে স্বাধীনতা মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে পারে না, সে স্বাধীনতা মূল্যহীন। কাঁকড়াপোতার সেই 'পেয়ারাতলা ... রাণীকুঠির ইক্ষুক্ষেত ... শুভ্র জ্যোৎস্না ... মেঘমল্লার ... শ্রাবণের বাদলধারা'র আহ্বান ভুলে গিয়ে গজমাধবকে কোলকাতায় ব্যস্ত থাকতে হয় জীবন সংগ্রামে — টিঁকে থাকার সংগ্রামে। জীবন থেকে হারিয়ে যায় অমূল্য ছত্রিশটি বছর। পাঁচের বারো গলু ওস্তাগর লেনের তিনতলার একটি ঘরেই কেটে যায় জীবনের সোনালি সময়। পড়ন্ত বেলায় আসে উচ্ছেদের নোটিশ! কোথায় যাবে এখন গজমাধব ? তার যে তিন কুলে কেউ নেই। এই মূল দ্বন্দ্বকে ঘিরে কৌতুককর নাট্য-পরিবেশ রচনা করেন মনোজ মিত্র, কিন্তু মাছে মাঝেই সে কৌতুককে ঘিরে ধরে বিষাদ। যতটা সম্ভব 'টাইম কিল' করতে চায় গজমাধব। সামান্য অবলম্বন পেলেও তাকেই আঁকড়ে ধরে টিঁকে যেতে চায় গুলু ওস্তাগারে। বাইরের পৃথিবী যে তার কাছে অচেনা। দইয়ের ফোঁটা কেটে, রসগোল্লা খাইয়ে, বেডিং বেঁধে দিয়ে গজমাধবকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত করে দিচ্ছে প্রতিবেশী ভাড়াটেরা। কিন্তু গজমাধবের যাবার কোন জায়গা নেই শুনে তারা হতবাক। তবে গজমাধব নিজে যেন তেমন চিন্তিত নয় ঃ "আপনাদের সহৃদয় আন্তরিক ব্যবহার দেখে ভাবছি, কেন এতো ভাবছি আমি! এমন করে যারা আমার বিছানা বেঁধে দিতে পারে, তারা কি আর একটু স্থান না দিতে পারে!"[৩৪] এই সময় কাটানোর প্রশ্নে গজমাধবের আচরণ কখনো অতিরেক মনে হলেও আসল এর মধ্যে রয়েছে এক বিপন্ন মানুষের অসহায়তা। যেমন, প্রতিবেশী ভাড়াটেরা যখন মন্দিরা-রতনের জন্য গজমাধবকে বিদায় করতে ব্যগ্র তখন গজমাধব একটা মগ হাতে করে ঢোকে ঃ "(হঠাৎ মগটা তুলে) কী সর্বনাশ! ... এটা ফেলে যাচ্ছিলাম! ... দেখি কী, রান্নাঘরে তাকের ওপর ঘাপটি মেরে পড়ে আছে! আমার মগ..."[৩৫] একেবারে চূড়ান্ত বিদায়ের মুহূর্তে করালী দত্ত মুহূর্তের জন্য দুর্বল হয়ে পড়লে সেই সুযোগ নিয়ে থেকে যেতে যায় ঃ "তবে থাক, গিয়ে কাজ নেই! ... সত্যি আপনি কাঁদবেন আমি চলে যাবো ... না না, সে হয় না ... (করালী হতবাক। করালীর চোখ মুছিয়ে) দ্যাখো পাগল কাঁদে ... যাচ্ছি না ..."[৩৬] এমনকি বেরিয়ে যাবার পরও করালী যখন বিচ্ছেদ ব্যথায় ভেঙে পড়ছে তখন গজমাধব আবার আরেক দরজা দিয়ে এসে ঘরে ঢুকে পড়েছে। হাওয়া অফিসের কর্মী ভুতু গজমাধবের বিদায়কে ত্বরান্বিত করতে সংবাদ দিয়েছে, সন্ধ্যার দিকে আবহাওয়া খারাপ হবে। প্রবল বৃষ্টি আর ঝড়ের জন্য বিদেশগামী জাহাজের যাত্রা স্থগিত করা হয়েছে। সেই সুযোগটুকুকেই আঁকড়ে ধরেছে গজমাধব ঃ "(ধমকে ওঠে) দূর মশাই, যাবো কীসে! শুনলেন না জাহাজ বন্ধ।"[৩৭] পাকা বদমাসের মতো মন্দিরাকে বাড়ির বিভিন্ন খুঁতের কথা বলে ভাংচি দিতে চায়, কিন্তু দেখা যায় করালী দত্ত নতুন ভাড়াটের জন্য সবকিছু সারিয়ে রেখেছে। অগত্যাই যখন যেতে হবে তখন গজমাধব রতনকে অনুরোধ করেছে খিদিরপুর ডকে সেজোমামার মেজোছেলেকে একটা ফোন করে দিতে। তাকে গজমাধব কোনদিন দেখেনি, তার নাম শিবতোষ, সন্তোষ, মহীতোষ না ভোলা তাও জানা নেই। বিভ্রান্ত রতন যখন ফোন করে এসে জানায় যে, সন্তোষ

বা প্রেমতোষ গজমাধবকে চেনে না, আর ভোলা নামে যে ছিল সে যুদ্ধের সময় মারা গেছে, তখন সেই মৃত ভোলাকে অবলম্বন করেই গলু ওস্তাগর টিঁকে যেতে চাইল গজমাধব। অদেখা সেই ভোলার শোকে প্রবল কান্না জুড়ে দিল। শোকগ্রস্ত মানুষের প্রতি সমবেদনা স্বাভাবিক। মন্দিরা তাকে নিয়ে ভেতরে চলে যায়। আপাতভাবে মঞ্চের ওপর এসব Situation প্রবল হাসির উদ্রেক ঘটায় কিন্তু তার মাঝেও গজমাধবের বেদনার দিকটিও চাপা থাকে না। অনিকেত একটা মানুষ সব বুঝেও না বোঝার ভাণ করছে, পথে নামার আগে শেষবারের মতো চেষ্টা করছে আশ্রয়টা টিঁকিয়ে রাখার — এতে তার চরিত্রের কারুণ্যের দিকটিই প্রকাশ পায়। কিন্তু নাটকের শেষে এই গজমাধব আর করুণার পাত্র থাকে না, মহত্ত্বে উত্তীর্ণ হয়। মন্দিরার কাছে সে সাজানো সংসারের মিথ্যে গল্প করেছিল কিন্তু বিয়ে করা তার হয়ে ওঠে নি। ঘরে যে আসে নি, মনে তার নিত্য আসা যাওয়া, সেই কল্পনাকেই মূর্ত করে তোলে মন্দিরার সামনে ঃ ''শুধু এই কপালটায় যখন সিঁদুরের টিপ লাগিয়ে ... লালপেড়ে শাড়ি পরে ... প্রদীপ হাতে ... যখন সামনে এসে দাঁড়ায় ...''[৩৮] নিজের জীবনে সম্পূর্ণতা আসে নি, তাই সম্পূর্ণ জীবন দেখার লোভ গজমাধবের। তাই সাজানো ঘরের চেহারা দেখতে লোভীর মতো, চোরের মতো সে বারবার ফিরে এসেছে। পাখি, গাছ, ফুল দিয়ে গড়া মন্দিরার পূর্ণ সংসারের জন্য গজমাধব, সংসারের কাছ থেকে কিছু নিতে না পারা গজমাধব, পথে নেমেছে ঃ

> ''আমি চলে যাচ্ছি ... শুনছ ... আমি চলে যাচ্ছি ... (পকেট থেকে কৌটো বার করে) এই কৌটোয় একটু ছাতু আছে ... তোমরা বোধহয় আনতে ভুলে গেছো ... (পাখির খাঁচার সামনে গিয়ে) কিন্তু এরা খাবে কি! যখন ওদের খিদে পাবে ... জল মেখে খেতে দিয়ো। ... তোমার ঐ গাছটা ... জানালায় বসিয়ে রেখো ... রোদ পাবে, জল পাবে ... পাতা বেরুবে ... নতুন পাতা ...''[৩৯]

এই নতুন জীবনকে, নতুন সম্ভাবনাকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে যায় 'নিঃস্ব', 'বাতিল' লোক গজমাধব। নিজের জীবনে তার সুর জাগে নি কিন্তু সে জানে, মন্দিরার 'তানপুরাটা যে কোনো মুহূর্তে বেজে উঠবে।' সেই সুখ কি করে ভাঙে সুখের স্বপ্ন দেখা গজমাধব! তারই স্বপ্ন যে আজ সাকার হতে চলেছে তারই ঘরে — স্বপ্নকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে তাই নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় গজমাধব।তাঁর এই নিষ্ক্রমণ মমতার কাছে স্বেচ্ছায় পরাজয় বরণ ঃ

> ''বলবান শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করতে সে বিনত শিরে এমন কূটচাল চেলেছে যে তা বাড়ির মালিককে উন্মাদপ্রায় করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু যখনই নতুন ভাড়াটের গৃহিণীর (?) মমতা অর্জনে সে সমর্থ হল, তখনই সে তার সমস্ত অস্ত্র পরিত্যাগ করল, অনাত্মীয়ের স্নেহ তাকে পরমাত্মীয়ের স্নেহের স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনল, সে খালি হাতে আসন্ন সন্ধ্যায় বাসা ছেড়ে ঠিকানাহীন পৃথিবীর যে কোন অংশে হারিয়ে গেল।''[৪০]

'পরবাস' হাসির নাটক। মনোজ মিত্র হাসির Situation তৈরিতে এবং উপযুক্ত সংলাপ রচনায় সিদ্ধহস্ত। এ নাটকও তার ব্যতিক্রম নয়। বেডিং বাঁধতে গিয়ে ভুতুর পা বেঁধে ফেলা, বিরাট বাটিতে একফোঁটা দই নিয়ে নিমাইয়ের গজমাধবের কপালে ফোঁটা কাটা, করালীর

উল্লাস, গজমাধবের বাইরের ও ভেতরের দরজায় লুকোচুরি খেলা, সাড়া দেবার বিচিত্র ভঙ্গি, মন্দিরা সম্পর্কে দাদু, ভুতু ও পরাগের কৌতূহলমিশ্রিত আকর্ষণ, রতন-মন্দিরার বিয়ে না হওয়ার কথা করালী দত্তের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ার পর 'ম্যানেজ' করার চেষ্টায় অদ্ভুত সব কথা, বিছানায় শুয়ে থাকা গজমাধবের ওপর করালী দত্তের বসে পড়া, মন্দিরার কাপড়ে ছারপোকা দেখতে দাদুর ব্যগ্রতা প্রভৃতি Situation হাসির নাটকের পক্ষে উপযুক্ত। তবে কোথাও কোথাও অতিরঞ্জনও লক্ষিত হয়। বিশেষত গজমাধবের সেজোমামার মেজোশালার পরিচয় নিয়ে রতন-গজমাধবের কথোপকথন একটা পর্যায়ের পর অতিরঞ্জন বলেই মনে হয়। কিন্তু নাট্যকারের প্রধান কৃতিত্ব এই যে — পাঠক দর্শককে হাসাতে হাসাতেই তিনি নিয়ে গেছেন বিষাদের প্রান্তে। আর অন্তিমের সেই বিষাদ গজমাধবের পূর্বাপর আচরণের ওপর কারুণ্যের একটি আস্তর রচনা করে যার ফলে 'পরবাস' হয়ে ওঠে 'বিষণ্ণ হাসির নাটক'।

আধুনিক মানুষের আশ্রয়ের সমস্যা দুই প্রজন্মের দুই জোড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্য দিয়ে মনোজ মিত্র দেখিয়েছেন 'দম্পতি' (১৯৭৮) নাটকে। দুই অঙ্কে বিভক্ত এই নাটকের প্রথম অঙ্কে চারটি ও দ্বিতীয় অঙ্কে ছয়টি দৃশ্য। এর মধ্যে প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য বাদে অন্য সবগুলি দৃশ্য একটি বাড়ির ওপর বা নিচের তলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিচের তলায় থাকেন বাড়িওয়ালা কর্তা ও গিন্নি এবং তাদের চাকর কানাই আর ওপরতলায় থাকে ভাড়াটে দম্পতি বকুল-শ্যামল। বকুল চাকরি করে, শ্যামল মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ। একদিন ভোরবেলায় নিচের তলায় গিন্নির কণ্ঠে শুকসারীর গান দিয়ে নাটক শুরু হয়। শুকসারীর গানে শুক এবং সারী রাধা ও কৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করে তাদের গুণপনা বর্ণনা করে। এই গানে রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে আপাত দ্বন্দ্ব থাকলেও দুইয়ে মিলে সম্পূর্ণতার কথাই ব্যঞ্জিত হয় :

"শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন

সারী বলে আমার রাধা পাশে যতক্ষণ

মদন তাইতো মোহন।" [৪১]

দিন শুরু হতে না হতেই শুরু হয় কর্তা-গিন্নির বাকযুদ্ধ, চলে গভীর রাত পর্যন্ত। কর্তা রোগে ভুগে ভুগে খিটখিটে। তার ওপর সন্দেহবাতিক। অকৃতদার বন্ধু জিতেনের প্রতি স্ত্রীর দুর্বলতা আছে বলে তিনি সন্দেহ করেন। গিন্নিও জিতেনবাবুর প্রশংসা করে, নানারকম ইঙ্গিত করে, এমনকি তার সঙ্গে মোটরে করে বেড়াতে বেরিয়ে কর্তাকে ক্ষেপিয়ে মজা পায়। কিন্তু আসলে জিতেন এই পরিবারের একজন ভাল বন্ধু মাত্র। কর্তা-গিন্নির দুই ছেলের একজন দিল্লি, একজন আসাম। কর্তার পক্ষপাতিত্ব বড়খোকার প্রতি আর গিন্নির ছোটখোকার প্রতি। ওপর তলায় শ্যামল আর বকুলের দাম্পত্য। শ্যামল সন্তান চায় না, প্রতিদিন মিলনের আগে বা পরে বকুলকে ট্যাবলেট দেয়। বকুল তা না খেয়ে জমায় পেটমোটা একটি পুতুলের মধ্যে — কারণ সে সন্তান চায়, নারীত্বের পূর্ণতা চায়। নিজেদের প্রেমে পড়ার দিনটাকে সেলিব্রেট করতে বকুল শ্যামলের সঙ্গে মোটরবাইকে চড়ে বকখালি যেতে চায়। অফিসের কাজের জন্য

প্রথমে রাজি না হলেও পরে নিমরাজি হয় শ্যামল। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা ফোন আসে। বকুলের কছে নিজের পরিচয় না দিলেও শ্যামল ফোন ধরে বুঝতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রেমিকা দোলন বা দোলা, যার সঙ্গে পরে বিয়ে হয়েছে শ্যামলেরই বন্ধু সন্দীপের। দোলন বিশেষ প্রয়োজনে আজ দেখা করতে চায় শ্যামলের সঙ্গে। বলে, সুদীপের সঙ্গে তার ডিভোর্স হয়ে গেছে। শ্যামলের উভয় সঙ্কট। দোলা শ্যামলের অহংকারে আঘাত দেয় বৌ নিয়ে আউটিংয়ের মধ্যবিত্ত মানসিকতার কথা বলে। শ্যামল হুট করে রাজি হয়ে যায় দোলার সঙ্গে বকখালি যেতে। বকুলকে বলে, অফিসের কাজে এখনি বর্ধমান যেতে হবে। বেড়াতে যাবার জন্য প্রস্তুত বকুলকে রেখে বেরিয়ে যায় শ্যামল। রাগে, দুঃখে, অপমানে ক্ষুব্ধ বকুল নিজের অফিসের জুনিয়র ছেলে অরূপকে নিয়ে বকখালি যায় শ্যামলকে শিক্ষা দিতে। বাড়িতে যখন জিতেনকে মাঝখানে রেখে কর্তা-গিন্নির টানাপোড়েন চলছে তখন বকখালি ট্যুরিস্ট লজে স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ে গিয়ে উঠেছে শ্যামল ও দোলন আর একই লজে ঘর নিতে এসেছ বকুল-অরূপ। দোলন কোনো কারণ না জানিয়ে শ্যামলের কাছে কুড়ি হাজার টাকা চায়, না দিতে চাইলে চিৎকার করে লোক জড়ো করে শ্যামলের নামে মিথ্যা অপবাদ দেয়। শ্যামল ঝোঁকের বশে চলে এসেছে ঠিকই কিন্তু তারপর বকুলকে কাঁদিয়ে রেখে আসার জন্য অনুতপ্ত হয়েছে। দোলনের সঙ্গে কোন অসদাচরণ সে করে নি। অন্যদিকে বকুলও জেদের বসে বকখালিতে চলে এসে শ্যামলের জন্য মনে কষ্ট পেয়েছে। দুজনের মনের এই অবস্থায় তারা মুখোমুখি হল এমন একটা পরিস্থিতিতে, যখন বকুল ভাবছে শ্যামল দোলনের সঙ্গে আর শ্যামল ভাবছে বকুল অরূপের সঙ্গে বকখালিতে ফূর্তি করতে এসেছে, দুজনের ওপরেই তখন চেপে বসেছে নিদারুণ মিথ্যার পাহাড়। এদিকে বাড়িতে নিচের তলায় কর্তা চিঠি লিখে বড়খোকাকে আনিয়েছেন। বড়খোকা বাড়ি বিক্রি করে দিতে চায়। সেই টাকায় মেয়ের বিয়ে দেবে। বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবার পর এসে উপস্থিত হয় ছোটখোকা। দাদার সঙ্গে যোগসাজশ করে বাড়ি বিক্রির টাকা আধাআধি ভাগ করে নেয়। সেই সঙ্গে মা-বাবাও ভাগাভাগি হয়ে যায়। বড়খোকার ওখানে কাজের লোক পাওয়া যায় না, তাই সে মাকে নিয়ে যেতে চায়, যদিও এতদিন বাবার দিকেই তার টান ছিল বেশি। 'উদার' ছোটখোকা মাকে দান করে দেয় দাদাকে, নিজে নেয় বাবাকে। ওপরতলায় শ্যামল-বকুলের চরম অশান্তি। বকুলের গর্ভের সন্তানের জন্য শ্যামল দায়ী করে অরূপকে, যদিও পরে তার ভুল ভাঙে আর বকুল শ্যামলের বকখালির ব্যভিচার স্মরণ করে তাকে ঘরে ঢুকতে দেয় না। গর্ভের সন্তানসহ সে এখন একা। বাড়ি বিক্রির ফলে শুধু কর্তা-গিন্নিকেই আশ্রয়চ্যুত হতে হয় না, সেই সঙ্গে বকুলও অগাধ জলে পড়ে। গর্ভের সন্তানকে নিয়ে সে এখন কোথায় যাবে। আর বিপাকে পড়ে কানাই। সেই ছোটবেলা থেকে সে কর্তা-গিন্নির কাছে আছে। এখন দুই ছেলে তাদের দুই ভাগ করে ফেলল কিন্তু কানাই যে কোনো ভাগেই নেই। শেষ দৃশ্যের আগের দৃশ্যে দোলন এসে বকুলের ভুল ভাঙিয়ে দেয়। দোলনকেও নাট্যকার পাঠক-দর্শকের সহানুভূতিতে উত্তীর্ণ করে দেন এই সংবাদ দিয়ে যে, দোলন শ্যামলকে ব্ল্যাকমেল করেছিল নিজের স্বামীকে পুলিশের হাত

থেকে বাঁচাতে। একেবারে শেষ দৃশ্যে নাটকীয় চমক দেন মনোজ মিত্র। আসাম এবং দিল্লির মালপত্র দুই ভাগে বাঁধা। মনে পড়ছে কত পুরনো কথা। মনে আসছে কত আশঙ্কা। হয়তো শেষ সময়ে দুজনের দেখা হবে না, হঠাৎ টেলিগ্রামে সংবাদ আসবে — একজন চলে গেছে। আজ আর ঝগড়া নেই। চূড়ান্ত বিদায় আসন্ন। ট্যাক্সি এসে গেছে। কুলিরা মালপত্র তুলছে। গিন্নি কেঁদে উঠেছে। এইসময় জিতেন এসে দাঁড়ায়, কুলিদের মাল নামাতে নির্দেশ দেয়। জানা যায়, শুকলাল শেঠকে দিয়ে আসলে বাড়ি কিনেছে জিতেন। বিচ্ছেদ সে রুখে দিয়েছে। মুহুর্তের জন্য জিতেন রূঢ় হয় ঃ

> ''কেউ যাবে না। সবাই থাকো। শ্যামল বকুল, তোমরাও যাবে না কেউ। সবাই থাকো। যাবে শুধু ওরা – (জিতেন বড়খোকা ও ছোটখোকার দিকে ফেরে।) দেড়লাখ টাকা পেয়েছ ... হাফ্ হাফ্ হয়েছে... সাড়ে ছয়টায় আসাম মেল ... সাড়ে সাতটায় কালকা... ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে... যাও খোকারা বেড়িয়ে পড়ো। এরপর কিন্তু মিনিটে মিনিটে ঘর ভাড়া চার্জ করবো ...''[৪২]

কিন্তু সহানুভূতিশীল মনোজ মিত্র শেষ পর্যন্ত কারো কষ্ট দেখতে পারেন না। তাই দুই ছেলে মাথা নিচু করে বেরিয়ে যেতে গেলেই তাদের পথ আগলায় জিতেন ঃ ''যাচ্ছো কোথায় ? দাঁড়াও ! ট্যাক্সি আমি ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছি। আরে আমি যেতে বললেই যাবি কেন ? জিতু কাকার উপর তোদের জোর নেই ?''[৪৩] সমাপ্তিকে আরো মধুর করতে নাট্যকার ছোট্ট তাতাইকে দিয়ে বলান ঃ ''বাড়িটা যখন আমাদেরই থাকলো, তখন বাড়ি কেনার টাকাটা তুমি ফিরিয়ে নাও জিতুদাদু''[৪৪]। দুই ছেলে ভাগ করা টাকা আবার এক করে ফেরৎ দিতে ভেতরে যায়। সকলের হাসিমুখ আর শুকসারীর গানে নাটক শেষ হয়।

মনোজ মিত্রের অন্যতম প্রিয় বিষয় পরিবারের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অবস্থা। প্রত্যেক পরিবারেই যখন শিকড় ছেঁড়ার প্রবণতা প্রবল তখন এই প্রাচীন মানুষেরা সংসারে যেন অবাঞ্ছিত। তাদের সুখ-দুঃখ, ভালোলাগা-মন্দলাগার যেন কোনো মূল্যই নেই সংসারে। অন্যের ইচ্ছাই তাদের নিয়ন্ত্রক। এই অন্যেরা অর্থাৎ সন্তানেরা শিকড়ের প্রতি কোনো টান অনুভব করে না। স্বার্থই তাদের সর্বস্ব। মনোজ মিত্রের সহানুভূতি সংসারের এই অনাদৃত মানুষগুলির প্রতি। এদের হেরে যেতে দেন না তিনি, জিতেনের মতো কোনো একজন মানুষের হাত ধরে ডুবে যেতে যেতেও এরা আবার ভেসে ওঠে। এটাই তাঁর বিশ্বাসের জগৎ। সংসারে শুধু স্বার্থপর বড়খোকা-ছোটখোকাই নেই, স্বার্থশূন্য বন্ধু জিতেনও আছে – এই বিশ্বাসে পাঠক-দর্শককে উত্তীর্ণ করতে চান তিনি। বাড়ি মানে তো শুধু থাকার জায়গা নয়, বাড়ি মানে একটা শিকড়, একটা অস্তিত্বের অনুভব, একটা মায়া, একটা টান, গাছ-গাছড়া, প্রতিবেশী সকলকে নিয়ে জড়িয়ে থাকা। আধুনিক কালে বাড়ি সংক্রান্ত এই অনুভব 'ঠুনকো সেন্টিমেন্ট' বলেই পরিচিত। কিন্তু মনোজ মিত্র আধুনিক হয়েও সদর্থে প্রাচীন। তাই তাঁর নাটকের চরিত্ররা তথাকথিত সেন্টিমেন্টের

অনুভূতিতে আলোড়িত হয়। কর্তা এবং গিন্নি সারাজীবন যে বাড়িতে কাটালেন, জীবনের পড়ন্ত বেলায় আজ সে জায়গা ছেড়ে দুজনকে যেতে হবে দুপ্রান্তে — একজন আসাম, আর একজন দিল্লি, কারণ তাদের সন্তানেরা সেইরকম বিধান দিয়েছে। কর্তা-গিন্নির ঝগড়াঝাঁটির সুযোগে বড় ছেলে বাবাকে দিয়ে বাড়ি বিক্রি করিয়ে নিয়েছে, কর্তার এখন আক্ষেপ একমাত্র সম্বল ঃ ''হ্যাঁ, বাড়িটা বিক্রি করে সর্বস্ব হাতিয়ে নিয়ে এখন আমি কোথায় থাকবো সেটা তোমাদের মর্জির ওপর।''[৪৫] এই সন্তানদের ওপর মনোজ মিত্রের তীব্র রাগ। সেই রাগই যেন ব্যঙ্গের আকারে ব্যক্ত হয়েছে জিতেনের সংলাপে ঃ ''লাউ, কাঁঠাল, কুমড়ো ভাগ হয় ... জমিজমা ভাগ হয় ... দেশ ভাগ হয় ... দেশে দেশে গঙ্গার জল ভাগ হয় ... মা বাপ ভাগ হবে, এতে আর কি আছে রে ?''[৪৬] শেষ সম্বল বাড়িই ছিল 'পায়ের তলায় মাটি'। তা চলে যেতে আর নিজেদের ইচ্ছে-অনিচ্ছে বলে কিছু নেই। শুধু ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হওয়াই নয়, পরস্পরের কাছে যে আশ্রয়, তা থেকেও বিচ্যুত হতে হচ্ছে আজ ঃ ''কতো বললাম, ওরে আশ্রমে পাঠিয়ে দে — বনে জঙ্গলে পাঠিয়ে দে — শুধু একসঙ্গে রাখ। কেউ শুনলো না... কেউ শুনলো না ...!''[৪৭] জিতেন ডাক্তার অকৃতদার — ভাইপোদের সংসারে থাকেন। এই পরিবারটি তার কাছেও ভালোবাসার এক পরম আশ্রয়। সে আশ্রয় রক্ষা করতেই তিনি শুকলালের বেনামিতে বাড়ি কেনেন, কর্তা-গিন্নির বিচ্ছেদ রুখে দেন। স্বার্থপরতার ওপরে মানবিকতার জয় দেখান মনোজ মিত্র। বাড়ি সম্পর্কে, শিকড় সম্পর্কে তাঁর যে রোমান্টিসিজম আছে তা যেন ব্যক্ত হয়েছে কর্তার নাতি ছোট্ট তাতাইয়ের মুখে ঃ ''আমাদের একটা বাড়ি ছিলো! ছুটিতে আমরা আসতাম, আনন্দ করতাম! সবাইকে বলতাম, আমাদের একটা দেশ আছে, দেশে বাড়ি আছে! সব বেচে দিলে বাবা!''[৪৮] এই শিকড় ছেঁড়ার বিরুদ্ধেই নাট্যকারের প্রতিবাদ। আশ্রয়ের সমস্যাই একটু ব্যঞ্জনার আকারে এসেছে ওপরতলার শ্যামল-বকুলের দাম্পত্যের মধ্য দিয়ে। দাম্পত্যের মূল ভরকেন্দ্র বিশ্বাসবোধ। সেই বিশ্বাসবোধের আশ্রয়েই বেঁচে থাকে মানুষ। বিশ্বাসবোধ নষ্ট হলে জীবন কীভাবে নিরাশ্রয় হয়ে পড়তে পারে তা দেখিয়েছেন মনোজ মিত্র এই দম্পতির ছবি এঁকে। আধুনিক জীবনে মানুষ ছোটে শুধু অর্থ, প্রমোশন, কাজের পেছনে। সন্তানও সে প্রতিযোগিতার জীবনে অবাঞ্ছিত। কিন্তু জীবনের সমগ্রতার প্রতি মনোজ মিত্রের লোভ। তাই বকুলের সন্তান সম্ভাবনাকে তিনি নষ্ট হতে দেন না, সযত্নে লালন করেন। সন্তানের আবির্ভাবের সম্ভাবনাসহ বকুল এবং শ্যামলকে ফিরিয়ে দেন দাম্পত্যের নিশ্চিত আশ্রয়ে। পরিণতির এই ইতিবাচক দিকটিই তাঁর নাটক রচনার বিশিষ্ট ভঙ্গি, যদিও এই নাটক সম্পর্কে সমালোচক আক্ষেপ করেছেন ঃ

> ''পুরানো কাল এবং আধুনিক কাল, ব্যক্তি স্বাধীনতা, রক্ষণশীলতা ও নারী পুরুষ সম্পর্কের নানা পর্যায়ের অসংখ্য সূক্ষ্ম জটিলতায় এ নাটক যে গভীরতায় যাবার সম্ভাবনা ছিলো, বলতেই হবে, সেখানে একে যেতে দেওয়া হলো না, জোর করে, প্রায় গলা টিপে ফেলে দেওয়া হলো সুখী সমাপনের চেনা ছকের মধ্যে।''[৪৯]

'দম্পতি' কমেডি নাটক। ১৯৮৬-৮৮ 'রঙ্গনা'য় এই নাটক নিয়মিত অভিনয় হয়। কর্তার চরিত্রে এবং পরিচালনায় ছিলেন নাট্যকার স্বয়ং। 'ভালোবাসা' নামে এর চলচ্চিত্রায়ণও হয়েছে, যেখানে নাট্যকার নিজে কর্তার চরিত্রে অভিনয় করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই নাটকের অনেক সংলাপ পাঠকালে মঞ্চের ওপর অভিনয়রত নাট্যকারকেই যেন প্রত্যক্ষ করা যায়। কর্তা-গিন্নির ঝগড়া, নিজের স্ত্রীকে কর্তার সন্দেহ, জিতেন ডাক্তার এবং গিন্নি মিলে কর্তাকে ক্ষেপিয়ে দেওয়া, নাপিত বা দুধওয়ালাকে সাক্ষী রেখে কর্তা-গিন্নির পরস্পরকে দোষারোপ, চাকর কানাইয়ের আচরণ প্রভৃতি হাস্যরস সৃষ্টির সহায়ক। ছেলেদের স্বার্থপরতায় নাটক যখন অনিবার্য বিচ্ছেদের ট্র্যাজিক পরিণতির দিকে এগোচ্ছে তখন নাট্যকার জিতেনের মাধ্যমে মিলনান্তক সমাপ্তি ঘটালেন। এই সমাপ্তি আধুনিক নাটকের বিচারে আরোপিত মনে হতে পারে, ইচ্ছাপূরণ মনে হতে পারে, কিন্তু তা মনোজ মিত্রের বিশ্বাসের জগৎ থেকে উদ্ভূত। তিনি মানুষের, বিশেষত অসহায়, বিপন্ন মানুষের হেরে যাওয়া দেখতে চান না, দেখাতে চান না।

'পালিয়ে বেড়ায়' (১৯৯৯) আর একজন অনিকেত মানুষের গল্প। সেই মানুষটি হ'ল রূপচাঁদ, যাত্রাদল কৈলাস অপেরার বাঁশিওয়ালা। সেই ছোটোবেলায় বিধবা মায়ের অবৈধ প্রণয় চোখে পড়ে যাওয়াতে মায়ের প্রেমিক বোঁচা-মামার হাতে মার খেয়ে মুখচোখ ফুলিয়ে সারারাত ধানবনে পড়ে কেঁদেছিল নন্তু — নন্তু হালদার। ভেবেছিল মা হয়তো ডেকে বাড়িতে নেবে। কিন্তু বাড়ি থেকে ডাক আসেনি। সকালে বাড়ি ঢুকে নন্তু দেখে ঘর ফাঁকা — বাচ্চা বোনটাকে নিয়ে নন্তুর মা বোঁচামামার সঙ্গে চলে গেছে। সেই যে সুতো আলগা হ'ল, আর কোনোদিন সংসারের সঙ্গে সেভাবে জড়াতে পারেনি নিজেকে। তখন থেকেই সে পালিয়ে বেড়ায়। কিন্তু তার পালানোর মধ্যে একটু অদ্ভুততত্ত্ব আছে ঃ

> 'আমি যাদের ছেড়ে পালাচ্ছি ... তারা আমাকে কতো ডাকাডাকি করছে ... খোঁজাখুজি করছে ... মানে আমার জন্যে কতোটা ব্যাকুল হচ্ছে ... দূরে বসে সেইটে জানতে আমার খুব ভালো লাগে ...'[৫০]

এই পলাতক অবস্থায় নন্তু তথা রূপচাঁদ সবসময় 'ফ্রী' থাকতে চায়, যাতে ডাকলেই ধরা দেওয়া সম্ভব হয়। ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করে সেই ডাকটির জন্য। কিন্তু সবসময় ডাক আসে না। চোদ্দ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে নন্তু, কেউ ডাকেনি, ফেরাও হয় নি। বিয়ে করতে বসে ছাদনাতলা থেকে পালিয়েছে — বেশিদূর যায়নি — কনের বাড়ির পেছনে লিচুগাছটার কাছেই ছিল — কিন্তু কেন যেন সেভাবে কেউ খুঁজল না — ফেরাও হল না। কনের বাড়িতে তখন সেই লগ্নেই নতুন পাত্র জোটানোর দায়। কিন্তু তাই বলে, নন্তুর আক্ষেপ ঃ 'কেউ একবারও বলবে না, আগের পাত্তরটাই ভালো ছিল। মেয়েটা বলবে না, তাকে ছাড়া বিয়ে করব না। মূর্ছাটুর্ছা যাবে না? কাঁদতে কাঁদতে একবার লিচুগাছের দিকে ছুটে আসবে না '[৫১]। ফিরে ডাক শোনার বড় লোভ রূপচাঁদের। সে ডাক আর কোথাও থেকে না আসুক, কৈলাস অপেরা থেকে আসে। কৈলাসের মালিক ছোড়দা জানেন চিৎপুরে এরকম বাজিয়ে আর

একটাও নেই। তাই তিনি ডাকেন, চল্লিশ বছরে চোদ্দবার পালাবার পরও রূপচাঁদকে আকুল হয়ে ডাকেন। পনেরো বারের বার লাস্ট ট্রেনের কামরায় রূপচাঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় গন্ধকালীর, যার 'জোড়া পায়ের নাথি' তে দু'দুটো মরদ ছিট্‌কে পড়ে। গন্ধকালী চলেছে কেষ্টনগরে। গাঙডাকাত হুলো গাঙ ছেড়ে ডাঙায় উঠেছে। সেই হুলো গন্ধকালীকে মেয়ে বলে 'কেলেম' করে। পুলিশ প্রতিদিন গন্ধকালীকে হুলো ডাকতের জন্য নাজেহাল করে। সেই হুলোকে নাকি কেষ্টনগরের বাসস্ট্যান্ডে দেখা গেছে। গন্ধকালী তাই চলেছে হুলোকে ধুলো করতে। কেষ্টনগরে একটা আস্তানা তার প্রয়োজন। একই গাড়িতে আছে নাঙ্গাবাবা এবং তার সাকরেদ নেপাল, আছে ভারতে চোখ অপারেশন করতে আসা বাংলাদেশের নাগরিক আতাউল্লা খান আতা, আছে প্রমোটার ভানু খেমকা। নাঙ্গাবাবার আশ্রম এই রেলগাড়ি, চেলাচামুন্ডা রেলের কামরায় ছড়ানো। বাবা 'কত্তাল বাজা' বলে চিৎকার করে উঠলেই চেলারা যাত্রীর সর্বস্ব লুঠ করে। এভাবেই আতাউল্লার সর্বস্ব এবং রূপচাঁদের বাঁশির ব্যাগ হৃত হয়েছে। রূপচাঁদ গন্ধকালীকে কেষ্টনগর থেকে এক ঘন্টার হাঁটা পথ ফুলবাড়ি গ্রামে নন্তু হালদারদের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। সেই পোড়ো বাড়িই আবার নাঙ্গাবাবা তথা হুলো ডাকাতের 'হেড কোয়ার্টার'। ভানু খেমকা সেই বাড়িতেই গড়ে তুলতে চায় ফাইভ স্টার হোটেল। আতাউল্লা ভারতে এসেছিল নিজের পৈতৃক ভিটের সন্ধানে। ভানুর মুখে 'ফুলবাড়ি' নামটা শুনে তার মনে পড়ে যায়, ফুলবাড়ি গ্রামেই ছিল তার জন্মভিটে। শুধু এরাই নয়, পজেশান নেবার জন্য ভানু খেমকা যাদের নন্তুর বোন-বোনের জামাই সাজিয়ে এনেছে, তারাও সে রাতে উপস্থিত ফুলবাড়ি গ্রামে। এই গ্রামেই আবার বিয়ে হয়েছে নন্তুর সেই পালিয়ে ফেলে আসা কনে শিখার, মহিলা সংরক্ষণের জন্য যে এখন অঞ্চলপ্রধান। এদের সকলকে নিয়ে চল্লিশ বছর আগের সেই পরিত্যক্ত বাড়িতে জমে ওঠে নাটক। সাজানো বোন-বোনের জামাই ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে চাইলেও গন্ধকালীর সঙ্গে পেরে ওঠে নি। গন্ধকালী রূপচাঁদকে নিয়ে রীতিমত সংসারই পেতে বসেছে পোড়োবাড়িতে। সাজানো বোন রূপচাঁদের পরিচয় পেয়ে জড়িয়ে ধরে ভালোবাসা দেখায়। কিন্তু এসবে অনভ্যস্ত রূপচাঁদ অস্বস্তি বোধ করে। যে বাড়িতে কেউ তার কথা ভাবেনি, একবার খোঁজেনি, সেই বাড়ির প্রতি, বাড়ি বিক্রির টাকার প্রতি কোনো আকর্ষণই নেই রূপচাঁদের, সে এককথায় সব ছেড়ে চলে যেতে চায়। কিন্তু গন্ধকালী অন্য ধাতুতে গড়া। সে 'দোখ্‌নে নাইনের ঘুঘু'। তাই রূপচাঁদ সট্‌কে পড়লেও সে রূপচাঁদের বৌ সেজে সম্পত্তি আগলায়। অঞ্চল প্রধানের কাছে গিয়ে দরবার করে। নাঙ্গাবাবা এবং নেপাল আতাউল্লার মেয়ের বিয়ের যেসব জিনিস হাতিয়ে এনে হেড কোয়ার্টারে রেখেছিল সেগুলি পড়েছে গন্ধকালীর হাতে। গন্ধকালী সেই ঢাকাই জামদানি আর পায়ের মল পরে গেছে অঞ্চলপ্রধানের বাড়ি, আতাউল্লাও সেখানে উপস্থিত নিজের জিনিস চুরির অভিযোগ জানাতে। সেখানেই সে চিনেছে জামদানি আর পায়ের মল। অঞ্চল প্রধান শিখারাণী আতাউল্লাকে নিয়ে হালদার বাড়ি যেতে প্রস্তুত হয় বাড়ির পজেশান ভানু খেমকাকে দিতে এবং চোর-বাটপাড় শায়েস্তা করতে। কিন্তু প্রধান তৈরি হতে ঘরে যেতেই নেপাল এসে পিস্তল

দেখিয়ে আতাউল্লাকে নিয়ে যায়। প্রধান যখন বাইরে আসে তখন তার সামনে রূপচাঁদ। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে সব রহস্যের ওপর থেকে যবনিকা ওঠে। নাঙ্গা সাধু এবং নেপাল এসেছে সাধুর মেয়ে গন্ধকালীকে 'উড়িয়ে দিতে'। গন্ধকালী হুলোকে কোনদিন বাপ বলে স্বীকার করে নি, যতবার ডাকাতির মাল এনে জমা করেছে ততবার পুলিশের হাতে জমা দিয়েছে, আর আজ বাপের চেয়ে অন্তত দশ বছর বেশি বয়সের একজনকে বিয়ে করতে চলেছে। সুতরাং তার প্রতি কোনো 'ছেন্তিমেন' নেই হুলোর। হুলোকে চিনতে পেরে এগিয়ে আসে ভানু। গন্ধকালীকে সে নিয়ে যেতে চায়, বিনিময়ে নতুন তৈরি হোটেলে সাধুকে কোয়ার্টার দেবে সে, হনুমানজীর মন্দিরের ইনচার্জ করে দেবে। জামদানি আর মল পরে ঘরে শুয়ে আছে গন্ধকালী। নেপাল বাইরে গেলে সাধু আর ভানু মিলে কম্বলে জড়িয়ে পাঁজাকোলা করে গন্ধকালীকে তুলে এনে উঠানে ফেলে কিন্তু তখনই দেখা যায় ভাঙা দেওয়ালের আড়াল থেকে কাটারি হতে বেরিয়ে আসে গন্ধকালী। তাহলে জামদানি আর মল পরা — সে কে ? সে আতাউল্লা খান আতা। সাধুর চেলা নেপাল আসলে পুলিশ অফিসার, আতাউল্লা সাধুকে ধরতে নেপালকে সাহায্য করেছে। ভানু আর সাধু জেলে যায়, আতাউল্লা জন্মস্থান পেলেও জন্মভিটে খুঁজে পায় না। কিছু না দিয়ে জন্মস্থানের মুখ দেখা যায় না। তাই সে জামদানি, রূপার মল দিয়ে যায় গন্ধকালীকে। অঞ্চলপ্রধান বাড়ির পজেশান তুলে দেয় রূপচাঁদ আর গন্ধকালীর হাতে। কিন্তু তাদের তো বিয়ে হয়নি। এদিকে কৈলাসের মালিক এসে উপস্থিত রূপচাঁদকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। রূপচাঁদ বাড়িটা গন্ধকালীকে দিয়ে ফিরে যায় কৈলাসে। বলে যায় ঃ

> ''আমি যদি আবার কোনদিন কৈলেস থেকে পালাতে পারি ... যদি কেন, পারবই ... এক ফাঁকে এসে বিয়ে করে যাব। তবে যদি খুব দেরি হচ্ছে দেখিস ... অঞ্চল প্রধানের পারমিশন নিয়ে আর কাউকে বিয়ে করে নিস।''[৫২]

গন্ধকালী পায় আশ্রয়, রূপচাঁদ ফিরে যায় কৈলাসের আশ্রয়ে।

আশ্রয়ের সমস্যাই একটু ভিন্নভাবে এসেছে 'মৃত্যুর চোখে জল' একাঙ্কটিতে। এটি মনোজ মিত্রের প্রথম নাট্যরচনা। থিয়েটার সেন্টার আয়োজিত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য যখন পছন্দসই নাটক পাওয়া যাচ্ছে না তখন তরুণ মনোজ এক রাত্রি জেগে এই নাটকটি রচনা করেন এবং প্রতিযোগিতায় এই নাটকের অভিনয় প্রথম স্থান লাভ করে। যে কোনো লেখকের প্রথম রচনাতে খুব স্বাভাবিকভাবেই ছাপ ফেলে তার পরিচিত পরিবেশ এবং চেনা-জানা মানুষেরা। মনোজের এই নাটকেও যে তাই ঘটেছে সেকথা তিনি নিজেই জানিয়েছেন ঃ

> ''ছাত্রাবস্থায় এক রাত্রি জেগে একটা ছোট নাটক লিখে ফেলেছিলুম – 'মৃত্যুর চোখে জল' - - খানিকটা আমাদের সদ্যগঠিত (তৎকালে) দল সুন্দরম্ – এর প্রয়োজনে, খানিকটা আমার পরিবারের অতি চেনা কিছু ব্যক্তির জীবন মঞ্চের ওপর তুলে দেখাব বলে।''[৫৩]

সেই প্রথম নাট্য-প্রয়াসে পারিবারিক জীবনে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অবস্থান এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়ের উপস্থাপনার তাৎপর্য এইখানে যে, পরবর্তীকালে তাঁর একাধিক নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে দেখা গিয়েছে সংসারে বাতিল অথচ সংসারলগ্ন থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষাযুক্ত এরকম বৃদ্ধেরা। মনোজ মিত্র দরদী মন নিয়ে অনুভব করেছেন এইসব মানুষের জীবন-পিপাসা এবং মনের সেই দরদই চরিত্রগুলিকে হারতে দেয়নি শেষ পর্যন্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সেই প্রথম রচিত নাটকে মনোজ অভিনয় করেছিলেন বৃদ্ধ বঙ্কিমের চরিত্রে। তারপর থেকে গজমাধব (পরবাস), বাঞ্ছারাম (সাজানো বাগান), কর্তা (দম্পতি) কঙ্ক (মেষ ও রাক্ষস), ধনগোপাল (শোভাযাত্রা), ওয়ালী খাঁ (গল্প হেকিম সাহেব), দ্বৈপায়ন (ছায়ার প্রাসাদ) প্রভৃতি অসংখ্য বৃদ্ধের চরিত্রে তিনি মঞ্চের ওপর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

'মৃত্যুর চোখে জল' নাটকের একটিই দৃশ্যপট — সিঁড়ির মুখের ঝুপসি অন্ধকার ঘর, যেখানে পড়ে থাকে সত্তর বছরের রুগ্ন বৃদ্ধ বঙ্কিম। এই ঘরের ওপর দিয়েই বাড়িতে ঢুকতে বা বেরোতে হয়। বঙ্কিম জীবনপিয়াসী। শিশুর মতোই তার আচরণ, তবে শিশু কথা বলতে পারে না, আর তিনি প্রবল ভাবে পারেন। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে রোগে ভুগে ভুগে এখন ওষুধই তার একমাত্র অবলম্বন। সময় মিলিয়ে ওষুধ খাওয়া যেন তার একটা বাতিকে দাঁড়িয়ে গেছে। ওষুধ না খেলেই তিনি মরে যাবেন, এই তার ধারণা। স্ত্রী নীহার বলেন ঃ ''সময়ে অসময়ে অত ভক্তি করে মানুষ যে দেবদেবীর প্রসাদও খায় না।''[৫৪] বঙ্কিম বাতিকগ্রস্ত, কে কি ভাবছে তাতে তার হুঁশ নেই। কিন্তু তার স্ত্রী নীহার স্বামীর এই তীব্র বাঁচার ইচ্ছে নিয়ে যেন কুণ্ঠিত। বিশেষত যেদিন বাড়িতে বড় ছেলের সন্তানের জীবন-মরণ সমস্যা, সেদিন বঙ্কিমের বাঁচার তাগিদ যেন বড় নির্লজ্জ! পাঁচদিন ধরে রবির ছেলের জ্বর ছাড়ছে না, আজ একেবারে বাড়াবাড়ি রকমের। বাড়িতে ডাক্তার এসেছে। সকলের ছোটাছুটি। ডাক্তার নিজে দাঁড়িয়ে থেকে শিশুকে ওষুধ দিচ্ছেন। কিন্তু এই উদ্বেগ থেকে, ব্যস্ততা থেকে বঙ্কিম যেন বহুদূরের মানুষ। নিজের রোগ আর ওষুধের বাইরে তার কোনো জগৎ নেই। বাড়ির সকলে তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকুক, তার অসুস্থতা যথেষ্ট গুরুত্ব পাক, ডাক্তার তাকে নিয়মিত পরীক্ষা করুক — এই কেবল তার আত্যন্তিক ইচ্ছে। তার ওষুধ খাবার ব্যবস্থাপত্র পড়ে দেবার একটা লোক নেই, কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে দেবার কেউ নেই, তার ক্ষুধাবোধ সকলের কাছে অবহেলিত। কিন্তু অভিমানে চুপ করে সে থাকে না। সকলকে জোর করে নিজের দিকে মনোযোগী করতে চায়। খুব স্বাভাবিক ভাবেই বাড়িতে যখন একটি শিশুর জীবন-মরণ-সমস্যা তখন বৃদ্ধের এই আচরণ বিরক্তিকর বলেই মনে হয়। কিন্তু বৃদ্ধকে কে তা বোঝাবে। তিনি নিজের জগতে মগ্ন। শিশুর হরলিকস্, আঙুর তাকে লুব্ধ করে, তার জন্যেই এসব আনা হয়েছে — এমনও ভাবেন তিনি! চাকর পদোকেও তিনি ডেকে পান না। বাড়িতে এখন অকর্মণ্য বৃদ্ধের চেয়ে কর্মঠ চাকর অনেক বেশি প্রয়োজনীয়। একেবারে চরম অসহ্য মনে হয় বঙ্কিমকে বৌমা কণিকার সঙ্গে কথোপকথনে। ডাক্তারবাবুর হাত ধোবার জল নিয়ে ওপরে যাচ্ছে কণিকা, তাকে ধরে পড়েছেন বঙ্কিম ওষুধের ব্যবস্থাপত্র আর ওষুধ খাবার সময় নিয়ে। তার ওষুধ খাবার গ্লাস

খোকার ঘর থেকে ভেঙে গেছে শুনে আঁতকে উঠেছেন ঃ

> "কী ? (কাঁপতে কাঁপতে এসে তক্তাপোষে বসে) ভেঙে গেছে ? না। তোমরা আমার একটা জিনিস একটু নজর দিয়ে রাখতে পারো না! ওষুধের মাপে দাগ কাটা ছিল ঐ গেলাসের গায়ে। আমি এখন কি করি বলো দেখি ...!"[৫৫]

খোকার প্রয়োজনে একে একে বঙ্কিমের ঘর থেকে নিয়ে যাওয়া হয় আলো, খলনুড়ি, পাখা, কুঁজো। বঙ্কিমের মনে হয়, বাঁচার সব উপকরণগুলো তার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তীক্ষ্ণ, তীব্র চিৎকারে তিনি বাধা দিতে চান কিন্তু ব্যর্থ হন। সব চেষ্টা সত্ত্বেও শিশুটি পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে যায় আর কোন চেষ্টা না করা হলেও তীব্রভাবে বেঁচে থাকে বঙ্কিম। মৃত্যুর বিপরীতে জীবন পিপাসার অদ্ভুত রসায়ন সৃষ্টি করেন মনোজ মিত্র নাটকের শেষে। শিশুটির চরম মুহূর্ত, এদিকে সাতটা বেজে গেছে অথচ ওষুধ খাওয়া হচ্ছে না বলে অন্ধকার ঘরে বঙ্কিম ব্যাকুল। লণ্ঠন নিয়ে প্রবেশ করে 'পাথরের মতো শান্ত, কঠিন' নীহার ঃ

"নীহার ।। কই তোমার ওষুধ ? (নীহার মিটসেফের দিকে এগিয়ে যায়)

বঙ্কিম ।। ওই মিটসেফের ওপর। দ্যাখো ... সব ছড়ানো কিন্তু।

নীহার ।। থাকুক। (নীহার অন্যমনস্ক হাতে একটা শিশি তুলে নেয়)

বঙ্কিম ।। ওকী, ওটা কী ওষুধ!

নীহার ।। বুকের ওষুধ!

বঙ্কিম ।। না ...

নীহার ।। হ্যাঁ ... খাও ...

বঙ্কিম ।। (সভয়ে) না ... না ... ভাল করে দ্যাখো ... (নীহার বঙ্কিমের দিকে এগোয়)

নীহার ।। দেখতে হবে না। খাও ...

বঙ্কিম ।। না, খাব না ...

নীহার ।। (শান্ত কঠিন গলায়) তোমায় খেতে হবে।

বঙ্কিম ।। (ভয়ে) রবির মা, রবির মা ...

নীহার ।। নাও ধরো ... হ্যাঁ করো ...

বঙ্কিম ।। না ... না ...

(নীহার জোর করে বঙ্কিমের মুখে ওষুধ ঢেলে দেয়। বঙ্কিম অস্ফুট আর্তনাদ করে তক্তাপোষে ঢলে পড়ে। নীহার পাথরের মত স্থির। মঞ্চ নীরব। বাড়ির মধ্যে তীক্ষ্ম কান্নার রোল উঠল।)"[৫৬]

নীহার এই প্রতিদিনের বেঁচে থাকার গ্লানি থেকে বোধহয় বঙ্কিমকে একেবারে মুক্তি দিতে চেয়েছিল, মুক্ত হতে চেয়েছিল নিজেও। কিন্তু বঙ্কিম তবু বেঁচে থাকে, মারা যায় 'রবির ছেলেটা'। বাড়ির তীক্ষ্ম কান্নার রোলের মধ্যে মিশে গিয়ে নীহার নিজেকে এবং বঙ্কিমকে করে তুলতে চায় সকলের একজন। নিজেদের বেঁচে থাকা জানান দেওয়ার একমাত্র উপায় এখন তীব্র, তীক্ষ্ম কান্না ঃ

''বঙ্কিম ।। রবির মা, ওষুধ খেয়েও আমার বুকের চাপ কমেনি। আমার কেমন যেন কষ্ট হচ্ছে!

নীহার ।। (বঙ্কিমকে ঝাঁকুনি দিতে দিতে) তবু কাঁদো ...

বঙ্কিম ।। আমি পারব না ...

নীহার ।। পারবে। কেঁদে তুমি জানিয়ে দাও ওদের, আমরা দু'জনে এ ঘরে এখনও বেঁচে আছি!''[৫৭]

জীবনের এই প্রথম নাটকে মনোজ মিত্র দেখালেন, বিপন্ন মানুষ স্নেহ-মায়া-মমতার আশ্রয় চায়, মানসিক শুশ্রূষা চায়, সংসারে কিছুটা গুরুত্ব চায়। এইসব চাওয়ার কোনোটিই পূর্ণ হয় না। এই অপূর্ণতার জন্য নাট্যকার কাউকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান না। কোনো তথাকথিত খল চরিত্র এখানে নেই। নাট্যকার শুধু পরিচিত এবং স্বাভাবিক পরিবেশে ফেলে চরিত্রের মুখে স্বাভাবিক সংলাপ তুলে দেন। এই নাটকে বঙ্কিমের দুই ছেলে, পুত্রবধূ, ডাঃ সেন, পদো — প্রত্যেকের আচরণ পরিস্থিতি অনুযায়ী স্বাভাবিক, সেই স্বাভাবিকতার মধ্যে বঙ্কিমের প্রবল জীবনতৃষ্ণা যেন বিসদৃশ ঠেকে, অথচ অদ্ভুত এক সহানুভূতি তৈরি হয় তার প্রতি। অত্যন্ত সহজ সংলাপের সাহায্যে মনোজ মিত্র তুলে ধরেন বঙ্কিমের জীবনতৃষ্ণাকে ঃ

''নীহার ।। এখনো বাঁচার ইচ্ছে আছে তোমার ?

বঙ্কিম ।। (মুখ বিকৃতি করে) হ্যাঁ, বাঁচার ইচ্ছে! সে ইচ্ছে থাকলে কবে এতদিন দু'ফোঁটা মালিশের ওষুধ জিবে ঠেকিয়ে আমি তোমাদের হাত থেকে বাঁচতাম! দিনরাত ঐ বাঁচা নিয়ে আমায় খোঁটা দেওয়া! ... নাও, দেখ, কী ওষুধ এটা ...''[৫৮]

বঙ্কিমের মতো মানুষেরা সংসারে গুরুত্বহীন কিন্তু নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ ভেবে তারা তৃপ্তি পেতে চান। এই আকাঙ্ক্ষার সার্থক রূপ দেন মনোজ মিত্র বঙ্কিমের সংলাপে ঃ

''(আপন মনে) এখন কিছু খেয়াল করবি না! না করিস, করিস নে। এবার আবার হার্টের অ্যাটাক হলে ... এই শরীরে ... (অপেক্ষাকৃত জোরে) একেবারে মরণাপন্ন না হলে তো তোদের টনক নড়বে না! শেষে ছোট পদো ... ছোট শম্ভু ... আন ওষুধ ... আন হরলিক্স ...''[৫৯]

শিশুর ঘর বা শিশুটিকে না দেখিয়েও নাট্যকার ফুটিয়ে তোলেন মুমূর্ষু শিশুটিকে নিয়ে উদ্বেগ

ও ব্যস্ততা। এই উদ্বেগের কাছে আজ গুরুত্বহীন বৃদ্ধ বঙ্কিমের পনেরো বছরের অসুস্থতা। মনোজ মিত্র অত্যন্ত স্বাভাবিক নাট্যপরিস্থিতি সৃষ্টি করেন এই বিষয়গুলি নিয়ে। আলোর জন্য বঙ্কিমের আর্তনাদ, কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে বুকে জলের হাত দেবার মুহূর্তে পদোর কুঁজো নিয়ে চলে যাওয়া প্রভৃতি ছোট ছোট ঘটনা পরিস্থিতি অনুযায়ী স্বাভাবিক কিন্তু হৃদয়স্পর্শী। তবে বঙ্কিমের লুব্ধতা প্রকাশে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার ঃ

> ''বঙ্কিম ।। ওরে পদো, আমি কী খাব রে ? হরলিক্সটাও ভাঙা হবে না রে!
>
> পদো ।। আপনি দেখছি ছেলেপিলেরও অধম হলেন! খোকার তো অত খাই-খাই নেই। দু-ঠোঁটের ফাঁকে যা দিচ্ছে ... তাই গড়িয়ে ফেলে দিচ্ছে। ডাবের জল ... বার্লির জল ... লেবুর রস ... মুসুম্বির রস ...
>
> বঙ্কিম ।। ওরে তোকে কি আমি ফর্দ শোনাতে বলেছি।''[৬০]

সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় লক্ষ্যভেদের আশ্চর্য দৃষ্টান্ত এই সংলাপ। এই পরিবারে সবচেয়ে বিব্রত অবস্থা বঙ্কিমের স্ত্রী নীহারের। অবুঝ স্বামীকে নিয়ে সে মরমে মরে আছে। তার অসহায়তা ক্ষোভ হয়ে ঝরে পড়েছে। সন্তানের সামনে তীব্র রাগ এবং বিরক্তি প্রকাশ করে তিনি যেন স্বামীর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে চান ঃ ''পারিসনে, ধরে বেঁধে এক শিশি একদিন গলার মধ্যে উপুড় করে দিতে পারিস নে ?''[৬১] কিন্তু নির্জনে আবার এই লোকটির কাঙালপনাই তাকে ব্যথিত করে। খোকার জন্য আনা আঙুর থেকেই সামান্য একটু তুলে দিতে যান বঙ্কিমের ব্যগ্র হাতে। কিন্তু দেওয়া আর হয়ে ওঠে না, পদো এসে জানায় — আঙুর ফেরত দিয়ে মুসুম্বি আনতে হবে — সুতরাং একটা ফল কম পড়লে চলবে না। একেবারে শেষে নীহারের অসহায়তা চরমে উঠেছে। বাড়িতে একটা শিশু মারা গেছে — সেই শোকে সামিল করতে হবে, করতেই হবে, অবুঝ স্বামীকে — এ যেন বেঁচে থাকার দায় — টিকে থাকার শর্ত।

'মৃত্যুর চোখে জল'-এর বঙ্কিমই তো 'কেনারাম বেচারাম'-এর বেচারাম। বঙ্কিমের ঠাঁই হয়েছে সিঁড়ির নিচে অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে, আর সেরকম অনাদর অসহ্য হতেই তো বেচারাম বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে। নীহার যে সদ্যমৃত নাতির শোকে বঙ্কিমকে কাঁদতে বলেছে, সেটাই তো 'হেড অব দি ফ্যমিলি'র প্রোনান্‌শিয়েশন। Psychologically অস্তিত্ব রক্ষার প্রবল প্রয়াস। এই কান্নার অর্থ হ'ল, আমি পরিবারের জন্য Feel করছি, আমি এই পরিবারের সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার, আমি এই পরিবারলগ্ন। কিন্তু এই প্রোনান্‌শিয়েশন যখন গুরুত্ব পায় না, Psychologically attachment যখন শিথিল হয়ে পড়ে তখন Physical উপস্থিতি অসহ্য হয়ে ওঠে। তাই বঙ্কিমের উত্তরপুরুষ বেচারামকে ঘর ছেড়ে পথে নামতে হয়।

আশ্রয়ের সমস্যা অনেক Serious ধারায় এসেছে 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' নাটকে।

এই নাটক থেকে মনোজ মিত্রের নাট্যরচনা-ধারায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন বিভিন্ন সমালোচক। কুমার রায়ের মতে ঃ ''আগের সব নাটক থেকে এ আলাদা।''[৬২] সৌমিত্র বসুও মনে করেছেন ঃ '''অলকা নন্দার পুত্রকন্যা'য় তিনি মোড় ফিরছেন।''[৬৩] মনোজ মিত্রের নাটকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হাসি-মজা-কৌতুক এখানে অনেকটাই কমে গেছে। এক অসুস্থ সময়ের কথা বললেন মনোজ মিত্র এই নাটকে। এই নাটক রচনার বাহ্য প্রেরণা সম্ভবত দিল্লিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত নাট্যোৎসবে সেখানকার নাট্যানুরাগী মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতাতেই উপ্ত হয়েছিল। ১৯৮২ সালের জুলাই-আগস্ট সংখ্যার 'নাট্যচিন্তা'য় মনোজ লিখেছেন যে, দিল্লির নাট্যানুরাগী মানুষের পশ্চিমবঙ্গের নাট্যকারদের সম্পর্কে অভিযোগ, তাঁরা পাঁচ রকম মানুষ নিয়ে নাটক লিখতে পারেন না। সেখানেই একজন বলেছিলেন ঃ ''জানেন আমার জীবনের কি সমস্যা ? আমার ছেলে র‍্যাগিং-এর পাল্লায় পড়েছে। আপনাদের নাটকে এ জিনিস কি ধরা হয়েছে ?''[৬৪] এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই তাঁকে ভাবিয়েছিল। বেশ কয়েকবছর পর 'অলকানন্দার পুত্র কন্যা'য় অন্যতম কেন্দ্রীয় সমস্যা হিসেবে তিনি র‍্যাগিংকে গ্রহণ করলেন। 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' শহর জীবনের নাটক, আধুনিক সময়ের নাটক কিন্তু সবার ওপরে এ এক সর্বংসহা মায়ের নাটক। স্বামী রজনীনাথ এবং পুত্র শুভ ও কন্যা মানসীকে নিয়ে অলকানন্দার সংসার। এক সময় কলেজ স্ট্রীটে বিরাট বইয়ের দোকান এবং প্রকাশনার ব্যবসা ছিল রজনীনাথের। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে রজনীনাথ-অলকানন্দা ছিলেন নিঃসন্তান। কিন্তু মাতৃত্ব শুধু গর্ভধারণে হয় না, প্রকৃত মাতৃত্ব সন্তানের লালনে। অলকানন্দা সেই মা। অনাথ আশ্রম থেকে মানসীকে আর উঠতি দরিদ্র লেখক যদুপতি সিকদারের স্ত্রী মারা যাবার পর তাঁর সাতদিনের শিশুপুত্র শুভকে নিয়ে এসেছে অলকানন্দা-রজনীনাথ। অলকানন্দার ভাই বাদল এই 'পুষ্যি' নেওয়াকে বড়লোকের বিলাসী খেয়াল বলে মনে করলেও অলকানন্দা কিন্তু ভিন্ন পথে ভাবে ঃ ''কেন বারবার পুষ্যি-পুষ্যি করো! ভাবতে পারো না ওরা আমার ... আমার পেটের সন্তান ... এটুকু মেনে নিতে এত জটিলতা কেন হয় তোমাদের!''[৬৫] ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে এলেও এবং তাদের পরিচয় গোপন না করলেও শুভ আর মানসী নিজের ভাইবোনেরই মতো হয়ে গেছে। এক বিজয়া দশমীর দিন নৌকা করে নদীতে বেড়ানোর সময় মানসী জলে পড়ে গেলে রজনীনাথও পিছু পিছু জলে ঝাঁপ দেন। সাঁতার-জানা মানসী সহজেই ওপরে উঠে আসে কিন্তু রজনীনাথকে পাওয়া যায় আধঘন্টা পরে। নৌকার গলুইয়ে মাথায় যে আঘাত লাগে তাতেই সারাজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে পড়েন। তিনবার বিদেশে পাঠিয়ে ব্রেন অপারেশন এবং চিকিৎসার আনুষঙ্গিক খরচ জোগাতে ব্যবসা বিক্রি করে দিতে হয়। পুরুষ পঙ্গু হয়ে স্থান নেয় ঘরের কোণে আর সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব নেয় নারী — নেয় অলকানন্দা। তার সঙ্গীতশিক্ষিকার চাকরিই এখন সংসারের একমাত্র অবলম্বন। মানসীর বিয়ে দিতে সঞ্চিত শেষ অর্থও সে প্রায় সম্পূর্ণই ব্যয় করেছে। হস্টেলে থেকে শুভর ইঞ্জিনিয়ারিং

পড়ার খরচও তাকে জোগাতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য অলকানন্দার — তার ছেলে-মেয়ে কারো জীবনই সুখের হয় নি। মানসীকে শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচারিত হতে হয়েছে আর শুভ তার কলেজে র‍্যাগিং-এর কবলে পড়েছে। এই বিপর্যস্ত সময়েও অলকানন্দা বাড়িতে আশ্রয় দেয় ফুটপাথের ছেলে লালাকে, মমতায় কাছে টেনে নেয় পাশের ফ্ল্যাটের উচ্ছৃঙ্খল দেবাহুতির অনাদৃত সন্তানকে। অলকানন্দা আগলাতে চেয়েছে মানসীকে, আগলাতে চেয়েছে শুভকে কিন্তু ডানার বাইরে তার শক্তি যে সীমিত। ভাই বাদল এবং তার অধ্যাপক পুত্র পার্থ যথাসাধ্য সাহায্য করেছে অলকানন্দাকে। মানসী শেষ পর্যন্ত রুখে দাঁড়িয়েছে নিজের অধিকার আদায়ে। লড়াই করে নিজের দাবী প্রতিষ্ঠা করবে বলে সে ফিরে আসেনি অলকানন্দার কাছে। কিন্তু শুভ র‍্যাগিং-এর মানসিক পীড়ন সহ্য করতে পারে নি। বন্ধুবেশী শত্রু জয়দীপের টাকার দাবি মেটাতে সে প্রথমে অলকানন্দার কাছে এবং সেখানে ব্যর্থ হয়ে তার আগের বাবা যদুপতি সিকদার (যিনি এখন যুগান্তর শর্মা নামে বিখ্যাত লেখক)-এর কাছে গেছে। কিন্তু যদুপতিও তাকে কোনো টাকা দেন নি। মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে শুভ পাগল হয়ে গেছে এবং শেষপর্যন্ত তাকে পাগলাগারদে পাঠাতে হয়েছে। কেয়াপাতার যে দুটো নৌকা গড়েছিল অলকানন্দা, নোঙর ছিঁড়ে সে দুটো ছুটে গেছে ভরা গাঙের মাঝখানে, ডুববে কি ভাসবে সে জানে না। তাই সে আরেকটা নৌকা গড়তে চেয়েছে। দেবাহুতির ফেলে যাওয়া শিশুপুত্রকে সে কোলে তুলে নিয়েছে। রজনীনাথ বারবার বাধা দিতেন অলকানন্দাকে ঐ শিশুটির কাছে যেতে, কারণ তিনি জানতেন, অলকা শেষে পর্যন্ত এই শিশুটিকেও নিজের ডানার নিচে আশ্রয় দেবে। যখন সত্যি সত্যি তাই ঘটেছে তখন রজনীনাথ আর নিষেধ করতে পারেন নি। উঠে দাঁড়িয়ে মুখে হাসি নিয়ে তিনি দোলনার দিকে তাকিয়ে থেকেছেন। বাদল বিরক্ত হয়ে বাইরে চলে যেতে চাইলেও পুত্র পার্থ তাকে হাত ধরে আটকেছে, দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে অলকানন্দার কাজের মহত্ত্বের প্রতি ঃ ‘‘বাবা ... তুমি তো বলো বাবা, মানুষের বড় কাজ করার ক্ষমতা চলে যাচ্ছে। আজ আমার পিসি কোথায় দাঁড়িয়ে কী কাজটা করছে, একবার দেখবে না!’’[৬৬] অলকানন্দা ‘জোরে, আরও জোরে’ দোলনাটা দোলাতে থাকে। নতুন শিশুর সঙ্গে অলকানন্দার মাতৃসত্তার নতুনতর বিকাশের সম্ভাবনায় নাটক শেষ হয়। ‘অলকানন্দার পুত্রকন্যা’ নাটকের বিষয়বস্তুকে চমৎকার চিহ্নিত করেছেন সৌমিত্র বসু ঃ

> ‘‘সে নাটকে আছে এই ছন্নছাড়া সময়ের কথা, আছে এক নষ্ট মা, যে তার বাচ্চাকে ফেলে পালিয়ে যায়, আছে এক নষ্ট দাম্পত্য যেখানে স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা, আছে এক নষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে সরলতাকে কুঁকড়ে যেতে হয় ক্রমশ।’’[৬৭]

এই নষ্ট সময়ের ক্ষতে শুশ্রূষার প্রলেপ দিতে পারে কেবল মায়ের কোমল হাতের স্পর্শ। অলকানন্দা সেই মা। এই মাতৃত্বের সঙ্গে গর্ভধারণের কোনো সম্পর্ক নেই। এ এক ধারণা। সেই ধারণা লালনের, সেই ধারণা সেবার। আধুনিকা দেবাহুতি গর্ভে সন্তান ধারণ করেছে কিন্তু ‘মা’ হতে পারে নি। ভেতর থেকে সে নিজের সন্তানের জন্য কোনো টান অনুভব করে না। অথচ অলকানন্দা বলে ঃ ‘‘নিজের পরের ওসব কোনো কথা নারে দেবাহুতি। একবার

চোখ বন্ধ করে ভাব ... দেখবি আপন-পর সব একাকার হয়ে যাচ্ছে।''[৬৮] শুভ-মানসীকে আপন ভাবে বলেই অলকানন্দা যেমন মমতায় শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচারিত মানসীকে নিজের কাছে নিয়ে আসতে ধানবাদ যাবার জন্য ব্যগ্র হয়, সেরকম ক্ষোভে দুঃখে দুর্বিনীত শুভর গালে চড় বসাতেও দ্বিধা করে না। ব্যক্তিগত জীবনে অলকানন্দার তীব্র সংগ্রাম। স্বামী পঙ্গু হয়ে যাবার পর সংসারের সম্পূর্ণ দায় তার ওপর, সখ-আহ্লাদ বলতে তার কিছুই নেই। একবার চকিতে সেই আক্ষেপের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ঃ ''নিজের আর কি ... ঝুপ করে গঙ্গায় ডুব দিয়ে ভুবন সংসারের বাইরে চলে গেছ! যতই সিঁদুর পরি, চুল বাঁধি - চোখেও পড়বে না ...''[৬৯] নিজের জীবনের সব অপূর্ণতা, সব দুঃখ-বেদনাকে সে ভুলে থেকেছে সন্তানের প্রতি গভীর মমতায়। সেই মমতা বিস্তৃত হয়েছে ফুটপাথের ছেলে লালার প্রতি, দেবাহুতির অনাদৃত সন্তানের প্রতি। মনোজ মিত্র দেখাতে চান, যে করে সে এমনি করে।পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতিকূলতা তার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। অলকানন্দার ক্রিকেট-পাগল ভাই বাদল দেবাহুতির সন্তানকে নিজের করে নেবার মধ্যে অলকানন্দার খামখেয়ালিপনাকেই দেখে কিন্তু অলকানন্দা প্রত্যয়ে দৃঢ় ঃ

> ''হ্যাঁ বয়েসটা আমার পশ্চিমে হেলেছে। হাতে পায়ে আর সে জোর নেই। শুভকে যেমন করে দুহাতে তুলে চাঁদ দেখাতাম, আর তা পারব না। যেমন করে লাঠি হাতে মানসীর পেছনে তেড়ে গিয়ে শাসন করেছি, তাও পারব না! (দোলনার শিশুকে) হয়ত অকূলে ভাসিয়ে যাব রে তোকে! ... সে ভয় তো আছেই! (বাদল ও পার্থকে) তবে তোমরা সবাই যদি একটু সাহায্য করো ...''[৭০]

বাধা-বিপত্তি, প্রতিকূলতার ভয়ে মানুষ বড় কোন কাজে হাত দেবে না, একথা বিশ্বাস করেন না মনোজ মিত্র। তাই জীবনের পড়ন্ত বেলাতেও নতুন দায়িত্ব নিয়েছে অলকানন্দা, দু'বাহু বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরেছে সেই অসহায় শিশুটিকে, মাতৃত্বের মমতা যার পরম প্রয়োজন। মনোজ মিত্রের নাটকে অসহায়ের জন্য, বিপন্নের জন্য এভাবেই অপেক্ষা করে থাকে এক স্নিগ্ধ আশ্বাসের জগৎ। অলকানন্দা সেই মা যে অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে হিসেবি আর সাবধানী হয় না, আর্তের ক্রন্দন শুনলেই তার ওপর মেলে দেয় নিজের ডানা। তাকে তাই মাদার কারেজ-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন সমালোচক ঃ "Alkananda is also a peacetime Mother courage who refuses to learn from experience."[৭১] অলকানন্দার পঙ্গু স্বামী রজনীনাথকে বর্তমান 'প্রজন্মের আসল সঙ্কট'-এর 'পুঞ্জীভূত প্রতীক' বলে মনে করেছেন অধ্যাপক বিষ্ণু বসু। পঙ্গুতা, স্থবিরতা এই প্রজন্মের প্রধান অসুখ। Abnormality যেন এই সময়ের বৈশিষ্ট্য। দেবাহুতি, শুভ, জয়দীপ সকলেই abnormal. সময়ের এই পঙ্গুতাকে, স্থবিরতাকে যেন সচল করে অলকানন্দা। যখন ঃ

> ''খসে পড়েছে যাবতীয় মূল্যবোধ, নিজের শিশুকে অক্লেশে ছেড়ে চলে যেতে পারে এখনকার অনেক দেবাহুতি, ... স্বার্থপরতায় ও লুব্ধতায় আক্রান্ত যুব শক্তি, ... সেখানে 'মাদার ইমেজ' নিয়ে ক্রমে অভিব্যক্ত হতে থাকে অলকানন্দা। ... শুধু শিকড় নামিয়ে চলে নিরবচ্ছিন্ন মাতৃত্বের।''[৭২]

অস্থির এই সময়ে তরুণ প্রজন্ম যেন ঝড়ের পাখি। তাদের অবস্থা যথার্থ চিত্রিত হয়েছে যদুপতির সংলাপে :

> ''কালবৈশাখীর ঝড়ে আকাশের পাখিদের অবস্থাটা কখনও দেখেছেন বৌদি ? ঝড়ের দোলায় দাপাদাপি করে সমস্ত গাছ ... কোন ডালে পাখিরা বসতে পারে না। ... ডাল থেকে ডালে ক্রমাগত ছুটোছুটি করে পাখিরা। ... আজকের নবীন তরুণ আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে একজন অর্থবান পিতার সন্ধান করে! কেনাবেচা বেচাকেনা ... এছাড়া আজকের ছেলেরা কিছু বোঝে না বৌদি! হয়তো বিশ্বাসও করে না।''[৭৩]

'একটা প্রচন্ড ঝড়ো দুনিয়ার এক ঝলক হাওয়া' ঢুকে পড়েছে অলকানন্দার ঘরে। সেই ঝড়ো হাওয়া থেকে শুভকে সে বাঁচাতে পারে নি। শুভর স্থান হয়েছে মেন্টাল অ্যাসাইলামে। মানসী নিজের লড়াই নিজেই লড়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। জীবনের এই শূন্য সময়ে অলকানন্দা কোলে তুলে নেয় দেবাহুতির পরিত্যক্ত শিশুকে। এই নতুন দায়িত্ব গ্রহণকে জীবনের অস্তিত্বের দিকে যাত্রা বলে মনে করেছেন সমালোচক :

> ''ফুরিয়ে যাওয়াকে পার হয়ে জীবনের 'হ্যাঁ'-এর দিকে, অস্তিত্বের প্রবল উপলব্ধির দিকে অলকানন্দার জয়যাত্রা। সেখানে অলকানন্দা শুধু একজন ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারী নন, মানসিকতার সৌন্দর্যে আর আত্মবিশ্বাসে ভরপুর একজন মানুষ।''[৭৪]

দীর্ঘদিন পর, বলা চলে সেই 'নেকড়ে' (১৯৬৮) 'চাক ভাঙা মধু' (১৯৬৯)-র প্রায় কুড়ি বছর পর মনোজ মিত্র Serious কথা Serious ভঙ্গিতে বললেন 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'য়। এই ভঙ্গি বদলের দিকটিকে লক্ষ্য করেই সমালোচকেরা মনোজের মোড় ফেরার কথা বলেছেন, 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'কে অন্য ধরণের নাটক বলেছেন। তা নাহলে বিষয়ের দিক থেকে মনোজ মিত্র কিন্তু এখানেও আছেন নিজের সেই পুরনো বিশ্বাসের জগতে। যুগযন্ত্রণাকে প্রতিফলিত করেন তিনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত নৈরাশ্যের মধ্যে নয়, পাঠককে পৌঁছে দেন এক আস্তিক্যবোধের জগতে। অলকানন্দার মধ্যে সেই আস্তিক্যবোধ, সেই শুভ ও মঙ্গলচেতনারই জয় ঘোষিত হয়েছে।

আধুনিক সমাজের যেসব সমস্যা পারিবারিক সংকট সৃষ্টি করে পরিবারকে ভেঙে ফেলতে চেষ্টা করে তাকেই মানবিক সম্পর্কে ঐক্যের বাঁধনে বেঁধে পরিবারকে রক্ষা করার চেষ্টা 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' নাটক। ধ্বংসাত্মক (Destructive) এই সমাজে নারী অলকানন্দা গঠনাত্মক (Creative). সে অন্যের অস্তিত্ব রক্ষায় সাহায্য করেছে। অনাথ আশ্রমের মানসী, মাতৃহীন শুভ, পথের কিশোর লালা, দেবাহুতির অনাদৃত সন্তান – প্রত্যেকেই তাঁর কাছে আশ্রয় পেয়েছে। এই আশ্রয় না পেলে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারতো। যাদের অস্তিত্ব রক্ষা করছে অলকানন্দা, এই সমাজ আবার তাদের ভাঙছে। মানসী শ্বশুরবাড়িতে নিগৃহীতা, শুভ হস্টেলে র‍্যাগিং-এর শিকার। অর্থাৎ তাদের অস্তিত্ব আবার বিপন্ন হচ্ছে। তার মধ্যেও কেউ

কেউ মানসীর মতো নিজের অস্তিত্বের জন্য লড়াইয়ে তৈরি হয়ে যায়। এখানেই অলকানন্দার সার্থকতা, অলকানন্দাদের সার্থকতা। মনোজ মিত্র নাটকের শেষে বলতে চেয়েছেন, সমাজ এবং পরিবারের কাঠামো রক্ষা করতে, তাকে সুস্থ, সুন্দর করতে অলকানন্দাদের প্রয়োজন আরো কিছু সাহায্যের হাত।

'শোভাযাত্রা' (১৯৯০) - কেও আমরা পারিবারিক নাটক-ই বলতে চাই। যদিও নাটকে চিত্রিত ধনগোপালের পরিবার বাংলাদেশের ক্ষয়প্রাপ্ত জমিদারি ব্যবস্থার উত্তরপুরুষ শ্রেণিটিরই প্রতিনিধিত্ব করছে। এ নাটক নিঃসন্দেহে সময়ের ট্র্যাজেডি কিন্তু তার মধ্যে মনোজ ভরে দিয়েছেন মানুষে মানুষে সম্পর্কের নিরুচ্চার প্রকাশকে। প্রাচীন জীর্ণ জমিদার বাড়ির কর্তা ধনগোপাল থাকেন তার দুই মেয়ে অতসী ও সরসী এবং অতসীর একুশ বছরের জড়বুদ্ধি ছেলে শঙ্খকে নিয়ে। এই জড়বুদ্ধি ছেলের জন্যই অতসীকে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন খোরপোষের মামলা চলছে। ছোটো মেয়ে সরসীর বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। পূর্বপুরুষের জমিদারির কিছুই আর অবশিষ্ট নেই ধনগোপালের। আছে শুধু নিষ্ফল স্বাতন্ত্র্যবোধ আর পূর্বপুরুষের কৃতকর্মের জন্য গ্রামবাসীদের ক্রোধ এবং প্রতিহিংসা। নিজেকে ক্রমশ সবকিছু থেকে গুটিয়ে নিয়েছেন ধনগোপাল। তিনি ভোট দেন না, তাই তার সঙ্গে কোন 'দল' নেই, বর্গাদার ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে বলে তিনি বর্গাদারের কাছে যান না, উকিলের জেরা শুনতে হবে বলে তিনি অতসীর কেসের ব্যাপারে কোর্টে যাবেন না — নিজের চারদিকে অদৃশ্য এক গন্ডি কেটে দিয়েছেন তিনি নিজেই। ধনগোপালের উঠোনে আছে ঢাউস এক রথ — জগন্নাথের। জমিদারির শেষ চিহ্ন। দোল, দুর্গোৎসব সব বন্ধ হয়ে গিয়ে আছে কেবল এই রথযাত্রার উৎসব। প্রতি বছর এই রথযাত্রা উপলক্ষে মাধবকাটি গ্রামে বিশাল উৎসব হয়, মেলা বসে যায়। করব না করব না করেও ধনগোপাল প্রতি বছরই এই উৎসবটা করে থাকেন। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই এই রথ এবং শঙ্খর ওপর কার অধিকার থাকবে — তা নিয়ে নাট্যদ্বন্দ্বের বীজ উপ্ত হয়েছে। মন্দিরের পুরোহিত যামিনীর কথায় প্রথম শঙ্কা জেগেছে — তারপর ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়েছে, এবার থেকে জগন্নাথের বিগ্রহ, মন্দির এবং রথযাত্রা 'ইজারা' নিচ্ছে মাছের ব্যবসা করে হঠাৎ বড়লোক হয়ে ওঠা মন্মথ পাল। ধনগোপালের কয়েক বিঘে সম্পত্তি মন্মথের কাছে বন্ধক আছে পাঁচ বছর ধরে। মন্মথ সেই বন্ধকের দলিল ধনগোপালকে ফেরৎ দেবে, বিনিময়ে জগন্নাথের পুরো 'এস্টাবলিশমেন্ট' যাবে তার হাতে। মাছের ব্যবসাদার মন্মথ মাছের ভেড়ির মতোই জগন্নাথের 'ইজারা' নিয়েছে। জগন্নাথ এবং রথযাত্রাকে ঘিরে তার বিরাট ব্যবসার পরিকল্পনা। জগন্নাথ এখন তার 'মূলধন'। রথের চাকা মাটিতে দেবে গেছে, মন্মথ এবং তার সঙ্গীরা রথকে সচল করেছে। কিন্তু নিয়ে যাবার মুখে বাধা আসে অতসী, সরসী এবং মুকুলের কাছ থেকে। মুকুল ধনগোপালের জ্ঞাতি ভাই রমেশের ছেলে। বিগ্রহ দিয়ে রথযাত্রা উৎসবটা রায়বাড়িরই রাখার প্রস্তাব দেয় মুকুল। কিন্তু উৎসব ছেড়ে বিগ্রহ নিতে চায় না মন্মথ। সকলের বাধায় আপাতত স্থগিত থাকে রথ হস্তান্তর। এদিকে শঙ্খকে নিয়ে মামলাও ঘুরে গেছে। অতসী পাঁচশো টাকা করে খোরপোষ পাচ্ছে, দু'হাজার টাকা

দাবী করে মামলা করেছে। কিন্তু ওপক্ষ এবার ছেলে ফেরৎ চেয়েছে। তারা নাকি শঙ্খর চিকিৎসা করাবে বিদেশে নিয়ে গিয়ে, তাকে স্বাভাবিক মানুষ করে তুলবে। অর্থাৎ একদিকে জগন্নাথের রথ আর একদিকে শঙ্খকে হারাবার আশঙ্কা একসঙ্গে দেখা দেয় রায় পরিবারে। কাহিনি ক্রমে অন্য মাত্রায় বিস্তারিত হয় নদুর উপস্থিতিকে ঘিরে। নদুর মা জোছনা একসময় মুকুলদের মোহনকাননের বাড়িতে রান্না করত। কিন্তু এর গভীরে ছিল অন্য কাহিনি — ছিল জমিদারবাড়ির ব্যভিচার। মুকুলের বাবা রমেশ রায়ের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল জোছনার। সেই ক্রোধ রক্তে বহন করে নদু। জমিদার-পরিবারকে নানাভাবে অপদস্থ করে সে প্রতিশোধ নিতে চায়, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চায়। ধনগোপাল রায়ের ঝাড়ের বাঁশ কেটে নেয় সে বিনা অনুমতিতেই। কৈফিয়ৎ চাইলে কুণ্ঠিত হয় না, বরং ফুঁসে ওঠে : ''বেশি তড়পাবেন না। জমিদারবংশের তড়পানি আমার একদম সহ্য হয় না। একসময় সারা দেশে অত্যাচার করেছে, আবার নীতি শোনাচ্ছে!''[৭৫] কথা-কাটাকাটি একসময় চরমে ওঠে। মুকুল একটা কাঠের টুকরো দিয়ে নদুর কুড়ুল-ধরা হাতে আঘাত করে। আহত হাত চেপে নদু বেরিয়ে যায়, কিন্তু ঘটনাটা এখানেই শেষ হয় না। এক রাজনৈতিক দলের স্থানীয় কর্মী (আচরণ এবং সংলাপে বামপন্থী বলেই মনে হয়) উদয় নদুকে নিয়ে এসে উপস্থিত হয়। নরমে-গরমে ধনগোপালকে বুঝিয়ে দেয়, নদুর সঙ্গে বিষয়টা মিটিয়ে নিতে হবে। উদয়ের সঙ্গে কথোপকথনে প্রকাশ হয়ে পড়ে ধনগোপালের অভিমান, পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকার বয়ে নিয়ে চলার ক্লান্তি :

> ''আমি জানি একটা বাঁশ, ভাঙা দরজা কি চারটে ফলপাকুড় এসব বৃহৎ কিছু না। যা আমরা হারিয়েছি তার কাছে অতি তুচ্ছ ... নগণ্য। কিন্তু কি জানো উদয়, আমি বুঝতে পারছি —যারা এগুলো নিচ্ছে, তাদের অভাব দরকারের চেয়ে বেশি আছে রাগ, ঘেন্না! যেন লোকটাকে বাগে পেয়েছি, এবার খোঁচাও। যতো পারো খুঁচিয়ে যাও। ... তুমি আমায় বোঝাতে পারো উদয়, বাপ-ঠাকুর্দার দোষ অপরাধ পাপ একটা মানুষ কতদিন টানবে ? কতকাল টানতে পারে সে ?''[৭৬]

বাধ্য হয়ে নদুর সঙ্গে আপস করতে হয় ধনগোপালকে। ক্ষতিপূরণ কতটা চাওয়া যেতে পারে তা ঠিক করতে না পেরে নদু একটা কাজ চায়। তার প্রস্তাব, রায়বাড়ি থেকেই রথের উৎসব হোক আর তাকে করা হোক ম্যানেজার। ধনগোপাল সেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান এই শর্তে যে, নদু পুরনো কোনো কথা, রমেশ রায় ও তার মায়ের ব্যাপারে কোনো কথাও মনে রাখবে না। কিন্তু নাটকের পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, নদু কিছুই ভোলে নি — শুধু উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। নদুর ম্যানেজারিতে রথযাত্রার আয়োজন বেশ ভালোই জমে ওঠে। ধনগোপালও সব বিষয়ে নদুর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। সেই পুরনো দিনের মতোই চারধার আবার হাঁক-ডাকে জমজমাট হয়ে ওঠে। ধনগোপাল ভাঙা হারমোনিয়াম সারিয়ে নিয়ে এসে আবার সুর তুলতে চেষ্টা করেন। ম্যানেজার নদু বর্গাদারদের ধাতানি দিয়ে এসেছে, তারা রথের আগে কিছু ধানচাল দেবে বলে কথাও দিয়েছে। তবে ম্যানেজারের পদ নদুকে উদ্ধত এবং লোভীও করে তুলেছে। কেটারিং-এর লোক দিয়ে সে জগন্নাথের ভোগ রাঁধাবে

বলে ঠিক করেছে, শঙ্খর খোরপোষের টাকা থেকে যে বারোশ টাকা অতসী নদুকে দিয়েছিল চানযাত্রার মাল কিনতে তা নিজে মেরে দিয়ে কাটা পকেট দেখিয়ে সে পকেটমারির 'গল্প' শুনিয়েছে। ধনগোপাল গল্প বিশ্বাস না করলে সে কৌশলে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে রায় পরিবারের পুরনো কেচ্ছা ঃ ''আমি আপনার পা ছুঁয়ে বলছি জ্যাঠামশাই, সেদিনের পর থেকে আমি পুরো বিশ্বাসী হয়ে কাজ করছি। আমি সব ভুলে গেছি। ঐ রমেশবাবু ... জোছনা মা ... সব কথা।''[৭৭] নদুর সঙ্গে মন কষাকষি হতেই ফের হাজির মন্মথ। সে তো বুঝতে পেরেছে জগন্নাথ এবং রথযাত্রার 'সম্ভাবনা', তাই সে ওঁৎ পেতেই ছিল। ধনগোপালও এই উৎসবের ভার আর বইতে পারছেন না, তাই চুপচাপেই তিনি রথ তুলে দেন মন্মথর হাতে। কিন্তু সরসী চিৎকার করে শঙ্খকে ডাকে আর মায়ের সঙ্গে কোর্টে যাবার জন্য প্রস্তুত শঙ্খ রথের সামনে শুয়ে পড়ে 'মৃগী রোগীর মত গলা ফাটিয়ে ছটফট করতে থাকে'। অতসী শঙ্খকে টেনে নিয়ে কোর্টে চলে যায়। মন্মথ সঙ্গীদের সাহায্যে রথ নিয়ে যাবার তোড়জোড় করে। ব্যবসার জোর বাড়াতে সে সেখানে দাঁড়িয়েই জগন্নাথ সম্পর্কে এক অলৌকিক গল্প তৈরী করে।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে অতসীর এক মাত্র অবলম্বন শঙ্খকে নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হয়। জজও শঙ্খকে তার বাবার হাতে ছেড়ে দেবারই পরামর্শ দেন অতসীকে। নিজের ভবিষ্যৎ অতসী নষ্ট করেছে ঐ ছেলের জন্য। আর একটা বিয়ে করেনি, চাকরি করে নি, সব ঐ লোকটাকে 'নিষ্কৃতি' দেবে না বলে। যে ছেলের জন্য তারা অতসীকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই ছেলেকে আজ ফিরিয়ে নিলে মাঝখান থেকে অতসী যে নিরালম্ব হয়ে পড়ে। এদিকে ম্যানেজার নদু ধনগোপালের বর্গাদার এন্তাজ মিঞার বাড়িতে গিয়ে এন্তাজের বিবিকে লাথি মেরে দাওয়া থেকে উঠোনে ছিটকে ফেলে দিয়েছে এবং জগন্নাথের পুজোয় লাগবে বলে দশ বস্তা সাদা সর্ষে টেনে নিয়ে এসেছে, যদিও সে সর্ষে জগন্নাথের পুজোর আয়োজনে জমা পড়ে নি। এ নিয়ে সাম্প্রাদায়িক সংঘর্ষ ঘনিয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। মন্মথ দাঙ্গা বাঁধাবার জন্য ক্রমাগত উস্কানি দিয়ে গেছে। সুযোগ বুঝে উদয় আবার চেপে ধরেছে ধনগোপালকে ঃ

> ''আসলে ব্যাপারটা কী জানেন দাদা, ... আপনাদের পরিবার চিরকাল লেঠেল পাইকের ঘাড়ে বন্দুক রেখে কাজ হাসিল করে এসেছে। আজ নদুকে পেয়ে সেই ফিউডাল কায়দায় তাকে ব্যবহারের লোভটা এড়াতে পারেন নি।''[৭৮]

উদয়ও মন্মথকেই রথ দিয়ে দিতে বলে। ইতিমধ্যে এন্তাজ এসে ঢোকে। সে বিশ্বাস করে, ধনগোপাল কখনও তাদের বাড়িতে লুঠতরাজ করতে লোক পাঠাতে পারেন না। কিন্তু বৃদ্ধ এন্তাজের কথা গ্রামের কেউ আর শুনছে না, তারা সবাই ফুঁসছে। এই অবস্থায়, এন্তাজ ধনগোপালকে পরামর্শ দেয়, প্রফুল্লবাবুকে গিয়ে ধরতে। প্রফুল্লবাবু উদয়ের দলেরই উঁচুস্তরের নেতা এবং তিনি যে উদয়ের তুলনায় আলাদা তা তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন জনের উক্তিতেই বোঝা

যায়। উদয়রা অনেক কাজই করে থাকে তাঁর অগোচরে। ধনগোপাল কারো কাছে কোনোদিন মাথা নিচু করে দাঁড়ান নি, আজও তার কুণ্ঠা যায় না। মানুষের মুখোমুখি তিনি আর হতে চান না। তাই মুকুলই যায় প্রফুল্লবাবুর কাছে। প্রফুল্লবাবুর পরামর্শে নদুকে ম্যানেজারের পদ থেকে বরখাস্ত করে মুকুল, ক্ষিপ্ত নদু রায়বাড়িতে এসে সামনে পায় সরসীকে। শাসায়, ভয় দেখায়, পায়ে ধরে অনুরোধ করে চাকরিটা ফিরিয়ে দেবার জন্য। ইতিমধ্যে প্রবেশ করে শঙ্খ আর অতসী। সরসীকে সে পাঠায় ধনগোপাল আর মুকুলকে ডেকে নিয়ে আসার জন্য, শঙ্খর পরনে আজ নতুন জামা, গলায় ফুলের মালা। যে হাত ভাঙা বলে নদু ক্ষতিপূরণ হিসাবে ম্যানেজারির চাকরি পেয়েছিল তা যে আসল ভাঙেই নি সেকথা অতসীর কাছে প্রকাশ করে দিয়েছে ধূর্ত নদু। ক্ষিপ্ত অতসী নদুকে তাড়া করে — নদু পাঁচিল টপকে বাগানে ঢুকে পড়ে, অতসীও তার পিছু পিছু বাগানে যায়। হঠাৎ অতসীর হাঁকডাক বন্ধ হয়ে যায়, একটা চাপা গোঙানি শোনা যায়। শঙ্খ তখন রথের সর্বোচ্চ চাতালে। বাগানের অন্ধকারের দিকে সে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে। তার শরীর কাঁপছে থরথর করে। পুরোহিত যামিনী তখন চানযাত্রার প্রসাদ নিয়ে এসে শঙ্খকে শোনাচ্ছে পুরাণের কাহিনি — জগন্নাথ কনকনে ঠান্ডা জলে স্নান করলে লক্ষ্মী তাকে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুইয়ে রেখেছেন, খেতেও দেবেন না, উঠতেও দেবেন না। কিন্তু জগন্নাথ 'অপানিপাদ তবু দ্রুতগতি', তিনি নিজেই তখন 'ফুলমালা ধারণ করলেন', কপালে চন্দন মেখে রথে চড়ে বসলেন। যামিনীর এই বর্ণনার সময় রঙিন পতাকা আর জ্বলন্ত প্রদীপে সজ্জিত রথের ওপর নতুন জামা পরা, ফুলের মালা গলায় শঙ্খই যেন জগন্নাথ। সে পাণি এবং পাদযুক্ত, তবু ঠুঁটো। জমিদারতন্ত্রের অবসিত শক্তির মতোই সে অক্ষম। তাই বিস্ফারিত চোখে সে দেখে নিজের মাকে ধর্ষিতা হতে। জমিদারি ব্যবস্থার ওপর ঈর্ষাবশত চরম প্রতিশোধ নেয় নদু। রথযাত্রার উৎসবের আয়োজনে লাগে বিষাদের ছোঁয়া। ধনগোপাল মন্মথর হাতেই রথ তুলে দেবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। এদিকে অতসীও শঙ্খকে ছেড়ে দেবে বলেই ভাবে। দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে দেখা যায় রায়বাড়ির উঠোন-জোড়া রথটা আর নেই। প্রফুল্ল মন্ডলের পরামর্শ শুনে রথ তুলে দেওয়া হয়েছে জনসাধারণের হাতে। পরিবারের গন্ডি থেকে মুক্ত হয়ে জগন্নাথের রথ সর্বজনের হয়ে উঠেছে। সাম্প্রদায়িক সংঘাতের সম্ভাবনা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পটভূমিতে পরিবর্তিত হয়েছে। শঙ্খকেও কোর্টের রায়ের জোরে নিয়ে গেছে তার বাবা। রায়বাড়ি আজ রথশূন্য, জগন্নাথশূন্য। সরসীর আজ খুব মনে পড়ছে প্রায় বন্ধুর মতো হয়ে ওঠা শঙ্খকে। ধনগোপাল রায় আজ নিঃস্ব। বংশের আভিজাত্যের শেষ প্রতীক রথ হারিয়ে, হাবা গোঙা নাতিকে হারিয়ে, ধর্ষিতা মেয়ের কলঙ্ক নিয়ে ধনগোপাল আজ সামন্ততন্ত্রের ভগ্নস্তূপ। এই শেষ দৃশ্যেই সরসীর প্রতি মুকুলের ভালোবাসা ব্যক্ত হয়, অতসী এই সম্পর্কের পূর্ণতা দিতে সাহায্য করবে বলে জানায়। জগন্নাথের রথের শোভাযাত্রা চলেছে গ্রামের পথ দিয়ে। রথ আর রায়বাড়ির নয়, রায়বাড়িও আর সাধারণের তুলনায় স্বতন্ত্র নয়। শোভাযাত্রায় যেতে চান ধনগোপাল, যেতে চায় মুকুল। কারণ, মালিকানা গেলেও অধিকার তো যায় নি। জগন্নাথের রথ আজ সকলের। সেই সকলের মধ্যে তারাও তো

আছেন। ধনগোপাল শোভাযাত্রায় যাবার জন্য ছটফট করছেন। কিন্তু অতসী যাবে না শোভাযাত্রায়ঃ ''আজ আমার রথও নেই, জগন্নাথও নেই! হয়তো এই বাড়িতে তাদের মানাচ্ছিল না! দুঃখ বুঝিনে, ব্যথাও বুঝিনে! সবাই যাও তোমরা, কিছু মানিনে! যাও ...'',[৭৯] অতসী শঙ্খ বাজায়। পরপর দুবার। ধনগোপাল, মুকুল, সরসী শোভাযাত্রায় পা মেলাতে যাবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তৃতীয়বার কিছুতেই শাঁখ বাজাতে পারছে না অতসী। প্রাণপণ চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। তবু চেষ্টা করে যাচ্ছে, 'শোভাযাত্রার আলো ডাক দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে' বলে মনোজ মিত্র নাটক শেষ করেছেন।

'শোভাযাত্রা' নাটকের প্রতীতি মনোজ মিত্র পেয়েছিলেন মহিষাদলের রাজার দেওয়ানবাড়িতে। সিনেমার শুটিং-এ গিয়ে সেই বাড়িতে উঠেছিলেন। ভাঙাচোরা বিশাল বাড়িটায় বাস করেন সস্ত্রীক দেওয়ানের এক বংশধর। একদিন তাঁর ঘরে খেতে বললেন মনোজ মিত্র এবং দীপঙ্কর দে'কে। সেই বাড়ির উঠোনে তাঁরা দেখেছিলেন ঃ ''ঢাউস একখানা জগন্নাথের রথ। বহুকেলে। রথের বাঁধন ঢিলে হয়ে গেছে। কাঠে পচন ধরেছে। কলতলার পেছনে ঘন সবুজ বাঁশ ঝাড়। বাঁশের মাথা রথের মাথায় ঢলে পড়েছে।''[৮০] বাড়ির গিন্নির সঙ্গে আলাপচারিতায় জানা গেল, আগে খুব সমারোহের সঙ্গে রথযাত্রার উৎসব হতো। অনেক দিন সেসব চুকে গেছে। জগন্নাথের রথ — ফেলতেও পারেন না, বিক্রি করতেও পারেন না — বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। আমবাগানে তাদের অনেক আমগাছ কিন্তু একটা ফলও ঘরে ওঠে না। আশেপাশের গাঁয়ের লোকজন সব জোর করে পেড়ে নিয়ে যায়, বাধা দিতে গেলেই বলে, রাজবাড়ির লোকজন এককালে তাদের শোষণ করে এতো সম্পত্তি করেছে, এখন সুদে-আসলে পাওনাগন্ডা বুঝে নেব। সেই হতদরিদ্র পরিবারটি পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে। মনোজ মিত্র বলেন ঃ ''শোভাযাত্রায় ঐ বাড়িটা আছে, ভাঙা রথ আছে, বাঁশঝাড়টাও আছে, আর আছে বোধহয় গৃহকর্ত্রীর লজ্জাবনত মুখের দু'একটা কথা।''[৮১] বাংলা নাটকে জমিদার এবং কৃষক বহুবার এসেছে। তবে তা একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্নে। জমিদার সেখানে শোষক এবং কৃষক শোষিত — আর শেষ দৃশ্যে মঞ্চে লাল আলোর বৃত্তে কৃষকের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ। মনোজ এই সম্পর্কটাকেই একটু ঘুরিয়ে দেখতে চাইলেন। 'মগজের ডার্করুমে' ছিল মহিষাদলের সেই বাড়ির স্মৃতি আর নিজের বুদ্ধিবৃত্তির তাগিদ ছিল প্রচলিত সত্যের উল্টো পিঠটাকে ধরা। এখানে থেকেই সৃষ্টি 'শোভাযাত্রা'র। জমিদার এ নাটকে নেই, আছে জমিদারের উত্তরপুরুষ, যাঁকে পূর্বপুরুষের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, ঐতিহ্যের 'বোঝা' টেনে নিয়ে বেড়াতে হয়। সেই হতভাগ্য উত্তরপুরুষ ধনগোপাল। বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে তিনি এখন গ্রামের লোকের কাছে সেই সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ, যা এককালে গ্রামের মানুষের ওপর বহু অত্যাচার চালিয়েছে। বংশের সকলেই সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে বাইরে চলে গেছে। যদি কিছু বা থেকেও থাকে তাও বিক্রির চেষ্টা চলছে, রমেশ রায়ের ছেলে মুকুল এসেছে গ্রামে তাদের শেষ সম্পত্তি মোহনকাননের বাড়ি বিক্রি করতে। গ্রামে একমাত্র পড়ে আছেন ধনগোপাল। তাই পূর্বপুরুষের সব কৃতকর্মের দায় তাকেই বহন করতে হচ্ছে।

আগে প্রজারা জমিদারবাড়িতে এসে ধান চাল দিয়ে যেত, আর এখন ধনগোপালকে বর্গাদারের দরজায় গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াতে হয়, কিন্তু কিছুই প্রায় মেলে না। বর্গাদারের ঘৃণা ঝরে পড়ে 'জমিদারের বাচ্চা' সম্বোধনে। পরিবারের 'ঐতিহ্য' বলতে একমাত্র রথযাত্রার উৎসব ধরে রেখেছেন ধনগোপাল। এও যেন এক প্রায়শ্চিত্ত ঃ

> ''আমার কাছে ঐ কাঠের খাঁচাটা পাপেরও না পুণ্যেরও না। কেন ওটা বছর বছর রাস্তায় বের করে টেনে বেড়াই জানো ? অন্তত কিছুদিন লোকে বলে, না হে, রায়েরা একেবারে মন্দ নয়। দু'চারটে ভালো কাজও তারা করেছে। কিছুদিনের জন্যেই আমায় নিন্দেমন্দ গঞ্জনা শুনতে না হয়। আমার বাড়ি বাগান খেত খামারে ধ্বংসলীলা বন্ধ থাকে। যেন কেউ আমায় শাসায় না ... অত্যাচারী শাসক শোষক বলে না।'' [৮২]

সকলেই যেন জমে থাকা ক্রোধ উগরে দেয় বিপাকে পড়া ধনগোপালের প্রতি। নদু সেই মানসিকতার প্রতিনিধি। ধনগোপালের জ্ঞাতি রমেশ রায়ের সঙ্গে নিজের মায়ের অবৈধ সম্পর্কের সূত্রে সে যতটা সম্ভব সুবিধে আদায় করে নিতে চায় ধনগোপালের কাছ থেকে। নদু কখনো প্রতিহিংসাপরায়ণ, কখনো ধূর্ত। তার ক্ষোভ এবং ঈর্ষাকে যথাযথ শব্দে প্রকাশ করেছেন মনোজ মিত্র ঃ ''এই বাড়িটা দেখলে আমার সব কেড়ে নিতে ইচ্ছে করে! ... জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে ইচ্ছে করে! এদের এতো ছিল কেন ? কেন ছিল এতো ?''[৮৩] চারিদিকের প্রতিকূলতায় নিজেকে ক্রমশ গুটিয়ে নিয়েছেন ধনগোপাল। মানুষের কাছে তার 'সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ' পরিচয়টাই বড় হয়ে থেকেছে — এখানেই তার অভিমান। এই অভিমানের বশেই তিনি জগতের দিকে পেছন ফিরে বসেছেন। আভিজাত্যের অহংকার তাঁর আছে কিন্তু তার চেয়ে বেশি আছে অভিমান ঃ

> ''আমার বাপ চোদ্দপুরুষ কী অন্যায় করে গেছে, তার জন্যে আমি নাকে খৎ দিয়ে লোকের দোরে যাবো কেন ? কই, তোমরাও তো আমায় তোমাদের একজন ভাবো না ! তোমরাও তো ধরে বসে আছো, আমি সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ ! তাহলে বলো, এই সমাজে আমার কোন জায়গা নেই ! আমি একটা জঞ্জাল! একটা চন্ডাল!''[৮৪]

ধনগোপালের পূর্বপুরুষেরা একদিন যেমন ছিলেন গ্রামের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, আজ গ্রামে তেমনি পার্টিকর্মীদেরই একাধিপত্য। ধনগোপালের পূর্বপুরুষদেরই কথা তারা বলে অন্য ভাষায়। ধনগোপাল তাদের থেকে দূরেই থাকেন কিন্তু তারা একে আভিজাত্যের অহংকার বলে মনে করে। এই অহংকার ভেঙে ধনগোপালদের 'ওয়ান অব দ্য ইকুয়ালস্'-এ পরিণত করতে চায়।

দুই মেয়ে আর এক হাবা-গোঙা নাতিকে নিয়ে নিজের মতোই ছিলেন ধনগোপাল। কিন্তু সুখে থাকা তাঁর হল না। রথযাত্রার উৎসব তাঁর বাড়িতে বিপদ ডেকে আনল। জড়বুদ্ধি শঙ্খর মতোই অবসিত জমিদারতন্ত্রও আজ অক্ষম। তাই শঙ্খর মতোই বিস্ফারিত চোখে

তাকে দেখতে হয় বাড়ির মেয়ের চরম সর্বনাশ। প্রতিকারের আশা না রেখে সে লজ্জা চাপা দিতেই ব্যস্ত হতে হয়। নাটকের শেষে ধনগোপাল এক বিধ্বস্ত মানুষ। রথযাত্রার উৎসব গেছে সাধারণের হাতে, শঙ্খকে নিয়ে গেছে তার বাবা, ধর্ষিতা মেয়ে অতসী আর ছোটো মেয়ে সরসীকে নিয়ে তিনি আজ 'ওয়ান অব দ্য ইকুয়ালস্'। নাটকে ধনগোপালের বাড়ির রথযাত্রার উৎসব এবং জগন্নাথের মন্দির মন্মথ পালের 'ইজারা' নেওয়ার মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের ওপর ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত আছে। দীর্ঘদিন তক্কে তক্কে থেকেও রথ হস্তগত করতে পারেনি মন্মথ, এ তার বিরাট আক্ষেপ। কিন্তু বিষাদ সরে গিয়ে তার চোখে লোভ ঝিলিক দিয়ে ওঠে, যখন তার সহযোগী একটি চরিত্র রায়েদের বাড়ি বিক্রি করে চলে যাবার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছে ঃ

> ''সে আমলের কড়ি বরগা, এখন সোনার চেয়ে দামী। শুধু এই মাল বেচার টাকায় গোটা কত মাল্টিস্টোরিড হয়ে যায়। আনমনা করে দেয় কাকা ... এই প্রাসাদপুরী ... এই মেঘলা রঙা পায়রার ডাক। কিনে নিতে ইচ্ছে করে ... সব।''[৮৫]

রথযাত্রা উৎসব রায়বাড়ির গন্ডি ছাড়িয়ে সাধারণের মাঝে নেমে এসেছে। জগন্নাথের ছাতা নিয়ে ধনগোপালও সেই শোভাযাত্রায় পা মেলাতে চান কিন্তু অতসীর তৃতীয়বারের শঙ্খ আর বাজে না। মনোজ মিত্র দেখান, অনিবার্য বিষন্ন পরিণতি সামন্ততন্ত্রের। কিন্তু ব্যবধান তবু সহজে ঘোচে না। কালের অমোঘ নির্দেশে ধনগোপালদের স্বাতন্ত্র্য ভেঙে পড়তে বাধ্য কিন্তু তার জন্য অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের স্তর পার হতে হয়। সেই ব্যবধান ঘুচে যাবার পূর্বমুহূর্তেই তিনি নাটক শেষ করেছেন। এতেই যেন অভিশাপ মুক্তি ঘটেছে এই পরিবারের।

এই নাটকে মনোজ মিত্র বাংলাদেশের গ্রামের একটি বিশেষ কালখন্ডকে বিধৃত করেছেন নিজের সত্যদৃষ্টির আলোকে। অবসিত জমিদারতন্ত্রের বিষাদময় পরিণতি তিনি দেখিয়েছেন কিন্তু তার মমতা পুরনোরই প্রতি। এদিক থেকে তিনি তারাশঙ্করের সমধর্মী। এককালের জমিদার বংশের প্রতি মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, বর্গাদারদের আধিপত্য, গ্রামে প্রবল দলতান্ত্রিকতা, সামন্ততন্ত্রের মৃতদেহের ওপর ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সবই দেখিয়েছেন মনোজ মিত্র। আর সেই সঙ্গে রচনা করেছেন অদ্ভুত সুন্দর কিছু মানবিক সম্পর্ক। এই সম্পর্কগুলি তৈরি হয়েছে শঙ্খ-সরসীর মধ্যে, অতসী-যামিনীর মধ্যে। কোথাও স্পষ্ট করে কিছু বলা নেই, নির্দিষ্ট কোনো সংলাপ উদ্ধার করে হয়তো দেখানোও যাবে না, কিন্তু তবু কীভাবে যেন আমরা বুঝে যাই শঙ্খ আর সরসীর সম্পর্ক নিছক মাসি-ভাগ্নে বা বন্ধুত্বের নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু। আর শুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবান পূজারী যামিনী সম্পর্কেও একটা 'অন্যরকম' ভাব জেগেছিল অতসীর মনে। এই সম্পর্কগুলির আভাস ধরা পড়েছে সমালোচকের চোখে ঃ

> ''অতসী কেন যামিনী ঠাকুরের চলে যাওয়াতে এমন ব্যাকুল হয় ? ... বয়স এবং সম্পর্ক ছাড়িয়ে একটি বোবা ছেলের বন্ধু হওয়া ছাড়া সরসীর মনে অন্য কিছু যে জন্ম নিচ্ছিল তা

> প্রমাণিত হল শঙ্খর চলে যাওয়ার পর ভেঙে পড়াতে। ... নদুর হাতে ধর্ষিতা অতসীর সামনে যখন আর কিছু নেই, যখন ছেলেকে ছেড়ে দিয়েও সে পাথর তখন সে বোনের দিকে অমন কাতর চোখে তাকায় কি করে ? মানুষের এই সম্পর্কগুলোয় অনুচ্চারে সাহসী হয়ে আলো ফেলেছেন মনোজ মিত্র।''[৮৬]

চরিত্র রচনায় মনোজ মিত্র যে এই নাটকে বারবার প্রত্যাশিত ছক ভেঙে দিয়েছেন, সেকথা উল্লেখ করেছেন শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়ও ঃ

> ''ঝিয়ের ছেলে নদুর মনে যে জমিদার-বাড়ি সম্পর্কে ঘৃণা, পয়সা রোজগারের ধান্দায় সেই বাড়িরই কাজ করতে রাজী হয় সে। ... মানব সম্পর্কের জটিল বিন্যাস ধরা পড়ে বাবার সঙ্গে দুই মেয়ের দু'রকমের বোঝাপড়ায়, বা জড় কিশোর শঙ্খর সঙ্গে তার মাসি সরসীর অন্যরকম বন্ধুত্বে বা পুরোহিত যামিনীর সঙ্গে বড় মেয়ে সরসীর নিরুচ্চার বিনিময়ে।''[৮৭]

মুকুলের মনে সরসী সম্পর্কে যে ভালো লাগার বোধ তৈরি হয়েছে এবং যা পরে ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়েছে তা ব্যক্ত করেছে মুকুল একেবারে শেষে এবং এই সম্পর্ক যে ইতিবাচক পরিণতি পাবে তার ইঙ্গিত আছে নাটকে। অর্থাৎ গ্রাম বাংলার পটভূমিকায় অস্তায়মান জমিদারতন্ত্রের ছবি আঁকতে গিয়ে একটি বিশেষ পরিবারের মধ্যে সৃষ্ট কতগুলি মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েনকেও ফুটিয়ে তুলেছেন মনোজ মিত্র।

'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'র মতো 'শোভাযাত্রা'তেও কৌতুক সৃষ্টির অবকাশ কম। যেটুকু কৌতুক আছে তাকেও সমালোচকেরা বাহুল্য বলে, দর্শককে 'তুষ্ট' করার আয়োজন বলে বিরূপ সমালোচনা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য ঃ ''এসব নাটকে যে প্রধান জোর তার ওপর যেন মনোজ ভরসা করতে পারছেন না।''[৮৮] কিন্তু 'শোভাযাত্রা' নাটকটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এখানে কৌতুকরসের আয়োজন প্রধানত মন্মথ চরিত্রটিকে ঘিরে। নাটকের খলচরিত্র বা Villain-এর প্রথাগত পরিচয়ের সঙ্গে মেলে না মনোজ মিত্রের নাটকের খল চরিত্র। কৌতুকের আবরণে এই চরিত্রগুলিকে তিনি যেন সহনীয় করে তোলেন। এই চরিত্রের মধ্যেও কোথায় যেন একটা অসহায়তা আছে ঃ ''মনে হয় ধনী মন্মথ টাকা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েও ভগ্নপ্রায় নিঃস্ব ধনগোপালের কাছে কোথায় যেন হেরে যাচ্ছে।''[৮৯] কৌতুক এই চরিত্রটিকে করুণার পাত্র করেছে, খল চরিত্রের type-এ পরিণত করে নি।

পরিবার-জীবনে দাম্পত্যের বিচিত্র রূপকে মনোজ মিত্র ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছেন একাধিক নাটকে। এই নাটক গুলি মুখ্যত একাঙ্ক। 'পাখি' (১৯৬০), 'টাপুর টুপুর' (১৯৬৭), 'সন্ধ্যাতারা' (১৯৭৯-৮০), 'আঁখিপল্লব' (১৯৯০), 'স্মৃতিসুধা' (১৯৯৩) এবং 'আকাশচুম্বন' (১৯৯৫) নাটকগুলিকে এই গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। পূর্ণাঙ্গ 'দম্পতি' এই গুচ্ছেও আসতে পারে, যার সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৬০ সালে রচিত এবং ১৯৭৬ সালে পুনর্লিখিত 'পাখি' নাটকে নায়ক নীতিশ পেশায় হ্যারিকেনের সেলসম্যান। তার স্ত্রী

শ্যামা 'একটু রোগা, একটু কালো, কঠিন চিবুক, চোখের কোণে কালি'। বৈশিষ্টহীন এই চেহারার মধ্যেও মনোজ মিত্র রেখে দিয়েছেন একটু রোমান্টিকতা — 'বড় বড় চোখ। সঘন মেঘের মতো রাশিকৃত ঘনকৃষ্ণ কোঁকড়া চুল'। নাটকের শুরুতেই দেখা যায়, কাগজের শিকল, ফুল এবং বিচিত্র সব কারুকার্যে নীতিশ নিজের ঘর সাজিয়েছে। গ্রামোফোনে পুরনোদিনের রেকর্ড বাজছে আর পালঙ্কের ওপর আধশোয়া হয়ে বিড়ি টানতে টানতে নিজের শিল্পকীর্তি উপভোগ করছে নীতিশ। শ্যামা গিয়েছিল তার ছোড়দির বাড়ি, সেই সুযোগে প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকেই টাকা তুলে নীতিশ গ্রামোফোন ভাড়া করে, ফুল কিনে এনে, আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করে, ঘরের জিনিসপত্র সব, এমনকি ঠাকুরও ছাদে তুলে দিয়ে ঘর সাজিয়েছে। 'সর্বজনীন পরোপকারী' গোপালকে বাজারে পাঠিয়েছে কাঁচা-বাজার করতে। বন্ধুবান্ধব, পরিচিত মোট তেরোজনকে নিমন্ত্রণও করা হয়ে গেছে। কারণ আজ ৭ই ফাল্গুন — নীতিশ-শ্যামার পঞ্চম বিবাহবার্ষিকী। শ্যামা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এই আয়োজন দেখে। মাসে চারশো টাকা মাইনে আর হ্যারিকেন প্রতি বিশ পয়সা কমিশন যার, তাকে সাজে না এই আয়োজন। নামেই হ্যারিকেন কোম্পানির 'রেগুলার সেলস্ রিপ্রেজেনটেটিভ' কিন্তু আসলে ফেরিওয়ালা। শ্যামা বলে ঃ "হুঁ হুঁ সেলস্ রিপ্রেজেন .... তেলাপোকা আবার পাখি! হাতে হ্যারিকেন নিয়ে ঘুরে বেড়ায়"[৯০] কিন্তু মনোজ মিত্র দেখাতে চান, তেলাপোকাও পাখি হতে চায়, একদিন ক্ষণিকের জন্য হয়তো পাখি হয়েও যায়। মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন রেশন উঠছে না, বাড়িওয়ালা, মুদির কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে, দেশের বাড়িতে বুড়ি মা পোস্ট অফিসের দিকে চেয়ে বসে আছে ছেলের টাকার আশায়, উকিল বাড়িতে এসে অপমান করে যাচ্ছে ফী-এর টাকার জন্য — কিন্তু তবু একটা দিন, অন্তত একটা দিনের জন্য মধ্যবিত্ত মানুষ সব সীমাবদ্ধতার উর্ধে উঠতে চায়। তাই হ্যারিকেন বিক্রির কমিশন মার যাবে জেনেও নীতিশ ছুটি নিয়েছে। গোপালকে সঙ্গে নিয়ে সব আয়োজন সে করে ফেলেছে, এমনকি ডেকরেটারের কাছ থেকে তেরোটা ফোল্ডিং চেয়ার ভাড়া আনার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। কারণ একদিন সে দেখিয়ে দিতে চায় ননীকে, ভুবনকে আর সব বড়লোক বন্ধুদের। বন্ধুরা বড়লোক বলে কোনো দুঃখ নেই নীতিশের কিন্তু মাঝে মাঝে খোঁচা লাগে বুকে ঃ

"নীতিশ ।। শুধু মাঝে মাঝে কিরকম খোঁচা লাগে ... একদম এইখানে। ননীর ছোট মেয়ের মুখেভাতে ... ওঃ, সে কী এলাহি ব্যাপার ... হ্যাঁ খাওয়ার টেবিলে খোঁচাটা কড়াং করে লেগেছিল।

শ্যামা ।। খোঁচা! কী খোঁচা গো!

নীতিশ ।। ভুবন আমার পাশে বসেছিল। বলল, নিতুর বাড়ি কবে যাচ্ছি আমরা ? শুনেই ননী হা হা করে উঠল — যেদিন বৃষ্টি হবে, আর যেদিন বৃষ্টি হবে না ... দুটো দিন বাদ দিয়ে নিতু আমাদের খাওয়াবে। কড়াং করে যেন চাবুক

> পড়লো শ্যামা, এইখানে। সেদিন থেকে তাক করে আছি, একদিন ব্যাটাদের আমি তাক লাগিয়ে দেব! ঠিক! শুধু তোরাই আমায় ডেকে খাওয়াবি, আমি তোদের ডাকতে পারি না! তখন ভাবলাম যা থাকে কপালে ... প্রভিডেন্ট ফান্ড তো প্রভিডেন্ট ফান্ডই সই! লড়িয়ে দিলাম!''[৯১]

শ্যামা প্রথমে নীতিশের এই আয়োজনে ক্ষিপ্তই হয়ে উঠেছিল। সাধ-আহ্লাদ তার নেই এমন নয়, তবে একদিনের উৎসব করে সারা বছর তার জের টানতে সে রাজি নয়। কৌশলে সে নীতিশের পকেট থেকে টাকা হাতিয়ে নিতে চায়। নীতিশের আয়োজন তার কাছে মনে হয় 'ক্যারিকেচার'। এ যেন নিজেদেরই অপমান করা। উকিল চৈতালীকেও সেই প্ররোচিত করে নীতিশের কাছ থেকে টাকা কেড়ে নিতে। কিন্তু গোপাল যখন সত্যি সত্যি চ্যাঙারি ভর্তি বাজার নিয়ে আসে এবং উকিল চৈতালী বাকি ফী-এর দায়ে সেই চ্যাঙারি ধরেই টানতে থাকে তখন শ্যামা চ্যাঙারি টানে ঘরের দিকে। উকিলকে একশো টাকা দিয়ে আপাতত মিটিয়ে লেগে যায় রান্নার কাজে। কিন্তু মধ্যবিত্তের সাধ পুরণে বাধা শুধু একটা নয়। দরজার বাইরে থেকে গোপাল কুড়িয়ে নিয়ে আসে একটি চিঠি কিন্তু নীতিশ তখন সেই চিঠি পড়তে চায় না। কারণ সে জানে, এই চিঠি যদি মায়ের হয় তবে তাতে শুধু খারাপ খবরই আছে। গ্রামের বাড়িতে সাত পুরুষের ভিটে আগলে বসে আছে যে মা তার প্রত্যেক চিঠিতেই জানা যায় 'অবস্থা খারাপ ... আরো খারাপ ... আরো!' আজকের কয়েকটা ঘন্টার ওপর দুঃখের ছায়া পড়তে দিতে চায় না নীতিশ। আজ যে তার 'পাখি' হয়ে ওঠার দিন। একটু চেষ্টা করে ঘন্টা কয়েকের জন্যে সে সব ঢেকে রাখতে চায়, যেভাবে শ্যামার সুতোর কাজ করা চাদর দিয়ে তারা ঢাকছে ছেঁড়া, তুলো বের হওয়া গদি। সেই চাদরে শ্যামা ছেঁড়া কাপড়ের সুতো দিয়ে তুলেছিল 'এক ডালে দুই পাখি'। কিন্তু অভাবের সংসারে 'সুখপাখি' টেঁকে না, ন্যাপথলের অভাবে একটা পাখি কীটদষ্ট হয়ে যায়। তবু নীতিশ গ্রামোফোনে গান বাজিয়ে, নানারকম গল্প করে শ্যামার মন ঘোরাতে চেষ্টা করে, একটা দিন অন্যভাবে কাটাতে চায়। বন্ধুরা কী উপহার দিতে পারে তা নিয়েও আলোচনা হয়। কিন্তু পাড়ার সব দোকানের দেনা রেখে বিবাহবার্ষিকীর মোট বাড়িতে ঢোকাতে দেখে সব পাওনাদারেরা দরজায় এসে উপস্থিত। শ্যামা এই অপমান সহ্য করতে পারে না। নীতিশের প্রভিডেন্ট ফান্ড ভাঙা টাকা নিয়ে দেনা মেটাতে যায়। রাগে ক্ষোভে অসহায় নীতিশের চোখ ফেটে জল আসে। দুঃখের ছায়াপাত যখন আটকানো গেলই না, তখন নীতিশ পকেটের সেই চিঠি খুলে দেখে। আর দেখা মাত্রই অস্ফুট আর্তনাদ করে সব ছিঁড়ে ফেলে, ফুলদানি, আছড়ে ভাঙে, চাদর টেনে ছুঁড়ে ফেলে। অন্ধকারে এক ধ্বংসস্তূপের মাঝে সে বসে থাকে — একা, ভাঙাচোরা। পাঠক-দর্শক যখন নীতিশের মায়ের কোনো দুঃসংবাদ আশঙ্কা করছে তখন নীতিশ শ্যামার কাছে ভেঙে পড়েছে প্রকৃত সংবাদে। বন্ধুরা আজ কেউ তার বাড়িতে খেতে আসছে না। 'কুত্তাবাবু' ননী চিঠিতে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে, চাকরি খালির সংবাদ দিয়ে দরখাস্ত করতে বলেছে, আর ঃ

> ''আর লিখেছে যে খাওয়াতে চেয়েছি, এই ঢের! আমার যা অবস্থা সত্যি সত্যি না খাওয়ালেও চলবে! শ্যামা, ওরা নাকি সত্যি সত্যি আমাদের কাছে খেতে চায় নি! ... আর শেষ লাইন ... তুই খুশি তো নিতু, এতো বড় একটা খরচের হাত থেকে তোকে রেহাই দিলাম''[৯২]

এতক্ষণে দুচোখে জল টলমল করে ওঠে নীতিশের চোখে। নিজেকে ভীষণ ভীষণ অপমানিত বোধ হয় তার। 'গরিব' বলে নিজেকে যেন সত্যি সত্যি সে চিনতে পারে এবার। কিন্তু মনোজ মিত্র ধনী বন্ধুদের এই করুণায় ব্যর্থ হয়ে যেতে দেন নি নীতিশ-শ্যামার বিবাহবার্ষিকীকে। শ্যামা এগিয়ে এসেছে সহমর্মিতার স্পর্শ নিয়ে ঃ

> ''(বাতিদানে পাঁচটি মোমবাতি জ্বালাচ্ছে) নাই বা এলো ওরা ... নাই বা জ্বলল আলো ... বাজল বাজনা! কিন্তু আমাদের দিনটা মিছে কেন হবে ... সাতুই ফাল্গুন ... আমাদের একটা দিন! বলো ... ওরা কে আমাদের অ্যাঁ, যে এলো না বলে সব নষ্ট করে দিতে হবে ? ওরা আমাদের কেউ না গো ... কেউ না''[৯৩]

পারস্পরিক এই বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতার জগতেই মনোজ মিত্র পৌঁছে দেন তাঁর চরিত্রদের।

'টাপুর টুপুর' নাটক শুরু হয়েছে এক বৃষ্টির দুপুরে শহরের এক রেস্তোরাঁয়, যেখানে বেণী বসে ঝিমুচ্ছে আর গণেশ চেয়ার জোড়া দিয়ে গভীর ঘুমে মগ্ন। দুপুরে রেস্তোরাঁ বন্ধ। এমন সময় বাতাসের দাপটে খুলে যাওয়া দরজায় হাতে চটি নিয়ে যে মেয়েটিকে দেখা যায় তার নাম মরালী। মরালীর মতোই সে যেন জলে সাঁতার কেটে উঠে এল। মনোজ তাকে পরিচিত করিয়েছেন এইভাবে ঃ ''দেখতে শুনতে খুব ভালো না, একটু কালো, একটু কৃশ আর আষাঢ়ের ধারার মতো মাথায় দীর্ঘ সতেজ একরাশ চুল।''[৯৪] (বর্ণনায় শ্যামার সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষণীয়)। স্বামীর সঙ্গে শহর দেখতে বেরিয়ে এই বর্ষায় বড় 'আতান্তরে' পড়ে গেছে মরালী। লোকের কাছে শুনেছে 'এখানে লোকে বসে খায়-দায়, গপ্পোসপ্পো করে'। তাই সে এসে উঠেছে এখানে, পেছনে তার স্বামী। দিবানিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায় বিরক্ত বেণী আর গণেশ তাদের তাড়াবার বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হবার পর নতুন কৌশল ধরল। গ্রামের দরিদ্র মানুষকে নিয়ে এক নিষ্ঠুর খেলা শুরু করল। হঠাৎ যেন ভালো লোক হয়ে গেল বেণী আর গণেশ। কাটলেট, মোগলাই, মাংসের দো-পেঁয়াজি ইত্যাদি নানারকম জিনিসের ফর্দ শুনিয়ে লুব্ধ করে আর পাশাপাশি দাম বলে যায়। কেষ্টদুলালের পকেটে তখন মাত্র এক টাকা। সে বুঝে গেছে, আজ তার হেনস্থার একশেষ করে ছাড়বে বেণী-গণেশ, এমনকি পুলিশে পর্যন্ত দিতে পারে। মরালীকে নিয়ে নানা অজুহাতে সে বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু মরালী নতুন নতুন খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ না নিয়ে যাবে না। আর বেণীও তাদের বেরোতে দেবে না। 'গাঁও কা মাল' নিয়ে নিষ্ঠুর উল্লাসে মেতেছে বেণী-গণেশ। ছাতা বগলে নিয়ে কেষ্টদুলাল যখন মরালীর হাত ধরে আপ্রাণ টানছে বাইরের দিকে তখন নির্মম হাসিতে ফেটে পড়েছে বেণী ঃ ''আহা চললে কোথায়! ও লাটের বাবা! এখন ল্যাজ গুটিয়ে ভাগো যে! ধর্ ধর্ ধর্ ...''[৯৫] এবার জ্বলে ওঠে মরালী। আঁচল খুলে চারটে ভিজে দশ টাকার নোট বের করে ঃ ''ফুলশয্যের ছাতা দেখেছো,

ছেঁড়া জুতো দেখেছো, এবার টাকা দ্যাখো! টাকা! হাত দিয়ে দ্যাখো গরম!''[৯৬] হতভম্ব বেণীর মুখের ওপর টাকা ছুঁড়ে দিয়ে মরালী 'ফাস্টকেলাস' খাবার আনতে বলে দাপটে। গরিবকে নিয়ে ঠাট্টার জবাব এভাবেই দেয় মনোজ মিত্রের চরিত্ররা। পাশাপাশি থাকার অঙ্গিকার করে তাদেরই মতো ক'রে ঃ ''বে'র রাতে বলেছিলে না, সংসারে তুমি আমার মান বজায় রাখবে, আমি তোমার মান বজায় রাখবো। মাত্তর সোমে-সোমে একুশ দিনে সব ভুলে যাবো! না গো, না ... না''[৯৭] পারস্পরিক এই সহমর্মিতাকেই বড় করে দেখাতে চান মনোজ মিত্র, পরিবার-জীবনকে প্রতিষ্ঠা দিতে চান শক্ত ভিতের ওপর।

'আঁখিপল্লব' নাটকে সেই ভিতকেই দৃঢ় করেন তিনি। ইতিহাসের তন্নিষ্ঠ গবেষক পল্লব, কিন্তু তার পেছনে রয়েছে এক নারী — সে আঁখি। বাড়ির অমতে সে পল্লবকে বিয়ে করেছে। বাড়ি থেকে পল্লবের পড়ার খরচ বন্ধ করে দিলে আঁখি নিজের পড়া ছেড়ে চাকরি করে পল্লবকে এম.এ. পড়িয়েছে। এখনও আঁখি চাকরি করে আর পল্লব গবেষণা। বস্তিতে ঘর ভাড়া নিয়েছে তারা, ভালো জায়গায় ঘর নেবার মতো সেলামি দেবার সাধ্য নেই বলে। খুরশিদের সাহায্যে এই ঘর পাওয়া গেছে। খুরশিদ ভালুক খেলা দেখায়, সেই ভালুক বেঁধে রাখে আঁখি-পল্লবের ঘরের বারান্দায়। আঁখি গোয়েন্দা গল্প-লেখিকা শকুন্তলা দেবীর অনুলেখিকার কাজ করে। পল্লব সারাদিন নিজের পড়াশুনা নিয়ে থাকে। সম্প্রতি সে এক পুঁথি নিয়ে মগ্ন। তাঁর অনুমান, এই পুঁথি চৈতন্যদেবের লেখা ন্যায়শাস্ত্রের পুঁথির প্রাথমিক খসড়া। যদি একথা সে প্রমাণ করতে পারে, তাহলে বাংলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি-দর্শনের ইতিহাস নতুন করে লেখা হবে। আপাতত সেই স্বপ্নে সে রোমাঞ্চিত। খুরশিদের দুই বোন মাঝে মাঝে এসে উঁকি দিয়ে যায় পল্লবের ঘরে। আঁখি কখনও কখনও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে পল্লবের 'আনমাইন্ডফুল প্রফেসরি ঢং' দেখে। রাগে সে ফুঁসে ওঠে ঃ

> ''আছে ভালো। কাজকর্ম চাকরিবাকরির চিন্তা নেই, বছরের পর বছর চলছে ইতিহাস গবেষণা! আরো সুবিধে, সারাদিন আমি থাকছি বাইরে, দিনভর একা একখানা ঘরে! শুয়ে বসে চিৎ হয়ে বই মুখে! বই ... বই ... বেড়ালছানার মতো সারা ঘরে বই ঘুরছে দ্যাখো! বাদুলে পোকার মতো থিকথিক করছে বই আর বই! করে এ জঞ্জালের হাত থেকে মুক্তি পাবো! পারছি না ... আর যে পারছি না আমি!''[৯৮]

যে কোনো পুরুষের মতোই পল্লবের ধারণা, জগতে তার কাজটাই কেবল গুরুত্বপূর্ণ, অন্যদের কাজ তুচ্ছ। তাই আঁখির ডিকটেশন নেবার কাজকে তার 'একঘেয়ে' 'ক্লান্তিকর' বলে মনে হয়, সেই কাজ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাস্য থাকতে পারে বলে সে মনেই করে না। অথচ নিজের কাজ সম্পর্কে আঁখির কাছে সে মুখর। এই স্বার্থপরতাকে, আত্মকেন্দ্রিকতাকে পরীক্ষার মুখেই ফেলেন মনোজ মিত্র, আঁখির বাইরে একটা চাকরির সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। কিন্তু পল্লব সে চিঠি আঁখির হাতে না দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে। শিলচরে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের আশ্রমে সুপারভাইজারের সেই পদে যোগ দেবার শর্ত — আঁখিকে একা যেতে হবে। পল্লবের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে ঃ ''কে দেখবে আমায় ? খেতে দেবে কে ? ঘরটা গোছাবে কে ? বইপত্রগুলো সামলাবে কে ? ও না

থাকলে আমার কিছু হবে না। কিছু না। টাকা দেবে কে আমায় ? কোথায় যাবে রিসার্চ!''[৯৯] পল্লব ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সবকিছুর ওপর। অপমান করে তাড়িয়ে দেয় হর্ষ আর ছদ্মবেশী শকুন্তলাদেবীকে, যারা আঁখির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নিয়ে এসেছিল। পল্লব নিজের জগতে মগ্ন কিন্তু আঁখি ? সে তো সংসার চায়, পল্লবকে একান্ত নিজের করে পেতে চায়। পড়াশুনো করে, গবেষণা করে পল্লব বিরাট হয়ে তার নাগালের বাইরে চলে যাক্ তা চায় না আঁখি ঃ

> ''যখন তুমি এই আশ্চর্য পুঁথিটার রহস্য ভেদ করবে, যখন তুমি এই বিপুল সম্পদ আবিষ্কার করবে, তখন যে একেবারেই কোনো দাম থাকবে না আমার পল্লব। সারা দেশ তোমায় মাথায় নিয়ে হৈচৈ বাঁধাবে, আমি হারিয়ে যাবো।''[১০০]

এই ভয়েই মাস্টারমশাই-এর কাছে পুঁথির গুরুত্ব শুনেও আঁখি পল্লবকে কিছু বলে নি। কিন্তু আজ সেই পুঁথিই বোধহয় পল্লবকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়! পল্লব যখন দুরন্ত অভিমানে আঁখির চাকরির সংবাদ প্রকাশ করে দেয় তখনই আবার আসে হর্ষ। এবার চাকরির প্রস্তাব পল্লবের জন্য, তবে শর্ত সেই একই — একা যেতে হবে। বনলতা সেন (শকুন্তলাদেবী) আগেই পল্লবকে লোভ দেখিয়েছেন শিলচরের বিশাল গ্রন্থাগারের, সেখানে ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত এক অজ্ঞাত লেখকের ন্যায়শাস্ত্রের পুঁথির সংবাদও দিয়েছেন। কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে নিয়ে পল্লবের অনুশোচনা জাগে। আঁখির প্রতি অপরাধবোধে, আত্মকেন্দ্রিকতার জন্য নিজেকে সে ধিক্কার দেয়। গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে ঘুমের বড়ি খায় আত্মহত্যা করতে। পরদিন সকালে সব রহস্যের সমাধান হয়। আসলে পল্লবের কাছে নিজের গুরুত্ব বুঝতেই শকুন্তলাদেবীকে দিয়ে এই কৌশল করিয়েছে আঁখি। আর ঘুমের বড়ি বলে পল্লব যা খেয়েছিল তা আসলে চিনির দলা। পল্লবের 'সুইসাইড বাতিক' আছে বলে আঁখি ঘুমের বড়ি সরিয়ে চিনির দলা রেখে দিয়েছিল। আকর্ষণীয় সম্ভাবনার মুখে ফেলেও নাট্যকার পরিবারের শক্ত বনিয়াদকেই জিতিয়ে দেন। আঁখি থেকে পল্লবকে পৃথক করে নয়, আঁখি-পল্লবের সহাবস্থানেই জীবনের সম্পূর্ণতা দেখান। এর পাশাপাশি তিনি বস্তিবাসীদের সহৃদয়তা তুলে ধরেন খুরশিদ এবং তার পরিবারের মধ্য দিয়ে। ভালুক 'কালাসাহেব'কে সে পল্লবের দরজায় বেঁধে রাখে, পল্লব একটা জ্যান্ত প্রাণীর সাহচর্যে নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পাবে ভেবে। বস্তিতে একমাত্র এই ঘরেই পড়াশুনোর দীপশিখা জ্বলে। সে শিখাকে রক্ষা করতে আন্তরিক খুরশিদ ঃ ''এ পাড়ায় তো বইকিতাবের পাট নাই! তো পাড়ার লোক তাই চায়, এমন কিছু না হয় যাতে আপনারা আর কোথাও চলে যান। বস্তির এই একখানা ঘরে লিখাপড়ার আলো জ্বলছে।''[১০১] কোনোভাবেই যেন তাদের কোনো অসুবিধে না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি খুরশিদের। আঁখি বিরক্ত হলে কালাসাহেবকে নিজেদের ঘরে রাখে খুরশিদ। কালাসাহেবের শেষ সময় আগত। পশু হাসপাতালেও স্থান নেই। মনোজের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয় না কালাসাহেবও। তাই পরদিন সকালে পাড়ার বাচ্চাদের নিয়ে দল বেঁধে কালাসাহেবকে হাসপাতালে নিয়ে যায় খুরশিদ ঃ ''সীট নাই বললে আজ ফিরব না। হাসপাতালে কালাসাহেবের ব্রেকডানস্ লাগিয়ে দেব''[১০২] আর তখনই জানিয়ে যায়, বোনেরা যে পল্লবের ঘরে উঁকি দেয় তা আসলে

'কিতাব' শুনতে। কতো 'কিতাব' একজন লোকে পড়তে পারে তাই নিয়ে ওরা বাজি ধরেছে। খুরশিদের মা তার বোনেদের সাজা দিয়েছে পল্লবের ঘরে উঁকি দেবার জন্য, কিন্তু খুরশিদের অনুরোধ, 'ভাবী'রা যেন কোনোভাবেই বস্তি ছেড়ে না যায়। আঁখি খুরশিদকে অভয় দেয় ঃ ''আমরা যাচ্ছি না — যাবো না — আমরা বেশ দিব্যি আছি — তোমাদের কাছে ভালো আছি''[১০৩] এই অস্তি ঘোষণাতেই, ইতিবাচক বিন্দুতে উত্তরণেই মনোজ মিত্র নাটক শেষ করেন।

'সন্ধ্যাতারা' নাটকের দম্পতি কুমুদশঙ্কর-আশালতা। পূর্ণাঙ্গ 'দম্পতি' নাটকের একাঙ্করূপ 'সন্ধ্যাতারা'। মেয়ের বিয়ে হয়েছে শিলং আর ছেলে চাকরি নিয়ে ভিলাই। নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বাড়ি আগলে বসে আছেন। জীবনের বোঁটা থেকে একে একে খসে পড়ছে বন্ধুরা, আর আশঙ্কা জাগছে নিজের শেষের সে দিনের। নিঃসঙ্গতার মুহূর্তে মনে হয় বাড়ি বিক্রি করে সন্তানের কাছে সন্তানকে ছুঁয়ে থাকাই বোধহয় ভালো। সংবাদ পেতেই দুদিক থেকে ছেলে-বৌ এবং মেয়ে-জামাই এসে হাজির। বাড়ি বিক্রি হয়ে যায়। দুপক্ষই টাকার জন্য মরিয়া, যদিও অভাব কারো সংসারে নেই। এই নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব, কথা কাটাকাটি — ভদ্রতার আবরণ আর টেঁকে না। এমনকি যে ছোটো ছেলে বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর, সেও বাড়ি বিক্রির টাকার ভাগ চায়। বাড়ি বিক্রির টাকা সমান তিন ভাগ হলো, 'বাড়িতে এবার সত্য সত্যই চাঁদের হাট বসিল'। যারা এতোদিন তীব্র আক্রোশে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়েছে এখন তাদের মধ্যেই কত মিল, কত ঠাট্টা-রসিকতা। কিন্তু এবার সমস্যা বাবা-মাকে রাখা নিয়ে। তারা তো এখন 'রেসপনসিবিলিটি', কেউই এই 'বোঝা' নিতে রাজি নয়। অবশেষে সিদ্ধান্ত — বাবা-মা ভাগাভাগি হবে — একজন ভিলাই, অন্যজন শিলং কর্তা-গিন্নির ভেতরের টান এবার বোঝা যায় — কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে রাজি নন। শেষে নাটকের মনোজীয় সমাপ্তি ঃ ''এখনো বিশ হাজার টাকা আছে আমার। নাগো, সব টাকা ওদের দিইনি। আর এই বারান্দাটাও ছাড়তে হবে না। দলিলে আছে, যতদিন আমরা দুজন বাঁচবো উপরতলাটা আমাদের থাকবে।''[১০৪] শিকড় ছিন্ন হতে দেন না মনোজ মিত্র। উৎকেন্দ্রিক আধুনিকতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজেদের মতো করে বেঁচে থাকে তাঁর বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা।

একাঙ্ক নাটক হলেও আকারে প্রায় পূর্ণাঙ্গের মতো 'স্মৃতিসুধা' শুরু হচ্ছে সুধাময়ীর স্মরণসভার প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে। সুধাময়ী নিজেও এই নাটকের একটি চরিত্র। ফুল-মালায় সজ্জিত ছবি থেকে বেরিয়ে এসে তিনি মাঝে মাঝেই কথা বলে যান, অবশ্যই ঘরে কেউ না থাকলে। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর একসঙ্গে ঘর করেছেন নলিনাক্ষ-সুধাময়ী। তাদের বিবাহিত জীবনে কোনো খেদ বা অপূর্ণতা ছিল না, সুখে-দুঃখে তারা ছিলেন পরস্পরের সঙ্গী। পরস্পরকে তারা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছেন। আজকের স্মরণসভার আয়োজক সুধাময়ীর স্বামী নলিনাক্ষ। ছেলেরা আমেরিকায় থাকে, আসতে পারেনি কিন্তু 'ডলার' পাঠিয়েছে। অনুষ্ঠানে ঘোষণার দায়িত্বে আছেন 'টিভি-বেতারখ্যাত' টুম্পা হালদার। ঘোষণাকে জমাটি করতে, মাঝে মাঝে

‘ফিলার’ দিতে টুম্পা নলিনাক্ষর কাছে জানতে চায় তাদের দাম্পত্য জীবনের নানা গল্প, এমন কোনো ঘটনা, যা অস্বাভাবিক বা রহস্যময়। অদ্ভুত এক পরিস্থিতিতে বিয়ে হয়েছিল নলিনাক্ষ-সুধাময়ীর। ফুটবল খেলে ফেরার পথে নলিনাক্ষ যখন হেদুয়ার পুকুরে হাত-পা ধুতে গেছেন তখন সুধাময়ী সেই পুকুরে ডুবে যাচ্ছেন। তাকে উদ্ধার করেন নলিনাক্ষ এবং তার পর বিয়ে। পঞ্চাশ বছরের দাম্পত্যে সুধাময়ীর একটা আচরণই কেবল রহস্যময় মনে হতো নলিনাক্ষর। সই-এর বর মোহনবাঁশির প্রতি সুধার ব্যবহারে যেন স্বাভাবিকতা ছিল না। কোনো না কোনোভাবে মোহনবাঁশিকে হেনস্থা করে যেন সুধার আনন্দ। স্মরণসভায় উদ্‌ঘাটিত হয় সত্য — পাড়ার রূপবতী শ্যালিকা সুধাময়ীর বিয়ের প্রতিটি সম্বন্ধেই ভাংচি দিতেন মোহনবাঁশি, সুধাময়ীকে অন্যের সঙ্গে দেখতে তার ভালো লাগবে না বলে। নীরব ভালোবাসা এই ভাংচি দিয়েই তৃপ্ত হতো। তার প্রতিশোধ নিতে সুধাময়ী মোহনবাঁশির কাছায় কোলাব্যাঙ বেঁধে দিতেন বা পিছল বাথরুমে আছাড় খাওয়াতেন। কুলগুরু সুধাময়ীর প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করবেন বলে ঘোষিকা টুম্পা গেরুয়া শাড়ি, টিপ আর রুদ্রাক্ষের মালায় সেজেছে। কিন্তু ততক্ষণে যে হাজির আর এক রহস্য। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেই বেহালা থেকে এসে উপস্থিত ‘বিল্ডিং কনট্রাক্টর’ কিরীটি ঘোষাল। বহুকাল আগে যে সুধাময়ীর সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল, স্মৃতিবাসরের সুধাময়ী সে-ই কিনা তা মিলিয়ে দেখতে এসেছেন। সুধার মনে ধরেছিল কিরীটিকে, কিন্তু কে যেন ভাংচি দিল, পাত্র ‘দুশ্চরিত্র লম্পট মাতাল’। বিয়ে ভেঙে গেল। বলা বাহুল্য, এই ভাংচি মোহনবাঁশিই দিয়েছিল। সাধারণভাবে বেশ কয়েকবার বিয়ে ভেঙে যাবার কথা বললেও এত বড়ো ঘটনাটা সুধাময়ী নলিনাক্ষর কাছে চেপেই রেখেছিল। নলিনাক্ষ এবার ঘোষণা করেন, কুলগুরু নয়, প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করবেন কিরীটি ঘোষাল। টুম্পাও এই প্রস্তাব সমর্থন করে, যদিও তাকে আবার পোশাক পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু কিরীটির প্রস্তাব, ‘যে মানুষটা কোন আশা না রেখে সারাজীবন মিছেই ভালোবাসলো’, সেই মোহনবাঁশিই মাল্যদান করবে সুধাময়ীর প্রতিকৃতিতে। আরো চমক, আরো রহস্য ছিল সুধার জীবনে। এমনি এক চমকের কথা বলেছে সুধার সই লবঙ্গ। নলিনাক্ষ এবং আর সকলেও জানতেন, সুধাময়ী পা পিছলে হেদুয়ার পুকুরে পড়ে গিয়েছিল কিন্তু লবঙ্গই জানে আসল সত্য — সুধা গিয়েছিল আত্মহত্যা করতে। একের পর এক বিয়ে ভেঙে যাওয়াতে সুধার মা এক দোজবরের সঙ্গে সুধার বিয়ে ঠিক করেছিল। সুধা এক বেলফুলওয়ালার সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে পালাবে ঠিক করে। জানাজানি হয়ে যেতে সুধাকে তার মা মারধোর করেন এবং রাগে দুঃখে ঘেন্নায় সুধা আত্মহত্যা করতে যায় হেদুয়ার পুকুরে। কিন্তু গোপন কি শুধু সুধাই করেছেন, নলিনাক্ষ করেন নি ? তাহলে কী বলছে স্মরণসভায় উপস্থিত সাঁতারু ভেল্টু ভট্ট ? এখন অটোচালক ভেল্টু ক্যাটারারের মালপত্র নিয়ে এসেছে আর এসেই শুনেছে হেদুয়ার পুকুর থেকে মেয়ে উদ্ধারের গল্প। তার স্মৃতি পিছিয়ে গেছে পঞ্চাশ বছর। ভেল্টু তখন অলিম্পিকে যাবার জন্য দিনরাত অনুশীলন করছে হেদুয়ার পুকুরে। এক বর্ষার সন্ধ্যায় একটি মেয়েকে সে পুকুরে ঝাঁপ দিতে দেখলো, তারপর তাকে বাঁচাতে একটি ছেলেও। কিন্তু তারা

দুজনেই যখন ডুবে যাচ্ছে তখন দুজনকেই বাঁচায় ভেলটু। সুধাময়ীকে বাঁচানোর কৃতিত্ব নিয়ে তাকে বিয়ে করেন নলিনাক্ষ কিন্তু তিনি সাঁতারই জানেন না। সত্য প্রকাশ হয়ে গেলে ভেলটু ভট্টকেই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক মনোনীত করেন নলিনাক্ষ। কে আজ সুধাময়ীর প্রতিকৃতিতে প্রথম মাল্যদানের অধিকারী — নলিনাক্ষ, মোহনবাঁশি, কিরীটি না ভেলটু ? আসলে সারাজীবন দুটি মানুষ একসঙ্গে কাটিয়ে দেবার পরও তাদের মধ্যে থেকে যায় কতো অজানা বিষয়। এক একটা ভুলের ওপরেই গাঁথা হয়ে যায় জীবনের ভিত। যা হওয়া উচিত ঘটে যায় তার বিপরীত ঃ

> ''আমি যাকে চাইলাম তাকে পেলাম না ... আমাকে যে চাইল সে পাবে না জেনেই চাইল ... যে আমাকে বাঁচাল সে আমাকে পেল না ... যার পাবার কথা না, সে আমাকে সব দিল ... ঘর সংসার সুখ শান্তি ছেলেমেয়ে নাতিপুতি বিত্ত বৈভব... কী আশ্চর্য জগৎ!''[১০৫]

মনোজ মিত্র দেখান, তবু মানুষ গড়ে স্নেহ-ভালোবাসা-মমতার ইমারত। ভুল যেমন সত্য, তেমনি সত্য ভালোবাসাও। পরস্পরের অনেক কিছু না জেনেও প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-আহ্লাদের কোনো হেরফের ঘটে না ঃ

> ''নলিনাক্ষ ।। পঞ্চাশ বছর কী অদ্ভুতভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করেছে। একটা দিনের জন্যেও আমাকে তার বিশ্বাসযোগ্য কি নির্ভরযোগ্য মনে হয় নি। কিরীটিবাবু, আমরা কার স্মরণসভা করছি ? যাকে আমরা কেউ ভালো করে জানি না, চিনিও নি —
>
> কিরীটি ।। অত তো জানার দরকার নেই ভাই নলিনাক্ষ। না জানার জন্যে কি তোমার পঞ্চাশ বছরের সুখ-আহ্লাদের কোনো হেরফের ঘটেছে। তবে আজ ও নিয়ে ভাবা কেন ?
>
> টুম্পা ।। অজানা বলেই তো আরো সুন্দর। এই ভুলভ্রান্তি আছে বলেই না ভুবন জুড়ে মোহিনীমায়া!''[১০৬]

জীবনের এই সৌন্দর্যই মনোজ মিত্রের অন্বিষ্ট, জীবনকে নানা দিক থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে এই সৌন্দর্যকেই তিনি খোঁজেন। এই নাটকের পরিবেশের সঙ্গে তিনি চমৎকার খাপ খাইয়ে দিয়েছেন ঘোষিকা টুম্পা এবং নলিনাক্ষর বাংলাদেশি ভাগ্নে ছানার অম্লমধুর রোমান্সকে।

'আকাশচুম্বন' নাটকেও আছে এক দম্পতি সুপ্রিয়-রূপার কথা, তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা, পা পিছলে যাবার কথা। কোচিং সেন্টারের শিক্ষক সুপ্রিয় এতদিন ছিল ওলাইচণ্ডীতলায় পলেস্তারা খসা স্যাঁতসেঁতে একতলার কুঠুরিতে। বহু চেষ্টায় আজ তারা উঠে এসেছে কোলকাতার অভিজাত অঞ্চলে গগনচুম্বী অট্টালিকার এক ফ্ল্যাটে। এতদিন তারা গুটিয়ে ছিল, আজ স্বচ্ছন্দে ডানা মেলেছে। রূপা টিপটপ রাখতে চায় তার ফ্ল্যাটকে। মুছে ফেলতে চায় ওলাইচণ্ডীতলার ধূসর বিবর্ণ অতীতকে। সুপ্রিয়র মধ্যবিত্ত মানসিকতা এত উচ্চতার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে বারবার হোঁচট খায় কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করে মানিয়ে নেবার, 'সুখী' হবার। সারাদিন গৃহপ্রবেশের

ঝামেলার শেষে সারাটা রাত তারা জেগে উপভোগ করতে চায় নিজেদের এই 'সাফল্য'কে। দশ লাখের ফ্ল্যাট তারা জোগাড় করতে পেরেছে মাত্র এক লাখ পঁচাত্তরে। রূপা অবশ্য মান নষ্ট হবার ভয়ে সকলকে দশ লাখই বলেছে। কোচিং সেন্টারের শিক্ষক এত টাকা কোথায় পায় সে প্রশ্নের উত্তর দেবার ভারও সেই নিয়েছে। একমাত্র বাথরুমের সামান্য ফাটলটা ছাড়া আর কোনো খুঁত নেই এই ফ্ল্যাটে, যেখান থেকে গলা বাড়িয়ে আকাশকে চুমু খাওয়া যায়। খুশির রাত কাটছিল ভালোই — কিন্তু রাত বারোটায় হঠাৎ গোল বাঁধালো অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির পাঠানো বিশাল রক্তগোলাপের ঝাড়। পাশের ফ্ল্যাটের মাতাল প্রতিবেশীর হাত দিয়ে পাঠানো সেই ফুলের তোড়ায় শুভেচ্ছা কার্ডে লেখা আছে ঃ ''রূপা ... রুপু ... সোনারুপো তোমার গৃহপ্রবেশে অভিনন্দন। আমাকে ভুলে যেয়ো না। ইতি তোমারই ডট ডট ডট ...''[১০৭] কে হতে পারে এই লোকটি ? শুরু হয় অনুমান। আর একে একে প্রকাশিত হতে থাকে ওপরে ওঠার পঙ্কিল সিঁড়িগুলি। সে কি নির্মাল্য ব্যানার্জী, যে বহুতলের কো-অপারেটিভে রূপাকে কৌশলে ঢুকিয়ে দিয়েছিল মৃত কেশব সাহার জায়গায় এবং আশি সালের দামে পঁচানব্বইয়ে ফ্ল্যাট পেতে সাহায্য করেছিল এবং বিনিময়ে নিজের গাড়িতে বসিয়ে রূপার পায়ের পাতায় চাপ দিয়েছিল ? অথবা সে হিরন্ময় সেন, যে রূপার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী হবার সুবাদে অনেক গলদ থাকা সত্ত্বেও এই অট্টালিকার প্ল্যান পাশ করে দিয়েছিল এবং বিনিময়ে তার বুকে মাথা রেখে প্রতিদান দিতে যাওয়ায় রূপাকে অপমান করে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছিল ? অথবা সে এই বহুতলের প্রমোটার চঞ্চল রায়, যে আশি সালের দামে পঁচানব্বইয়ে ফ্ল্যাট দিয়েছে বলে গায়ে পড়ে বন্ধুত্ব ফলাতে আসে এবং যে বিল্ডিং মেটেরিয়ালে কতটা ভেজাল দিয়েছে তা রূপা জানে ? অথবা সে পাড়ার নেতা দেবজিত ঘোষ, যে সবার কাছ থেকে ইলেকশানের চাঁদা বাবদ দশ হাজার টাকা করে নিলেও রূপাকে ছাড় দিয়েছে এবং সেই সুবাদে যখন-তখন রূপার নতুন ফ্ল্যাটে হানা দেবে বলেও জানিয়ে রেখেছে ? মনোজ মিত্র একে একে দেখিয়েছেন, ওপরে উঠতে হলে মানুষকে কত কদর্য পথ অতিক্রম করতে হয়। দেবজিত পর্যন্ত এসে ভেঙে পড়ে সুপ্রিয়। তার মনে হতে থাকে, দেবজিৎ 'সব' জানে বলেই বোধহয় এভাবে তাকে না ভোলার হুমকি দিয়েছে। কী জানতে পারে দেবজিত? জানতে পারে সেই ভয়ঙ্কর কুৎসিত সংবাদ — মিষ্টার ধানুকা সুপ্রিয়কে দু'লাখ টাকা ধার হিসেবে দেন নি — সুপ্রিয় দু'লাখ টাকায় বিক্রি করেছে মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র, সে জড়িয়ে পড়েছে প্রশ্ন ফাঁস চক্রের সঙ্গে, মনোজ মিত্র এখানে মিলিয়ে দিয়েছেন বহুতলের সঙ্গে মানুষকে। উভয় ক্ষেত্রেই ভিত রচনায় রয়ে যাচ্ছে চূড়ান্ত ফাঁকি। ওপরে উঠতে গেলে, আকাশে চুম্বন এঁকে দিতে গেলে যে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়ানো দরকার তা ভুলে যাচ্ছে মানুষ। ফাঁকি দিয়ে ওপরে উঠতে চাইছে। শিক্ষক পিতার শিক্ষক সন্তান জড়িয়ে পড়েছে প্রশ্ন ফাঁস চক্রে, শুধু ওপরে ওঠার লোভে। এই লোভ থেকে নিষ্কৃতি কোথায়, এই অনির্বাণ আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি কোথায় ? দুর্বল ভিতের এই ইমারত টিঁকতে পারে না — মানুষের ক্ষেত্রেও না, বহুতলের ক্ষেত্রেও না। কিন্তু স্বভাবত সহানুভূতিপ্রবণ মনোজ মিত্র মানুষকে আর একটা সুযোগ সবসময়

দিতে চান। তাই ভেতরে যখন চূড়ান্ত ভাঙচুর শুরু হয়েছে রূপা-সুপ্রিয়র, যখন দুলে উঠছে তাদের অট্টালিকা, তখন তিনি দেখান, তাদের বিল্ডিং নয়, ভেঙে পড়ছে তার কাছেই আর একটা বিল্ডিং, এটাও যে ভাঙবে তারই ইঙ্গিত দিয়ে। মানুষের ভেতরকার ভাঙন তুলে ধরে বেদনার্ত মনোজ মিত্র তার প্রতিকার চান বলেই বাঁচিয়ে রাখেন রূপা-সুপ্রিয়কে — তবে তাদের বাঁচতে হবে প্রতি মুহূর্তে আতঙ্ককে সঙ্গী করে।

নাট্যকার মনোজ মিত্র অনেকসময় রাজনৈতিক ভন্ডামি, রাষ্ট্রিক বিশৃঙ্খলা প্রভৃতির প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপের তীক্ষ্ন শর সযত্নে সরিয়ে রেখে বিচরণ করেছেন স্নিগ্ধ মধুর পারিবারিক জীবনবৃত্তে। দৈনন্দিন জীবনের গড় মানুষের আপাত তুচ্ছ হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখকে মণি-মুক্তার মতো ব্যবহার করে অপূর্ব মালা রচনা করেছেন। পরিবার জীবনের দিকে তাকিয়ে তিনি লক্ষ্য করেছেন, সমাজ ও রাষ্ট্রের মতো এখানেও মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। আধুনিকতা মানুষের জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে কিন্তু তার ভেতরকার 'আমি' টিকে ধ্বস্ত, বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। স্বার্থপরতা আর আত্মকেন্দ্রিকতার বৃত্তে আটকে গেছে মানুষের বৃহত্তর সম্ভাবনা। বেদনার্ত চিত্তে মানুষের এই অধঃপতনকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন পরিবারের সীমায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশা হারান নি। মানুষের মধ্যেকার শুভবোধে তিনি বিশ্বাসী। তাই মানুষকে আর একটা সুযোগ তিনি দেন সংশোধনের। তাঁর নাটকে এই শুভবোধ কখনো প্রকাশিত হয় টোটনের (কেনারাম বেচারাম) মাধ্যমে, কখনো তাজেইয়ের মাধ্যমে (দম্পতি)। এই গুচ্ছের নাটকগুলিতে তিনি এমন সব মানুষের কথা বলেছেন যারা সংসারের কাছে বাতিল, অপ্রয়োজনীয়। এদের প্রতিই তাঁর সহানুভূতি। তিনি নিজেই এদের সম্পর্কে বলেছেন :

> "আমার বেশিরভাগ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রেরা কৃতী নয়, সমাজের গণ্যমান্য কেউকেটা নয়। অতিতুচ্ছ মানুষ, অসহায়, নির্বান্ধব, নির্জন, পরিবার বা সমাজ কেউ তাদের তোয়াক্কা করে না। মানুষ তাদের চায় না, তবু তারা মানুষের গললগ্ন হয়ে থাকতে চায়। যেমন পরবাসের গজমাধব, কেনারাম বেচারামের কেনারাম, রাজদর্শনের লম্বোদর ভট্ট বা পালিয়ে বেড়ায়-এর রূপচাঁদ।"[১০৮]

এই তালিকায় অনায়াসে যুক্ত করে নেওয়া যায় 'দম্পতি' বা 'মৃত্যুর চোখে জল'-এর দুই বৃদ্ধকে। বাংলা নাটকে যখন রক্তমাংসের মানুষের অভাব, তখন মনোজ মিত্র তাঁর এই গুচ্ছের নাটকে ফিরিয়ে আনলেন 'আলোছায়ার ঘেরা গভীর গোপন মানুষ'কে। এই মানুষেরা বিরাট কেউ নয়, কিন্তু তারা আমাদের পরিচিত জগৎ থেকে উঠে আসা। এই গুচ্ছের নাটকে বারবার বৃদ্ধদের কথা বলে, পুরনোর সঙ্গে নতুনের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য দ্বন্দ্বে পুরনোর পক্ষাবলম্বন করে মনোজ মিত্র ঐতিহ্যের সংরক্ষণ চান, পারিবারিক ক্ষেত্রে মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চান। কিন্তু ঐতিহ্যের বিলুপ্তি বা রূপান্তর যে অনিবার্য তা দেখাতেও ভোলেন না 'শোভাযাত্রা'র মতো নাটকে। তারাশঙ্করের মতোই বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস আছে তার পুরনোর জন্য কিন্তু তার অনিবার্য বিবর্তনকে তিনি স্পষ্টই তুলে ধরেন। 'শোভাযাত্রা' নাটকে যে পরিবার তা বাংলাদেশের একটি লুপ্তপ্রায় শ্রেণীর প্রতিনিধি। পারিবারিক নাটক থেকে তাই এই নাটক সামাজিক অভিধার

দিকে এগিয়েছে। 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'য় তিনি আধুনিক নাগরিক এক পরিবারের কথা বলেছেন যেখানে 'ঝড়ো দুনিয়ার একঝলক হাওয়া' ঢুকে পড়েছে। এই গুচ্ছের নাটকে মনোজ মিত্র ক্রোধী নন, বরং সহানুভূতিশীল। সেই সহানুভূতির স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয় না, এমনকি দেবাহুতির মতো নারী বা 'দম্পতি' নাটকের স্বার্থপর বড়খোকা-ছোটখোকাও। তবে ক্রোধ একেবারেই নেই এমন নয়, মরালী-কেষ্টদুলালকে নিয়ে বেণীর ঠাট্টার জবাবে মনোজের প্রচন্ড রাগ প্রকাশ পেয়েছে মরালীর মাধ্যমে।

মনোজ মিত্রের পারিবারিক নাটকগুলির আলোচনায় সামগ্রিকভাবে দেখা গেল, নাট্যকার পুরনো দিনের 'পরিবার'-ধারণার ভাঙনে বেদনাহত । তিনি দেখেছেন, একান্নবর্তী পরিবারগুলি ক্রমশ ভেঙে চলেছে । কোথাও কোথাও আমি, আমার স্ত্রী এবং আমার সন্তানের সঙ্গে বাবা কিংবা মা , অথবা উভয়েই - আছেন হয়তো, কিন্তু সে থাকা নিতান্ত অনাদরের এবং অবহেলার । পারিবারিক বৃত্তে একাধিক মানুষের উপস্থিতি যে মানসিক স্বস্তি দিত একসময়, তা রূপান্তরিত হয়ে সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে গেছে । পরিবারে কোনো মানুষের উপস্থিতির মূল্য এখন নির্ণীত হয় তার প্রয়োজনসাধনের ক্ষমতার দ্বারা । এই মূল্যমান নির্ণীত হবার ফলে সবচেয়ে বিড়ম্বনা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের । কারণ তাদের উপার্জন নেই এবং কাজ করার ক্ষমতা নেই । আধুনিক মানুষ ক্রমশ ওপরে উঠতে চায় । সেই ওপরে ওঠার পথে যেমন অনেক পাঁক মাড়াতে হয়, তেমনি অনেক কিছু বর্জনও করতে হয় । বর্জনের তালিকায় প্রথম বস্তুটিই হ'ল আবেগ । তাই গুলাইচন্ডীতলার এঁদো গলির বাড়ি ছেড়ে অভিজাত এলাকায় সাত তলার ফ্ল্যাটে উঠে আসে রূপা-সুপ্রিয়, উঠে আসে জীবনকে নির্জনে উপভোগ করতে ('আকাশচুম্বন') ; পাঞ্চালী অর্পণকে ডিপ্রেসন থেকে বাঁচাতে বেহালার আদিবাড়িতে যেতে দেয় না ('আত্মগোপন') ; ছেলেরা বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে টাকা ভাগ করে নিতে তৎপর হয়ে ওঠে ('দম্পতি') । এইসব কারণে পরিবারগুলির মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিরন্তর অতৃপ্তিবোধ, মানুষ ক্রমশ হয়েছে সংকীর্ণ । 'আমরা'র পরিবর্তে প্রাধান্য পেয়েছে 'আমি' । নিজে সুখে থাকব, নিজে ভোগ করব - এই ধারণা থেকেই মানুষ ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, নি:সঙ্গ হয়েছে । এই ভোগবাদের পাশাপাশি আবার সামাজিক কিছু সমস্যাও পরিবার-জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে । যেমন, র‍্যাগিং বা শহরে আশ্রয়ের সমস্যা । মনোজ মিত্র তাঁর পারিবারিক বর্গের নাটকগুলিতে মূলত এই সমস্যাগুলিকেই তুলে ধরেছেন । তিনি দেখেছেন, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পারিবারিক মানুষ ক্রমশ অধ:পতিত হচ্ছে । আত্মকেন্দ্রিকতার বৃত্তটি ক্রমশ ছোটো হতে হতে তার অস্তিত্বকেই গ্রাস করছে । এই অবনমন থেকে পরিবার এবং পারিবারিক মানুষকে রক্ষা করতে চান মনোজ মিত্র । তাই তাঁর নাটকে উপস্থিত হয় টোটন ('কেনারাম বেচারাম'), জিতেনবাবু ('দম্পতি'), অলকানন্দা ('অলকানন্দার পুত্রকন্যা'),

শ্যামা ('পাখি'), মরালী ('টাপুর টুপুর'), আঁখি ('আঁখিপল্লব')-র মতো চরিত্র। এই চরিত্রদের মাধ্যমেই নাট্যকার বুঝিয়ে দিতে চান, পরিবারে স্নেহ-মায়া-মমতা-শ্রদ্ধার সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটেনি। সহমর্মিতা বা সহানুভূতির বোধ এখনো লুপ্ত হয়ে যায় নি। মানুষকে এই বিশ্বাসবোধে স্থিত করার দিকেই মনোজ মিত্রের পারিবারিক নাটকগুলির অভিযাত্রা। এই অভিযাত্রায় জিতেনবাবুর মতো বন্ধু কতটা বাস্তব, সে প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু নাটকের শর্ত রক্ষা করে তিনি এই চরিত্রগুলিকে এমনভাবে উপস্থাপিত করেন যে, তাঁদের বাস্তব বলেই প্রতীতি জন্মে। আসল কথা, মনুষ্যত্ব এবং মানবতার পরাভব দেখাতে চান না তিনি। তাই পারিবারিক ক্ষেত্রে মানবিকতা ও মূল্যবোধের পুন:প্রতিষ্ঠাতেই তাঁর আন্তরিক প্রয়াস।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) বাঞ্ছারাম ঃ থিয়েটারে সিনেমায় - মনোজ মিত্র - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ-মাঘ ১৪০৬, পৃ.২০

২) ঐ, পৃ.২০

৩) কেনারাম বেচারাম - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ-মাঘ ১৪০৩, পৃ.১১১

৪) ঐ, পৃ. ১২২

৫) ঐ, পৃ. ১২২

৬) ঐ, পৃ. ১৩৪

৭) ঐ, পৃ. ১৩৯

৮) ঐ, পৃ. ১৪৫

৯) ঐ, পৃ. ১৪৬

১০) ঐ, পৃ. ১৪৭

১১) ঐ, পৃ. ১৫২

১২) ঐ, পৃ. ১৫২

১৩) ঐ, পৃ. ১১৮

১৪) ঐ, পৃ. ১১৮

১৫) ঐ, পৃ. ১২৪

১৬) ঐ, পৃ. ১২৪

১৭) ঐ, পৃ. ১৫০-৫১

১৮) ঐ, পৃ. ১৫০

১৯) ঐ, পৃ. ১৫১

২০) ঐ, পৃ. ১৫১

২১) ঐ, পৃ. ১৪৫

২২) ঐ, পৃ. ১৪০

২৩) ঐ, পৃ. ১০৪

২৪) ঐ, পৃ. ১১৪

২৫) ঐ, পৃ. ১১৪

২৬) ঐ, পৃ. ১৩৭

২৭) ঐ, পৃ. ১৩৮

২৮) পরবাস - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড - পৃ. ২০৪

২৯) ঐ, পৃ. ২১১

৩০) ঐ, পৃ. ২১২

৩১) ঐ, পৃ. ২৪৩

৩২) প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়কে লেখা বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের চিঠি

৩৩) পরবাস - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড - পৃ. ২০৩

৩৪) ঐ, পৃ. ২১২

৩৫) ঐ, পৃ. ২১৫

৩৬) ঐ, পৃ. ২২০

৩৭) ঐ, পৃ. ২২২

৩৮) ঐ, পৃ. ২৩৫

৩৯) ঐ, পৃ. ২৪২

৪০) প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়কে লেখা বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের চিঠি

৪১) দম্পতি - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ-মাঘ ১৪০২, পৃ.

৪২) ঐ, পৃ. ২২২

৪৩) ঐ, পৃ. ২২৩

৪৪) ঐ, পৃ. ২২৩

৪৫) ঐ, পৃ. ২১৫

৪৬) ঐ, পৃ. ২১৬

৪৭) ঐ, পৃ. ২২১

৪৮) ঐ, পৃ. ২১৩

৪৯) নাটককার মনোজ মিত্র ঃ জনপ্রিয়তার দুই দশক - সৌমিত্র বসু - স্যাস ১৯৯৩, পৃ. ৮৯

৫০) পালিয়ে বেড়ায় - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ- 'রাসপূর্ণিমা', কার্তিক ১৪১০,প্রথম প্রকাশ- 'রাসপূর্ণিমা', কার্তিক ১৪১০, পৃ.৬৩

৫১) ঐ, পৃ. ৯৭

৫২) ঐ, পৃ. ১০৪

৫৩) কিছু লোক কিছু নাটক - মনোজ মিত্র - বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ - সৃষ্টি প্রকাশন, কোলকাতা-০৯, পৃ. ১৩

৫৪) মৃত্যুর চোখে জল - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ৩৪২

৫৫) ঐ, পৃ. ৩৫০

৫৬) ঐ, পৃ. ৩৫৩-৫৪

৫৭) ঐ, পৃ. ৩৫৪

৫৮) ঐ, পৃ. ৩৪২

৫৯) ঐ, পৃ. ৩৪৮

৬০) ঐ, পৃ. ৩৫২

৬১) ঐ, পৃ. ৩৪৪

৬২) মনোজের মনোভূমি ঃ কুমার রায় - স্যাস - ১৯৯০, পৃ. ৩৫৫

৬৩) নাটককার মনোজ মিত্র ঃ জনপ্রিয়তার দুই দশক - সৌমিত্র বসু - স্যাস ১৯৯৩, পৃ. ৯১

৬৪) নাট্যচিন্তা, প্রথম বর্ষ, নবম-দশম সংখ্যা, জুলাই - আগস্ট ১৯৮২

৬৫) অলকানন্দার পুত্রকন্যা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ১৭৬

৬৬) ঐ, পৃ. ১৯৯

৬৭) নাটককার মনোজ মিত্র ঃ জনপ্রিয়তার দুই দশক - সৌমিত্র বসু - স্যাস্ ১৯৯৩, পৃ. ৯১

৬৮) অলকানন্দার পুত্রকন্যা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ১৬৪

৬৯ ঐ, পৃ. ১৭৯

৭০) ঐ, পৃ. ১৯৮

৭১) Man of the Match - Dharani Ghosh - The Statesman - ১৩.১.১৯৯০

৭২) অলকানন্দার পুত্রকন্যায় চিত্রা সেন অত্যন্ত সাবলীল - বিষ্ণু বসু - গণশক্তি - ১৬ জানুয়ারি, ১৯৯০

৭৩) অলকানন্দার পুত্রকন্যা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ১৮৯

৭৪) দুই বাংলার দুই নাটকে নারী মহিমা - শিখা বসু - যুগান্তর

৭৫) শোভাযাত্রা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ. ২২

৭৬) ঐ, পৃ. ২৪

৭৭) ঐ, পৃ. ৩৩

৭৮) ঐ, পৃ. ৩৯

৭৯) ঐ, পৃ. ৫২

৮০) কিছু লোক কিছু নাটক - মনোজ মিত্র - বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ, পৃ.১৬

৮১) ঐ, পৃ. ১৬

৮২) শোভাযাত্রা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড - মিত্র ও ঘোষ - কোলকাতা, পৃ. ৩৪

৮৩) ঐ, পৃ. ৪৪

৮৪) ঐ, পৃ. ৪১

৮৫) ঐ, পৃ. ৪৯

৮৬) শূন্য রথে বসে আছি ঃ শোভাযাত্রা - সমরেশ মজুমদার - দেশ - ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২

৮৭) একটি চমৎকার নাট্য-অভিজ্ঞতা - অশোক মুখোপাধ্যায় - আনন্দবাজার পত্রিকা - ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯১

৮৮) ঐ

৮৯) মনোজের মনোভূমি ঃ কুমার রায় - স্যাস্ - ১৯৯০, পৃ.৩৫৫

৯০) পাখি - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ৪২৩

৯১) ঐ, পৃ. ৪৩৬

৯২) ঐ, পৃ. ৪৪০

৯৩) ঐ, পৃ. ৪৪০

৯৪) টাপুর টুপুর - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৩৫১

৯৫) ঐ, পৃ. ৩৬৬

৯৬) ঐ, পৃ. ৩৬৬

৯৭) ঐ, পৃ. ৩৬৬

৯৮) আঁখিপল্লব - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ. ৩৭৮

৯৯) ঐ, পৃ. ৩৮৫

১০০) ঐ, পৃ. ৩৯২

১০১) ঐ, পৃ. ৩৮৯

১০২) ঐ, পৃ. ৩৯৬

১০৩) ঐ, পৃ. ৩৯৬

১০৪) সন্ধ্যাতারা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৩৪৭

১০৫) স্মৃতিসুধা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ. ২৬৭

১০৬) ঐ, পৃ. ২৬৪

১০৭) আকাশচুম্বন - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - চতুর্থ খন্ড, পৃ. ২৮১

১০৮) কিছু লোক কিছু নাটক - মনোজ মিত্র - বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ, পৃ. ১৬

রাজনৈতিক প্রসঙ্গযুক্ত নাটক

বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রচার, কোনো সমস্যাকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করে বিশেষ মতাদর্শ -অনুসারী সমাধানের ইঙ্গিত, কোনো রাজনৈতিক তত্ত্বকে আক্রমণ করে বিকল্প তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বা বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি তুলে ধরা এবং আক্রমণ করা হয় যে নাটকে তাকে বলা হয় 'রাজনৈতিক নাটক'। বাংলা নাটকে রাজনীতি-চেতানর স্পষ্ট প্রকাশ যদিও বিশ শতকের তিরিশের দশকের শেষ দিক থেকে, কিন্তু এর পূর্ব সূত্র নিহিত আছে আরো অনেক আগে লেখা কিছু কিছু নাটকে। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে রচিত 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রথম পরিচয় সামাজিক ট্রাজেডি হিসেবে হ'লেও রাজনৈতিক নাটক হয়ে ওঠার প্রবণতা এবং সম্ভাবনা এই নাটকে ছিল। নীলকরদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জেলায় যে প্রবল বিক্ষোভ এবং লড়াই সংগঠিত হয়েছিল, তার প্রভাব পড়েছে এই নাটকে। এই নাটক বাঙালি জাতিকে প্রথম জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে। নীলকরদের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে শিক্ষিত বাঙালি সমাজ কীরকম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ হিসেবে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি উদ্ধার করা যেতে পারে ঃ

> "হঠাৎ যেন বঙ্গসমাজ ক্ষেত্রে উল্কাপাত হইল; এ নাটক কোথা হইতে কে প্রকাশ করিল, কিছুই জানা গেল না। 'নীলদর্পণ' আমাদিগকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল; তোরাপ আমাদের ভালোবাসা কাড়িয়া লইল; ক্ষেত্রমণির দুঃখে আমাদের রক্ত গরম হইয়া গেল; মনে হইতে লাগিল রোগ সাহেবকে যদি একবার পাই, অন্য অস্ত্র না পাইলে যেন দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া খন্ড খন্ড করিতে পারি।"[১]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই নাটককে বাংলার 'Uncle Tom's Cabin' বলেছিলেন। কারণ ঃ " 'টমকাকার কুটীর' আমেরিকার কাফ্রীদের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে। 'নীলদর্পণ' নীলদাসদিগের দাসত্বমোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে।"[২] সমকালীন সমাজে নীলকরদের বিরুদ্ধে যে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ দেখা গিয়েছিল, দীনবন্ধু তাঁর নাটকে সরাসরি সেই প্রতিরোধের চিত্র আঁকেন নি, কিন্তু ব্যক্তির সমস্যার পরিবর্তে সামগ্রিকভাবে কৃষকসমাজের সমস্যাকেই উপস্থাপিত করেছেন প্রতিনিধিস্থানীয় পরিবারগুলির মধ্য দিয়ে। অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত শ্রেণির স্পষ্ট বিভাজনও এই নাটকে লক্ষণীয়। শ্রেণিদ্বন্দ্বের প্রথম বাংলা নাটকও তাই বলা চলে 'নীলদর্পণ'কে। এই নাটকের রাজনৈতিক সম্ভাবনার ইঙ্গিতটি স্পষ্ট হয়েছে সমালোচকের উক্তিতে ঃ

> "এই নীলদর্পণ নাটক রচনারই মধ্য দিয়ে তিনি হয়তো সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই এই অমোঘ ঐতিহাসিক সত্যটাকেও প্রমাণ করে গিয়েছেন যে, শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামী চেতনার শরীক হতে না পারলে মধ্যবিত্তের সংগ্রামী চেতনাও কখনও সার্থক ও সাবয়ব রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না।"[৩]

অর্থাৎ রাজনৈতিক নাটক রচনা দীনবন্ধু মিত্রের সচেতন প্রয়াস না হ'লেও এই নাটক যেভাবে সমাজ-জাগরণের প্রেক্ষাপট প্রস্তুত করেছে, তাতে এর রাজনৈতিক সম্ভাবনাই স্পষ্ট হয়েছে। এই নাটকে শোষণ-বিরোধী আধুনিক মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন গবেষক ঃ

> "সমাজের বৃহত্তর পটভূমিতে জীবনকে দাঁড় করিয়ে 'নীলদর্পণ' নাটকে একটা কালের একটা ব্যাপক সমাজের জীবনতরঙ্গকে নাটকে মূর্ত করে তুললেন। ইংরেজের ঔপনিবেশিক শাসন ও

শোষণের ভয়ঙ্কর দানবমূর্তি, নীলচাষের ফলে কৃষিকেন্দ্রিক বাংলার অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সাধারণ মানুষের দুর্দশা, নিষ্করুণ অসহায়তা, দুর্বিষহ অত্যাচারের ক্ষুব্ধতা 'নীলদর্পণ' নাটককে গণবিক্ষোভের অনুভূতি সঞ্চার করেছিল।''[৪]

যদিও তখন পর্যন্ত অর্থনৈতিক শোষণের স্বরূপ আবিষ্কার হয়নি এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন স্পষ্ট কোন দিশা পায় নি তবু এই নাটক ঃ ''বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতে এবং স্বাজাত্যবোধ ও জাতীয় চেতনা জাগিয়ে তুলতে একটি প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।''[৫]

পরাধীন ভারতবর্ষে ইতিহাসের আশ্রয়ে সমকালীন রাজনৈতিক চেতনাকে প্রকাশ করেছেন একাধিক নাট্যকার। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রনাথ দাস, প্রমথনাথ মিত্র, উমেশচন্দ্র গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ। এঁদের নাটকে রাজনীতি এসেছে স্বাদেশিকতার সূত্রে। রবীন্দ্রনাথের নাটকে রাজনীতি এসেছে অন্যভাবে। 'মুক্তধারা' বা 'রক্তকরবী'র মতো নাটকে তিনি রূপক এবং সংকেতের সাহায্যে উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করেছেন। যন্ত্রসভ্যতা এবং ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

প্রকৃত অর্থে বাংলা রাজনৈতিক নাটকের সূচনা হ'ল ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা (১৯৪৩) থেকে। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির আদর্শে প্রভাবিত এই সংঘের নাটকে রাজনীতি-চেতনা বিশেষভাবে প্রাধান্য পেতে থাকল। এই সময় থেকে বাংলা নাটকের বিষয়বস্তুর পরিবর্তনকে চিহ্নিত করেছেন বিশিষ্ট গবেষক ঃ

'' 'গণ' শব্দটি প্রকাশ করল সাধারণ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা এবং তাদের বাঁচার দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী রূপকে। বাংলা নাটকে গণচেতনা এরূপ বিকাশ লাভ করেছে চল্লিশ দশকে। বাংলা নাটক সরে এল অপজাত, অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়, নিম্নগত ও মধ্যবিত্তের সংসারে। গণচেতনার পথেই এসেছে বাংলা নাটকের মুক্তি। ... ধনবন্টনের বৈষম্য, সর্বব্যাপী শোষণ ও বঞ্চনা, সাম্যবাদের চৌম্বক আকর্ষণে নাটকের পাত্র-পাত্রী বদল হ'ল। শ্রমিক, মজুর, কৃষক ব্রাত্যদের আগমনে নবরূপে রূপ পেল বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ। ... মন্বন্তর, মহামারী আর বন্যায় ভেসে গেছে বাংলা নাটকের পূর্ব পটভূমি, ঘটনা, বিষয়বস্তু, চরিত্র, আঙ্গিক, সংলাপ — সব রূপান্তরিত হয়ে গেছে এক নিমেষে। বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন'-এ তার পটভূমি।''[৬]

সাধারণ মানুষের দুঃখ, দারিদ্র্য, বঞ্চনার পরিচয়, তার কারণ নির্ণয় এবং বামপন্থী মতাদর্শ অনুসারে, অর্থাৎ সংঘশক্তির জাগরণের মধ্য দিয়ে সংকট থেকে উত্তরণের কথা বলা হতে থাকল গণনাট্যের নাটকে। নাটকের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষকে আনন্দ দান করা এবং দুঃখের মধ্যেও আশাবাদ ধ্বনিত করে তোলা ছিল গণনাট্যের উদ্দেশ্য।

গণনাট্য সংঘের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল 'শিল্পের সঙ্গে রাজনীতির ঐক্য', কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, কিছুদিনের মধ্যেই রাজনীতির অতি-প্রাধান্যের কারণে শিল্পরূপ উপেক্ষিত হতে থাকল। সংঘনাটকে একঘেয়েমি সৃষ্টি হ'ল। সংঘে ভাঙন সৃষ্টি হ'ল রাজনীতি এবং শিল্পবোধের প্রাধান্যের প্রশ্নে দ্বন্দ্বের কারণে। ১৯৫০ সালে 'বহুরূপী'র প্রতিষ্ঠা তারই ফল। এখান থেকেই নবনাট্য ধারার সূচনা ধরা হয়ে

থাকে। চল্লিশের দশকের তুলনায় ষাটের দশকের বাংলা নাটকের পার্থক্য আলোচনা প্রসঙ্গে এই পরিবর্তনটিকে চিহ্নিত করেছেন সমালোচক :

"চল্লিশের দশকের নাটকে সমাজতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদের আদর্শ প্রচার এবং মানুষকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করাই ছিল ঘোষিত নীতি। কিন্তু ষাট দশকের নাট্যকারেরা সমাজবাস্তবের স্থূলতা পরিহার করে সূক্ষ্মতার দিকে ঝুঁকলেন। বক্তব্যকে করতে চাইলেন অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য এবং নাটকের অবয়বে আনতে চাইলেন অধিকতর শিল্পসুষমা। গতানুগতিকতাকে বর্জন করে নতুন কথা নতুনভাবে বলার জন্য এক নব পর্যায়ের নাট্য আন্দোলন শুরু করলেন।"[৭]

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এই সময় 'শ্রেণী সংগ্রামের সর্বোৎকৃষ্ট কাল' হওয়া সত্ত্বেও কেন রাজনৈতিক নাটক সেভাবে লেখা হ'ল না, তার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

"সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর অভাবে ট্রেড-ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের আস্থা সৃষ্টি করতে পারে নি। শ্রমিক আন্দোলনের ব্যর্থতা, দারিদ্র্য, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, জীবন ও জীবিকার সমস্যা, সুবিধাবাদী মনোভাব, মার্কসবাদ এবং সমাজতন্ত্র সম্পর্কে অস্পষ্ট জ্ঞান প্রভৃতির জন্য শ্রেণীসংগ্রাম সর্বসাধারণের বিশ্বাস হারিয়ে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে। বিশ্বাসহীনতার মাটিতে অঙ্কুরিত হয়নি শ্রেণীসংগ্রামের বীজ। শ্রেণীসংঘাতের চেয়ে মননের সংকট অধিক গুরুত্ব পেয়েছে।"[৮]

এই যুগের নাট্যকারেরা গণনাট্যের আদর্শবাদকে স্বীকার করে নিয়েও নাটককে একটি সম্পূর্ণ শিল্পকর্ম হিসেবে গড়ে তোলার দিকে জোর দিলেন। মানুষের শ্রেণিপরিচয়কে অস্বীকার না করেও ব্যক্তিমানুষের স্বরূপ উন্মোচনে প্রয়াসী হলেন। বাংলা নাটকের ভূগোল এই সময় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে :

"সর্বস্তরের এবং সর্বশ্রেণীর মানুষ এসেছে নাটকে। জীবিকা ও বৃত্তি তাদের বিবিধ। বিবিধ ধর্ম ও সম্প্রদায় এবং অঞ্চলের মানুষ তারা। এর ফলে, বাংলা নাটকে মহাকাব্যীয় জীবনের বিস্তার ঘটেছে। আবিষ্কৃত হয়েছে নতুন জনপদ, মানুষ ও জীবন।"[৯]

মনে রাখতে হবে, এই নবনাট্যের নাটকেও রাজনৈতিক চেতনা উপস্থিত ছিল। সেই চেতনার দিক থেকে নবনাট্য ধারা গণনাট্যেরই উত্তরসূরী, অর্থাৎ বামপন্থার দিকেই তার প্রধান ঝোঁক।

বাংলা নাটক ও থিয়েটারে যখন গণনাট্যের রাজনৈতিক আদর্শের দিকটিকে উচ্চগ্রামে প্রকাশ করছেন উৎপল দত্ত এবং তার শৈল্পিক সূক্ষ্মতার দিকটি প্রকাশ পাচ্ছে শম্ভু মিত্রের মধ্যে, তখন, বিষ শতকের পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে, নাট্যকার হিসেবে মনোজ মিত্রের আবির্ভাব। সেই সময়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি নিজেই লিখেছেন : "সময়টাই ছিল ক্রুদ্ধ, ক্ষুধার্ত, প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতায় সংকল্পবদ্ধ। জন্ম নিচ্ছিল নতুন থিয়েটার, নব নাট্য।"[১০] ক্রুদ্ধ, ক্ষুধার্ত সেই সময়ে মনোজ মিত্রের নাট্য রচনার শুরু কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতির উত্তাপ তাঁর নাটকে সেভাবে নেই। ব্যক্তিগত জীবনে নিজের রাজনৈতিক বোধ ও আদর্শ সম্বন্ধে মনোজ বলেছেন :

"আমি যখন নাটক করতে আসি তখন আমার সঙ্গে রাজনীতির কোনো যোগাযোগ ছিলনা। ছাত্র-রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলাম না। ... তবে হ্যাঁ, একথা তো ঠিক আজকে আমার একটা বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাস আছে। আমার নাটকেও তা প্রতিফলিত হয়। ... আমি নিজে রাজনীতির সঙ্গে যতটা যুক্ত, আমার নাটকও রাজনীতির সঙ্গে ঠিক ততটাই যুক্ত। আমি রাজনীতি থেকে

> যতখানি দূরে, আমার নাটকও ঠিক ততখানিই দূরে। তবে এটাতো ঠিকই, একজন মানুষ যখন নাটক লিখবেন বা করবেন, তখন তার সামাজিক, রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা নাটকে প্রতিফলিত হবেই। সেটা সোচ্চারেই হোক কিংবা গোপনেই হোক।"[১১]

তবে মতবাদে আস্থা থাকলেও দলীয় রাজনীতিতে তাঁর আস্থা নেই। বরং সাধারণভাবে রাজনৈতিক ভণ্ডামি এবং কাপট্যের বিরুদ্ধে তিনি সরব হয়েছেন। নির্দিষ্ট কোনো দলীয় রাজনীতির কাছে আনুগত্য বাঁধা দেন নি বলে তাঁর দৃষ্টি অনেক বেশি স্বচ্ছ। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ঃ " নাটকে আমি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতাকে পাঠক বা দর্শকের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে চাই। কোনো বক্তব্য চাপাতে চাই না। "[১২] এই বাস্তব অভিজ্ঞতাকে যথেষ্ট শিল্পিত রূপে সমগ্র নাট্যকর্ম হিসেবে উপস্থিত করাই মনোজের লক্ষ্য। তা করতে গিয়ে পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং রাজনীতির বহুতর ত্রুটি-বিচ্যুতি, যা তাঁর চোখে পড়েছে, তাকেই ব্যঙ্গের শরে বিদ্ধ করেছেন। রাজনীতির প্রতি এবং রাজনীতির সম্পর্কে মনোজের বক্তব্য এতটাই সাধারণীকৃত যে কালের ব্যবধানে তার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় সম্পূর্ণ বিপরীত রাজনীতির মানুষেরা। একদিন যাদের কাছে বাহবা জোটে, পরদিন দেখতে হয় তাদেরই চোখ-রাঙানি। এরকম অভিজ্ঞতার কথা মনোজ নিজেই জানিয়েছেন। ১৯৭৬ সালে প্রযোজিত 'চোখে-আঙুল দাদা' নাটক প্রযোজনার পর একদল মানুষ নাট্যকারকে বাহবা দিয়েছিলেন এই বলে যে, জরুরি অবস্থার বিরোধী মানুষকে নাটকে খুব জব্দ করা হয়েছে। আর একদলের কাছ থেকে জরুরি অবস্থার পক্ষে কলম ধরার জন্য ছিছিক্কার শুনতে হয়েছিল। দশ বছর পর ১৯৮৬ সালে একই নাটকের মঞ্চায়নের পর দুই দলের কাছে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। সেদিন যিনি বাহবা দিয়েছিলেন আজ তিনি গম্ভীর, আর ছিছিক্কার দিয়েছিলেন যিনি, তিনি আজ পিঠ চাপড়াচ্ছেন। মনোজ বলেছেন ঃ "প্রথমজনের গাম্ভীর্যের কারণ তিনি আজ বিরোধীপক্ষে, নিজেই ছিদ্রান্বেষী, দ্বিতীয়জনের উল্লাসের কারণ তিনি সরকারপক্ষে। ছিদ্রান্বেষীকে তিনি আজ সহ্যই করিতে পারেন না।"[১৩] কাশী এবং কোসলরাজের গল্প শুনিয়ে মনোজ বলেছেন ঃ " কাশীকোসলে কবে রেষারেষি কবে গাত্র শোঁকাশুঁকি তাল রাখিতে পারি না।"[১৪] তাই একদিন যে বাস্তব অভিজ্ঞতার উপস্থাপনা শিল্পীকে পুরস্কারে ভূষিত করে, দিনবদলের পর সেই অভিজ্ঞতাই তার ওপর খড়্গাঘাত নামিয়ে আনে। শিল্পীর এই উভয়সংকটই হতাশ মনোজকে দিয়ে বলিয়ে দেয় ঃ " ঘরানা বদল তাই বুঝি বুদ্ধিমানের কর্ম।"[১৫] মনোজ নিজে অবশ্য কোনোদিন কোনো ঘরানার আনুগত্য স্বীকার করেন নি, ফলে ঘরানা বদলের বিষয়টিও তাঁর ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। তিনি কেবল নিজের দেখাটাকে ভাগ করে নিয়েছেন পাঠক-দর্শকদের। তাঁর বিশ্বাস ঃ " আমি যে চোখে যা দেখেছি তাই দেখুন ওঁরা - তাহলেই আমি যা বুঝেছি - তাই বুঝবেন তাঁরা।"[১৬] এই দেখার দৃষ্টি মুক্ত বলেই সে দৃষ্টিতে রাজনীতি নির্বিশেষে যে কোনো শাসক তথা রাষ্ট্রব্যবস্থার ত্রুটি এবং অসঙ্গতি অনায়াসে ধরা পড়ে। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক উত্তাপ না ছড়িয়েও তাঁর নাটক উত্তীর্ণ হয়ে যায় রাজনৈতিক বোধে। প্রকৃত অর্থে মনোজের কোনো নাটককেই সেভাবে 'রাজনৈতিক' বলা যায় না, তবে সরাসরি রাজনীতির অনুষঙ্গ আছে এরকম কিছু নাটক তিনি লিখেছেন। এর মধ্যে দু'একটি serious ভঙ্গিতে রচিত, আর বাকি সবগুলিতেই রঙ্গ-ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যভেদের প্রয়াস। এই গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে 'নৈকড়ে' (১৯৬৮), 'চাক ভাঙা মধু' (১৯৬৯), 'শিবের অসাধ্যি' (১৯৭৪), 'নরক গুলজার' (১৯৭৪), 'চোখে আঙুল দাদা' (১৯৭৬), 'সত্যি ভূতের গপ্পো' (১৯৮১, 'মহাবিদ্যা' (১৯৮৬), 'টু-ইন-ওয়ান' (১৯৯১) নাটকগুলিকে।

১৯৬৮ সালে রচিত 'নেকড়ে' মনোজের অন্যান্য অনেক নাটকের তুলনায় দুর্বল সৃষ্টি, কিন্তু বক্তব্য প্রকাশের ভঙ্গীটি এখানে serious. পরের বছর লেখা 'চাক ভাঙা মধু'র মতো এই নাটকের পটভূমিও সুন্দরবন অঞ্চলের একটি দ্বীপ। অঞ্চলের ভূমিপুত্রদের শোষণ করে কীভাবে ফুলে-ফেঁপে ওঠে বহিরাগত শোষকশ্রেণি এবং শেষপর্যন্ত নিপীড়িত মানুষের জাগরণ ও প্রতিশোধ গ্রহণের মধ্য দিয়ে কীভাবে শোষকের পরাজয় ঘটে তাই এই নাটকের উপজীব্য। প্রত্যক্ষত কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের উল্লেখ না থাকলেও শোষণের বিরুদ্ধে সমবেত জনশক্তির প্রতিরোধের ইঙ্গিতে এবং নীহারি কর্তৃক জনতাকে সংঘবদ্ধ করার প্রয়াসের মধ্যে বিশেষ মতাদর্শের প্রভাবই লক্ষিত হয়।

প্রথম যৌবনে কংসারি ঠাকুর এসেছিল এই বাদা অঞ্চলে, এই দ্বীপে। দ্বীপের অধিবাসীরা তখন আদিম বন্য জীবন যাপন করে। মাছ ধরে, পশু-পাখি মেরে খায় আর এক ধরণের বুনো জ্বরে বেঘোরে প্রাণ দেয়। বিরাট ঐশ্বর্য গড়ার স্বপ্ন নিয়ে কংসারি ধীরে ধীরে ক্ষেতের পর ক্ষেত দখল করে নেয় বিনা মূল্যে বা অতি সামান্য মূল্যে। বনজঙ্গল সাফ করে চাষ আবাদ শুরু করে। ধান-কাঠ-মধু চালানের বিশাল ব্যবসা আজ তার। আজ সে দ্বীপের একচ্ছত্র অধিপতি। আক্রাম এবং গোঁসাই অর্থাৎ শক্তি ও ধর্ম তার আগ্রাসনের সহায়ক। দ্বীপের অন্য সবকিছুর সঙ্গে সঙ্গে কংসারি দখল করেছে নারীকেও, যে নারী ছিল অন্যের স্ত্রী। সেই নারী নীহারি যখন গর্ভবতী হয়ে পড়ে তখন সে কংসারির কাছে নিজের অনাগত সন্তানের অধিকার দাবী করে। কিন্তু যাদের মানুষ বলেই স্বীকার করে না কংসারি, তাদেরই একজনের গর্ভজাতকে কীভাবে দেবে উত্তরাধিকারীর সম্মান ? তাই নীহারিকে বিষাক্ত বুনো পাতার রস খাওয়ায় সে। গর্ভস্থ সন্তান মরে যায় না, কিন্তু জন্মায় এক অদ্ভুত আকৃতি নিয়ে। সারা দেহে লম্বা লম্বা চুল, হাতের তালু আর জিভ টকটকে লাল। সেই বীভৎস মাংসপিন্ডকে মেরে ফেলতে দিয়েছিল গোঁসাইকে। কিন্তু গোঁসাই তাকে মারতে পারেনি, ফেলে রেখে এসেছিল দক্ষিণের নোনা বিলে। এসব প্রায় কুড়ি বছর আগেকার কথা। কিন্তু গত কয়েক মাস যাবৎ অদ্ভুত এক আতঙ্ক অনুভব করছে কংসারি। সবসময়ই মনে হচ্ছে, কেউ তাকে অনুসরণ করছে। নিরুপদ্রব নির্ঝঞ্ঝাট যে জায়গায় মানুষকে চড় মারলে মাথা নীচু করে সহ্য করে সেখানে হঠাৎ একদিন রাতে কংসারির শোবার ঘরে প্রবেশ করে এক লোমশ জন্তু — মনে হয় নেকড়ে। অকুতোভয় কংসারি ক্রমে ভয় পেতে শুরু করে। তিল তিল করে যে ধন সঞ্চয় করেছে তার উত্তরাধিকার সঁপে দেবার জন্য ডাকিয়ে এনেছে ভাইপো শশাঙ্ককে। আর আশ্চর্যজনকভাবে তার পরই বেড়ে উঠেছে নেকড়ের অত্যাচার। একে একে কংসারির দুটি বুলডগ এবং তারপর আক্রাম নিহত হয় রহস্যময় নেকড়ের আক্রমণে। রক্তের দাগ যায় দক্ষিণের বিলমুখো। নানারকম চেষ্টাতেও ধরা যায় না নেকড়েকে। দ্বীপ তোলপাড় করে ফেলে কংসারি। কিন্তু রহস্যভেদ হয় না কিছুতেই। নীহারি যেদিন বাজায় তারের বাজনা সেদিন রাতেই আঘাত হানে নেকড়ে। এক অদ্ভুত আতঙ্কের পরিবেশ। সন্ধ্যার পর আর কেউ বাড়ির বাইরে বের হয় না। গোঁসাইয়ের নৈশ অভিসারেও বাধা পড়েছে। ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে কংসারি, বিশেষত আক্রামের মৃত্যু তাকে নাড়িয়ে দেয়। নিজের শেষ শক্তি জড়ো করে সে 'নেকড়ে' শিকার করতে চায়। নীহারি ইতিমধ্যে তাকে জানিয়েছে, দক্ষিণের বিলে ফেলে দেওয়া সেই ছেলে নেকড়ের দ্বারা প্রতিপালিত হয়ে লাভ করেছে নেকড়ের স্বভাব কিন্তু তার রয়ে গেছে মানুষের মস্তিষ্ক। পশুর শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের বুদ্ধি। কংসারি এবং শশাঙ্ককে হত্যা করে সে ছিনিয়ে নেবে নিজের

অধিকার। শশাঙ্ক প্রথমে এই দ্বীপে থাকতে চায়নি, কিন্তু ক্রমে সে এখানকার মোহে পড়েছে, এখানকার নারী সুখী নিজের পূর্বপ্রেমিক হুক্কাকে ভুলে 'দাদাবাবু' শশাঙ্ককে ভালোবাসে। কিন্তু শশাঙ্ক সুখীকে দেখে ভোগের নারী হিসেবেই। তাই অনায়াসেই ব্যবসায়ী ঘনশ্যামবাবুকে খুশি করতে সুখীকে ভেট দেয় সে। সুখী তখন ফুঁসে ওঠে। কাটারি হাতে রুখে দাঁড়ায়। গ্রামের নিরীহ মানুষগুলিও কেমন যেন বদলে যেতে থাকে। সকালবেলা একটা ক্ষুর দিয়ে মাথা চেঁচে দিলে, দুপুরবেলা তেল মাখতে গিয়ে যারা টের পেত, তারাই গোলায় ধান ঢোকার দিন গাড়ি আটকে দেয় খোরাকির দাবিতে। সচেতন হয়ে ওঠে তাদের প্রতি অনুষ্ঠিত দীর্ঘকালের বঞ্চনা সম্পর্কে। ধীরে ধীরে মুখ খুলতে শুরু করে। নিজেরই ঔরসজাত 'নেকড়ে' শিকার করতে যায় কংসারি দক্ষিণের বিলে, কিন্তু সেখানে মানুষের পায়ের ছাপ দেখে মনে সন্দেহ জাগে। এদিকে ততক্ষণে স্পষ্ট হয়েছে নেকড়ে-রহস্য। নীহারির সেই ছেলে জন্মের কিছুদিন পরই মারা গিয়েছিল। কিন্তু বঞ্চিতা, উপেক্ষিতা নারী নীহারি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সেই ছেলের নেকড়ে হয়ে ওঠার গল্পকে ব্যবহার করেছে। সে সংগঠিত করেছে বঞ্চিত মানুষদের। তারই নির্দেশে নেকড়ে সেজেছে মানুষ। একে একে কংসারিকে দুর্বল করে তুলেছে। একসময়ের প্রবল প্রতাপশালী কংসারি ভয়ে ক্রমশ কুঁজো হতে শুরু করেছে, অকাল-বার্ধক্য তাকে গ্রাস করেছে। সঞ্চিত ধন এবং অর্জিত সাম্রাজ্য হাতে তুলে দেবার জন্য সে দ্বীপে ডেকে এনেছে ভাইপো শশাঙ্ককে, সোনা বিক্রি করে দেবার জন্য ডেকেছে ব্যবসায়ী ঘনশ্যাম পালকে। গোঁসাই সোনার ভাগ চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। সে যোগ দিতে চেয়েছে নীহারির দলে। কিন্তু অত্যাচারীর প্রতি নীহারি নিষ্ঠুর ঃ

" মানুষগুলোরে চিৎ করে ফেলে লাথি ঝাড়ো, দেনার দায়ে বেঁধে ... মুখের ভাত ফেলে দে ... পেতলখানা পর্যন্ত কেড়ে আনো। ভুলে গেছি ? প্রেমচন্দর ! দ্বীপ ভাগ করতে আসো ! দ্বীপ তোমার বাপের —"[১৭] গোঁসাইয়েরও পরিণতি হয় আক্রামের মতোই। কংসারির সবগুলি ডানা ছাঁটা হয়ে যাবার পর ঘনিয়ে ওঠে শেষ লড়াইয়ের প্রস্তুতি। কংসারিও প্রস্তুত। সে জানে, যখনই দ্বীপের সম্পদ বাইরে পাচারের সম্ভবনা দেখা দেয়, যখনই অধিকারে ভাগ পড়তে যায় তখনই অবির্ভাব ঘটে নেকড়ের। পরদিন সকালেই ঘনশ্যামের হাতে তুলে দেওয়া হবে সোনা, সুতরাং আজ আসবেই নেকড়ে। সারা বাড়ি জাল দিয়ে ঘিরে এক বিরাট ঘন্টা টাঙানো হয়েছে। নেকড়ে ঢুকতে গেলেই জালে টান পড়বে, বেজে উঠবে ঘন্টা, তখন তাকে হত্যা করবে কংসারি। পথে বাঘের ভয়ের কথা বলে চাষীরা সন্ধের আগেই কংসারির বাড়ি ফাঁকা করে চলে গেছে। শশাঙ্ক বুঝতে পেরেছে, নীহারিই সবকিছুর মূলে। সে নীহারিকে গুলি করে মারতে চায়। কিন্তু কংসারির মধ্যে কোথায় যেন রয়ে গেছে নীহারির প্রতি দুর্বলতা। তাছাড়া বাদাবনের এক মেয়েকে শত্রুর মর্যাদা দিতেও তার বাধে। কংসারি যখন নেকড়ের জন্য একান্ত প্রতীক্ষায় — তখন উপস্থিত হয় নীহারি। তার 'সাজসজ্জায় আগুন জলছে। কপালে মস্ত সিঁদুরের টিপ'। পূর্বস্মৃতি জেগে ওঠে কংসারির। নীহারিকে সে আশ্লেষে জড়িয়ে ধরে, চুলে হাত বোলায়, কণ্ঠ শিথিল হয়ে পড়ে। একসময়ের উদ্দাম ভোগের স্মৃতি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে। তখন কংসারি জানায়, সেই নেকড়ে সন্তান আর বেঁচে নেই। সদ্য তাকে মাটিতে পুঁতে রেখে এসেছে। প্রমাণ হিসেবে তার মাথার একমুঠো কালো দুর্গন্ধযুক্ত চুলও দেখায়। শত্রুনিপাতের আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠে কংসারি। তার ঐশ্বর্যের, তার সাম্রাজ্যের আর কোনো ভাগীদার নেই। কংসারির আনন্দের মাঝেই নীহারি বুকের থেকে বাঘের থাবা বের করে হাতে পরে নিয়েছে, ঝাঁপিয়ে পড়ে আঘাত

করেছে কংসারির চোখে। অন্ধ কংসারি জেনেছে, নেকড়ে নয় দ্বীপের আধমরা মানুষেরাই তাকে ধ্বংস করেছে। দ্বীপের মানুষ দ্বীপে প্রতিষ্ঠা করেছে নিজেদের অধিকার। নেকড়ে শিকারের জন্য যে জাল লাগিয়েছিল কংসারি, সেই জালেই আটকে মরবে 'ওপারের জানোয়ার' কংসারি-শশাঙ্ক-ঘনশ্যাম। প্রবল আক্রোশে নেকড়ের মতোই পরস্পরের গলা যখন চেপে ধরেছে কংসারি আর নীহারি, তখন শশাঙ্ক গুলি করেছে নীহারিকে। পড়ে যেতে যেতে ঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছে নীহারি, ছুটে এসেছে শোষিত চাষীরা। তাদের কারো হাতে বাঘের থাবা, কারো পিঠে তীর-ধনুক, কারো গায়ে ডালপালা বাঁধা। সবার গলায় জয়োল্লাস।

ক্রমাগত শোষণের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের জেগে ওঠার, শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নাটক 'নেকড়ে'। নীহারি নেতৃত্ব দিয়েছে শোষকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, উজ্জীবিত ও সংঘবদ্ধ করেছে জনতাকে। নিখুঁত পরিকল্পনা করে একে একে সরিয়ে দিয়েছে কংসারির দুই বুলডগ, আক্রাম এবং সবশেষে গোঁসাইকে। নানা দিক থেকে শত্রুকে দুর্বল করে তোলার পর প্রস্তুত হয়েছে চরম আঘাত হানার জন্য। এই প্রস্তুতির পথে বাধা কম নয়। অনেকেই দ্বিধা ঝেড়ে এগিয়ে আসতে ভয় পায়, সাফল্য সম্পর্কে জাগে সংশয়। ধানের গাড়ি আটকাতে গিয়ে একবার ব্যর্থ হয়েছে চাষীরা, চাবুক চালিয়ে চাষীদের বুকের ওপর দিয়ে কংসারি গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেছে। সেখানে ছিল পরিকল্পনার অভাব, তাই সফল হয় নি প্রতিরোধ। এবার নীহারির পরিকল্পনা নিখুঁত। পাইকার ডেকে এনেছে কংসারি, সঞ্চিত সব সোনা সে বিক্রি করে দেবে। নীহারি কিছুতেই দ্বীপের সোনা বাইরে যেতে দেবে না। সরাসরি লড়াইয়ের শক্তি নেই, তাই রচনা করতে হয় কৌশল : " রাবণরাজা অসুর। সামনা-সামনি নিকেশ করা যাবে না। আঁধারে কাজ হাসিল করতে হবে হামিদ ভাই।"[১৮] ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া গেছে কংসারির মনে। দিন দিন সে কুঁকড়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় দিতে হবে মরণকামড়। এই সংগ্রাম অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। এখানে দয়া-মায়া-মমতার কোনো স্থান নেই। পালানের মতো দুর্বল প্রকৃতির যে মানুষেরা শেষ মুহূর্তে এসে ভয় পায়, তাদের প্রতিও হতে হয় নির্দয় : " যা করতে এয়েছ করো, নয় মরো... তুমি যে হাতে রক্ত লাগাবে না ... শুদ্ধু হয়ে ঘরে ফিরে সব কথা ফাঁস করে দেবা না, তার ঠিক কি ...।"[১৯] সেই পালানকে সংগ্রামে উজ্জীবিত করে নীহারি। প্রস্তুত হয়ে তারা অপেক্ষা করে নীহারির সংকেতের জন্য। শেষ লড়াইয়ে পতন ঘটে শোষকের, নীহারিকেও মৃত্যুবরণ করতে হয় শশাঙ্কের ছোঁড়া গুলিতে। কিন্তু নিজের প্রাণের বিনিময়েও অত্যাচারীর পতন সম্ভব করে তোলে নীহারি। প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটকে এভাবেই শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের, বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের জয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে নিজের শ্রেণিগত অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন মনোজ মিত্র। বক্তব্য এখানে স্পষ্ট এবং বলার ভঙ্গিটিও serious. শোষক-শোষিতের সংগ্রাম এখানে অন্যতর মাত্রা পেয়েছে নারী নীহারির উপস্থিতিতে। কংসারিকে একাধিকবার 'রারণ-রাজা' বলে উল্লেখ করে মনোজ মিত্র স্মরণ করাতে চেয়েছেন রামায়ণের অনুষঙ্গ। নারী সীতার ওপর অত্যাচার করে ধ্বংস হয়েছিল রাবণ আর বাদাবনের এক আপাত-নিরীহ নারীর জেদের আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে কংসারি ঠাকুর।

'চাক ভাঙা মধু' (১৯৬৯) নাটকেও আছে শোষক-শোষিতের লড়াই এবং পরিণামে শোষকের পরাজয়। তবে 'নেকড়ে' থেকে মাত্র এক বছরের ব্যবধানে রচিত এই নাটকে মনোজ মিত্র কথন-ভঙ্গিতে অনেক পরিবর্তন এনেছেন, শিল্পরূপ নির্মাণের দিক থেকেও অনেক পরিণত হয়েছেন।

এখানেও তিনি ক্রোধী, তবে সে ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে নানা মজাদার পরিস্থিতি ও সংলাপের সাহায্যে। যে বাদাবনের গল্প বলেছিলেন 'নেকড়ে' নাটকে, সেই একই অঞ্চলকে পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করেছেন 'চাক ভাঙা মধু' নাটকেও। এই পটভূমি এবং চরিত্র যে মনোজ মিত্র চোখে দেখা বাস্তব, সেকথা তিনি নিজেই জানিয়েছেন ঃ

> "জলজঙ্গলের দেশে জন্ম আমার। চাক ভাঙা মধুর জটা মাতলা বাদামীকে দেখেছি আমি খুব কাছ থেকে, দেখেছি তাদের লজ্জা নিবারণের ছেঁড়া তেনি, রুক্ষ উড়োখুড়ো খসখসে চামড়ার মানুষগুলো ভাঙা সানকিতে শাকপাতা খাচ্ছে। দারিদ্র্য তাদের সহোদর।"[২০]

স্মৃতিতে সঞ্চিত এই বাস্তব অভিজ্ঞতা জেগে ওঠে সংবাদপত্রের একটি সংবাদের অভিঘাতে ঃ "ওঝার বাড়িতে বিষ ঝাড়াতে এসে সর্প দংশনে মৃত্যু।"[২১] লেখা হয় 'চাক ভাঙা মধু'। তবে এই নাটকে সাপ থাকলেও অঘোর ঘোষের মৃত্যু সাপের কামাড়ে ঘটেনি, ঘটেছে বাদামির সড়কির আঘাতে।

অর্থনৈতিক শ্রেণি বিভাজনে অঘোর ঘোষ শোষক এবং জটা-মাতলা শোষিত। মহাজন অঘোর ঘোষ দিনের পর দিন অত্যাচার করেছে মাতলার ওপর, মাতলাদের মতো মানুষের ওপর। সুদের বদলে জমি লিখে নিয়েছে, বিষয়-আশয় যা কিছু, সব গ্রাস করেছে, নারীকেও অধিকার করেছে। সেই শোষকের বাঁচা-মরা আজ শোষিত মাতলার ওপর নির্ভর করছে। সুযোগ এসেছে প্রতিশোধ নেবার। সাপে-কাটা অঘোর ঘোষের ডুলি আসছে সাপের ওঝা জটা-মাতলার উঠোনে। একদিকে সংস্কার — উঠোনে সাপে-কাটা শরীর এলে ঝাড়তেই হবে, অন্যদিকে প্রতিশোধ নেবার এমন সুবর্ণ সুযোগ। পরপর কয়েকদিন অভুক্ত মাতলা, তার কাকা জটা এবং স্বামী পরিত্যক্তা গর্ভবতী কন্যা বাদামী। মুখ বাঁধা এক কলসী এনেছে মাতলা। বাদামীকে দেখিয়েছে চাক ভেঙে আনা ঘন লাল টকটকে মধুর লোভ। কিন্তু কলসির ঢাকা খুলতেই তেড়ে আসে প্রচন্ড গোখরো সাপ। মধুর বদলে বিষ। সামজিক নানা প্রতিকূলতা এবং শোষণে মাতলার জীবন বিষময় হয়ে উঠেছে। গোখরোর বিষের সাহায্যে নিজের জীবনের বিষ ক্ষয় করে সে নিজের জীবনকে মধুময় করতে চায়। এই বিষ যেন বুকের ভেতর গজরাতে থাকা তীব্র প্রতিশোধস্পৃহা। ফণা তোলা গোখরোকে দিয়েই মাতলা চরিতার্থ করবে নিজের প্রতিশোধবাসনা ঃ "মরার কালে উয়ারে আমি ছুঁড়ে মেরে যাবো পৃথিবীর বুকি ! যতো বজ্জাত মিলে আমার যে সব্বোনাশ করেছে -"[২২] সাপের বিষ দেহে নিয়ে অঘোর ঘোষের ডুলি নেমেছে মাতলার উঠানে। সঙ্গে আছে অঘোরের ছেলে শঙ্কর আর দাক্ষায়ণী। যত অত্যাচার এতদিন করেছে অঘোর, সেসব স্মরণ করে আজ অঘোরকে বাঁচাতে চায় না জটা-মাতলা। যেটুকু দ্বিধা ছিল মাতলার, তাও কেটে গেছে জটার মন্ত্রণায়। নানাভাবে সময় নষ্ট করে অঘোরের মৃত্যু নিশ্চিত করতে চেয়েছে তারা। গ্রামের অত্যাচারিত জনগোষ্ঠীও এই সুযোগে অঘোর ঘোষের প্রাণ নাশ করারই পক্ষপাতী। ফুকনা এসে বারবার সেই কথাই বলে যায়। কিন্তু তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাদামী। তার দেহে বর্ধিত হচ্ছে এক প্রাণকণিকা। সে বোঝে প্রাণের মর্ম। নিজের সন্তানের জন্য সে রচনা করতে চায় নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ। তার ওপর শঙ্কর তাকে লোভ দেখিয়েছে আশ্রয়ের, লোভ দেখিয়েছে ভালোভাবে বাঁচার ঃ

"হরিশ লোকটা অভাবে পড়ে তোকে ছেড়েছে। ওই অঘোর ঘোষকে দিয়ে আমি তোদের সব অভাব মিটিয়ে দেব। আমি আড়তদার মানুষ ... স্পষ্টা-স্পষ্টি কথা। অঘোর ঘোষকে বাঁচিয়ে দে, আমি দেখব ... হরিশ, তুই আর তোদের বাচ্চাটা যেন বাঁচে ! ভালোভাবে বাঁচে।" [২৩]

বাদামীর জন্যই মাতলা বাধ্য হয় অঘোর ঘোষকে ঝাড়াতে। বাদামী তখন অঘোর ঘোষের প্রাণস্বরূপা, চাক ভাঙা মধুর মতো তীব্র জীবনরসে পূর্ণ। গ্রামের সকলের বিরোধিতা উপেক্ষা করে মাতলা অঘোর ঘোষকে বাঁচিয়ে তোলে। কিন্তু প্রাণ ফিরে পাবার পরই অঘোর দেখা দেয় শোষকের চিরন্তন মূর্তিতে। শঙ্করের রূপও মুহূর্তে বদলে যায়। অঘোর এবার হাত বাড়ায় বাদামীর দিকে। তীব্র লালসায় তার জান্তব লালা ঝরে। বাদামী অঘোরের তৃষ্ণা মেটাতে এগিয়ে দেয় সেই গোখরোর কলসী। কিন্তু আবার কখনো বাদামীর দিক ছোবল তুলতে পারে এই আশঙ্কায় গোখরোকে আগেই মেরে রেখেছে মাতলা। বাদামীর স্বপ্নের 'গোক্ষুর' তখন মৃত, তার মাথাটা একটা প্রকান্ড ভন্ডামির মতো ফুলে ফেঁপে হাঁ করা। হাসিতে কান্নায় জ্বলতে জ্বলতে বাদামী সেই মৃত সাপ টেনে বের করে আছড়ায় উঠোনে আর পরমুহূর্তেই কচ্ছপ ধরা সড়কি তুলে নিয়ে ছোটে অঘোরের দিকে। অঘোর লাফিয়ে পড়ে আলের ওপাশে। বাদামীও আলের ওপরে উঠে সড়কি চালায়। মাতলার মুখে শোনা যায় বর্ণনা : " আঁই শালা, মেয়ে আমার লিজের হাতে বক্ষ ফাটায়ে দিলো রে !"[২৪] বাদামী 'মা' রূপে মধুর আধার, সেই 'মা' প্রাণ দিয়েছিল অঘোরকে। আবার সেই 'মা' যখন সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীত তখন তীব্র বিষ। সেই বিষেই অঘোরের নিপাত। বিষ উগরে দিয়েই আবার মাধুর্যে স্থিত হয়েছে বাদামী। বাবার বুকে জড়িয়ে থেকে উঠোন পেরিয়ে এগিয়ে গেছে দাওয়ার দোলনার দিকে — মৃত্যু পেরিয়ে জীবনের দিকে। শোষক-শোষিতের লড়াই এবং পরিণামে শোষকের পরাজয়ের পরিচিত থিমকেই মনোজ মিত্র ব্যবহার করেছেন এই নাটকে, কিন্তু জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক। তাই বক্তব্য ভার হয়ে চেপে বসেনি তাঁর নাটকে। ক্রোধ এবং প্রতিবাদ প্রকাশের সরল প্রচলিত পথ তিনি বেছে নেন নি। বরং জটা-মাতলার প্রতিবাদকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাদের শ্রেণির উপযুক্ত করেই। মহাজন এদের নানাভাবে পীড়ন করে, ঘৃণা-অপমান-অত্যাচারে নিঃস্ব করে। সেই মহাজনের জীবন-মরণ যখন তাদের হাতে তখনও তাদের মধ্যে অবাস্তব বীরত্ব আমদানির সরল প্রলোভন জয় করে মনোজ মিত্র ফুটিয়েছেন এই শ্রেণির মানুষের চরিত্রের স্বাভাবিকতা। মাতলা বহুদিন মনে মনে ভেবেছে, 'কত্তা'কে একবার বাগে পেলে সব অপমানের শোধ তুলবে, কিন্তু সত্যি সত্যিই যেদিন বাগে পেল সেদিন দেখা গেল, ক্রমাগত শোষণ এবং পীড়নের ফলে তাদের ভেতরকার আগুনেও আর তেমন তেজ নেই। কলসির মৃত গোখরোর মতো তাদের ভেতরকার গর্জনও নিস্তেজ নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছে। তাই ডুলি তাদের বাড়ির দিকে ছুটে আসতে দেখে মাঠ ভেঙে খিঁচে দৌড় লাগাতে চায় মাতলা। ক্রোধের পরিবর্তে তাদের চরিত্রে মিশে যায় অসহায়তা এবং আত্মবিদ্রূপ। মাতলার ভয়, শেষ পর্যন্ত কর্তাকে না ঝাড়াতেই হয়। কিন্তু জটা অনেক জটিল, অনেক প্যাঁচালো। সে মাতলাকে শেখায়, বঁড়শিতে মাছ খেলানোর মতো করে অঘোর ঘোষের প্রাণটাকে খেলাতে হবে কিন্তু কিছুতেই তাকে বাঁচানো চলবে না। ছুতোয়-নাতায় সময় নষ্ট করতে হবে। মনোজ মিত্রের কোনো চরিত্রেই সাদা-কালোর স্পষ্ট ভেদ নেই। চরিত্রের বিভিন্ন দিকে আলো ফেলেন তিনি। তাই জটার পরামর্শে মাতলার মনে দ্বিধা জাগে : " ট্যাকা যদি গোড়াতেই খেয়ে বসি তালে তো রুগী বাঁচাতিই হবে !"[২৫] কিন্তু এর কাটানও আছে জটার কাছে : "ধর দেবতার থানে কতো তো হত্যে হয়, মানত হয়, প্যাঁটা কাটা হয়, তা বলে সব বারে কি আর রুগী বাঁচে!" [২৬] সুতরাং

যতটা পারা যায়, পয়সা খিঁচে নিতে হবে, কিন্তু কিছুতেই প্রাণ বাঁচানো চলবে না। ফুকনা, ষষ্ঠী প্রমুখ গ্রামবাসীরাও এই সুযোগ অঘোরের গ্রাস থেকে মুক্তি পেতে চায়। মাতলাকে তারা নিষেধ করেছে অঘোর ঘোষকে ঝাড়াতে। কিন্তু এর মাঝে নাট্যকার উপস্থিত করেছেন মাকে — উপস্থিত করেছেন বাদামীকে। প্রাণকে লালন করা যার ধর্ম সে কিছুতেই নষ্ট হতে দিতে পারে না প্রাণকে। তারই পীড়াপীড়িতে মাতলা অঘোরকে ঝাড়তে যায়। সেই সঙ্গে মনোজ মিত্র আবার যুক্ত করে দেন মাতলার রক্তে বয়ে চলা সংস্কারকে। ওঝার সামনে বিষ রোগীর শরীর উথাল-পাথাল করবে, এ যে সহ্য হয় না ঃ ‘‘বাপ আমারে লিজহাতে ধরে ধরে গাছগাছাড়ি ওষুধবিষুধ চেনায়ে গেছে! আজ থেকে থেকে শুধু তার কথা মনে পড়ে আর দু’খান হাত আমার লিসিরপিসির করে! ’’[২৭]

শেষ পর্যন্ত সব কিছুর ঊর্ধ্বে জয়ী হয় প্রাণের দাবী। মাতলা বিষ নামায় অঘোরের। ‘কত্তা’কে ঝাড়াতে গিয়ে নিজের ভেতরকার বিষটাও ঝেড়ে ফেলেছে মাতলা, উপলব্ধি করেছে প্রাণের মাধুর্য। কিন্তু অঘোরের শরীরের বিষ নামলেও মনের বিষ তো নামে নি। তাই জান্তব লোভে সে হাত বাড়িয়েছে বাদামীর দিকে। যে নারীকে নাট্যকার এনেছিলেন প্রাণস্বরূপিণী হিসেবে, সেই নারীকেই এবার দেখালেন অসুরবিনাশিনী রূপে। নিজের এবং গর্ভস্থ সন্তানের বিপদের আশঙ্কায় বাদামী হাতে তুলে নিল সড়কি — সেই সড়কির আঘাতেই মৃত্যু ঘটল অঘোর ঘোষের। বাদামীর এই একক প্রত্যাঘাত সংঘ নাটকের প্রচলিত ছকের সমাপ্তির সঙ্গে মেলে না। কারণ সেখানে সমবেত জনশক্তিই শোষকের পতন ঘটায়। মনোজ মিত্র কখনো প্রচলিত ছকবন্দি নাটক লেখেন না। তাই তাঁর নাটকে গ্রামবাসীরা অঘোর ঘোষকে ঘিরে ধরলেও চরম আঘাতটি হানে বাদামী। এই পরিণতিকে সমর্থন জানিয়েছেন বিশিষ্ট নাট্যকার উৎপল দত্ত এবং বিশিষ্ট সমালোচক ড. পবিত্র সরকার। ড. সরকারের মতে ঃ

> ‘‘বাদামীর চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া কোনো এক মুহূর্তের উদ্‌গম নয় - পুরো নাটকের ঘটনাক্রম তার পিছনে না থাকলে ওই ক্লাইম্যাক্স তৈরি হতেই পারত না ; ... বাদামীর এই কাজ শ্রেণী সংগ্রামকে সাহায্যই করে, তা শ্রেণী সংগ্রামের মূল লক্ষ্যকেই সমর্থন জোগায়।’’[২৮]

বাদামী অঘোরকে মারলেও তার পেছনে সমূহ শোষিত মানুষের সমর্থন আছে। নিজে সে একক চরিত্র হিসেবে শোষিত নয়, তার মধ্যে সমস্ত শোষিত মানুষের চিত্র ধরা পড়েছে। তাত্ত্বিক বক্তব্যে নাটক শেষ করার পরিবর্তে ‘বাদামীর হঠাৎ জেগে ওঠা নিরুপায় আক্রোশ’ নাট্যকারের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। শত্রুনিপাত তখন আর বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যের রূপায়ণ হয়ে থেকে যায় না, জীবন থেকে উঠে আসা মানবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক ও সঙ্গত প্রতিফলন হয়ে ওঠে৷

‘নেকড়ে’ এবং ‘চাক ভাঙা মধু’ নাটকে গল্পের ছক মোটামুটি এক। একজন অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত অনেক মানুষ। উভয় ক্ষেত্রেই শোষকের মৃত্যু ঘটেছে একজন নারীর হাতে। নীহারি গণশক্তিকে সংগঠিত করে প্রতিশোধে নেতৃত্ব দিয়েছে, বাদামী মানুষকে সংগঠিত না করলেও শ্রেণি হিসেবে সাধারণ মানুষ তার সঙ্গে আছে। গ্রামের সকলে অঘোরকে ঘিরে ধরার পরই সে সড়কি চালিয়েছে। এই দুটি নাটকের গড়নে সংঘ নাটকের প্রভাব আছে। গণনাট্যের আদর্শ সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন ঃ

> "গণনাট্যের আদর্শ হল শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সংকট, শোষক ও শোষিতের মধ্যে স্পষ্ট শ্রেণিবিভাজন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রেণিবিভাজনের অবসান না হচ্ছে ততদিন শ্রেণিদ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতার চিত্র আঁকা গণনাট্যের সামাজিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি।"[২৯]

এই দুটি নাটকে শোষক-শোষিতের শ্রেণিপরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট এবং শ্রেণিদ্বন্দ্বের চিত্র অঙ্কিত। অঘোর এখানে অত্যাচারী এবং তার অত্যাচার প্রকাশ পেয়েছে মাতলা, দাক্ষা ও বাদামীকে কেন্দ্র করে। তবে শ্রেণিগত মানুষের ব্যক্তিপরিচয়টিও তুলে ধরেছেন নাট্যকার। শ্রেণি হিসেবে মাতলা মহাজনের প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ, কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে সে বিশ্বাস করে, ওঝার বাড়িতে রুগি এলে তাকে ঝাড়াতেই হয়। ব্যক্তিগত এই বিশ্বাসবোধের সঙ্গে তার শ্রেণিপরিচয়ের দ্বন্দ্বও আছে নাটকে। বাদামী শোষিত নারী, কিন্তু স্বামী-সন্তানসহ সংসারের লোভ, প্রাণের জন্য তার মমতা প্রভৃতি তাকে ব্যক্তিপরিচয়ে চিহ্নিত করেছে।

'চাক ভাঙা মধু' থেকে 'শিবের অসাধ্যি'র ব্যবধান পাঁচ বছরের। প্রত্যক্ষ বাস্তবকে এড়িয়ে এই নাটক মনোজ শোষক-শোষিতের লড়াইকে উপস্থাপিত করেছেন অনেকটা ফ্যান্টাসির আকারে। দেবতারাই এই নাটকে প্রধান চরিত্র হয়ে এসেছেন। কৈলাস থেকে মা দুর্গা তাঁর সন্তানদের দিয়ে মর্ত্যে এসেছেন। আর শিব তাঁর অনুচর নন্দী-ভৃঙ্গীকে নিয়ে পৃথকভাবে উপস্থিত হয়েছেন সেই ঘোড়াডাঙায়, যেখানে জোতদার হাঁদু সিংগির বাহিনী মায়ের পুজোর চাঁদার নামে অত্যাচার চালায় গ্রামবাসীদের ওপর। শিব এই অত্যাচারিত মানুষদের পরামর্শ দেন জোতদারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। তাঁরই নেতৃত্বে প্রতিরোধ গড়ে তোলে গ্রামবাসীরা। কিন্তু জোতদার শিবেরও অসাধ্যি। ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের নামে শিবকে যুক্তিজালে ফাঁসিয়ে কার্যসিদ্ধি করে হাঁদু সিংগি। দুর্গা তাঁর বরপুত্র হাঁদুকে বাঁচাতে কার্তিক-গণেশকে পুলিশের বেশে পাঠান। কারণ কমতে কমতে জোতদার এখন সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে। তাদের রক্ষা করা মায়ের কর্তব্য। পুলিশের শক্তিতে উজ্জীবিত হাঁদু, নেতা শিবসহ সকলকে শাস্তি দিতে উদ্যত হন। শিব শুরু করেন প্রলয়নৃত্য। কিন্তু দুর্গার চেষ্টায় রক্ষা পায় হাঁদু। নাটকের শেষে সর্বহারা মানুষের চেতনার জাগরণ এবং সেই চেতনার দ্বারা নতুন পথ খুঁজে নেবার ইঙ্গিত আছে।

'নেকড়ে' বা 'চাক ভাঙা মধু'তে শেষে শোষিত মানুষের জয় দেখানো হয়েছে। কিন্তু 'শিবের অসাধ্যি' শেষ হয়েছে আশা দিয়ে, সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে। জোতদারকে মানুষ পরাস্ত করতে পারেনি, কিন্তু মানুষের শুদ্ধ চৈতন্য যে ভবের অসুর বিনাশ করবে তেমন সম্ভাবনা সৃষ্টি করা হয়েছে। পূর্ববর্তী দু'টি নাটকের তুলনায় এই নাটকে সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতার ছায়াপাত বেশি করে ঘটেছে। নাটকটির রচনাকাল ১৯৭৪। অর্থাৎ সমকালীন পশ্চিমবঙ্গে তখন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অস্থির। জোতদারদের অত্যাচারে জর্জরিত মানুষ ক্রমে সংগঠিত হচ্ছে, বিশেষ রাজনৈতিক দলের আশীর্বাদপুষ্ট জোতদারদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠছে, কেন্দ্রীয় শক্তি প্রাদেশিক শক্তির উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে। এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট প্রতিফলিত হয়েছে নাটকে। শিব এখানে সর্বহারা শ্রেণির প্রতিনিধি। ছিদাম-বংশী-গোবর্ধনের সঙ্গে তিনি একই 'কৈলাসে'র। কিন্তু এই সর্বহারার নেতা পরাজিত হয়েছেন বুর্জোয়ার কৌশল এবং রাষ্ট্রশক্তির সহায়তার কাছে। সাধারণের চেতনা বাড়ার আশাতেই তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। দুর্গতিনাশিনী দুর্গা চরিত্রে ছায়া পড়েছে সমকালের

রাষ্ট্রনায়িকার। সাধারণের দুঃখ দূর করা যার কাজ তিনি আজ জোতদারের স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত। সে সময় 'গরিবি হটাও' স্লোগান নিয়ে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল তার ইঙ্গিত আছে দুর্গার সংলাপে। গরিবের সর্বনাশ করে গরিবি দূর করার স্লোগান তোলার দিকে কটাক্ষ করা হয়েছে ঃ " আমি জোতদার, মজুতদার, ভেজালদার মানিকদের ছেড়ে দিয়েছি। ওরা মারুক, ঘর জ্বালাক, গরিব লোক মেরে নিশ্চিহ্ন করে দিক ... গরিব না মারলে, গরিবি দূর হবে কি করে ছোটখোকা ?"[৩০] সমকালীন পশ্চিমবঙ্গে নকশাল দমনের নামে রাষ্ট্র শক্তির যে নিপীড়ন নেমে এসেছিল, পুলিশ-মিলিটারির সাহায্যে দোর্দণ্ডপ্রতাপ মুখ্যমন্ত্রী যে নিষ্পেশণ চালাচ্ছিলেন তাকে তুলে ধরেছেন মনোজ মুখ্যমন্ত্রীর ডাকনামটির ধ্বনিসাদৃশ্যে ঃ

> "পুলিশ আছে, সি.আর.পি. আছে, মিলিটারি আছে, কোর্ট আছে, কনস্টিটিউশন আছে, দশ হাত ভরে মানিকের কোনো অভাব রাখি নি। কেউ ওর কিছু করতে পারবে না। মানিক আমার ঠিক হড়কে বেরিয়ে আসবে।"[৩১]

মানুষের দুর্দশায় ক্রুদ্ধ নাট্যকার দেবীকে 'পিশাচজননী' বলে অভিহিত করেছেন। বিভিন্ন অনুষঙ্গে এই নাটকে এসেছে সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের রাজনীতির বহু প্রসঙ্গ। বিদ্যুৎহীন খাম্বা, ভেসেকটমি, আন্দোলন করতে গিয়ে জোতদারের সঙ্গে নেতার মিলে যাওয়া, ভোট জালিয়াতি, রাজনৈতিক দলের গোষ্ঠীবাজি, শাসক-পুলিশ যোগসাজশ, নকশাল আন্দোলনে শিক্ষার অবনমন, মিসা আইনের ব্যবহার, মন্ত্রী হয়ে স্বার্থরক্ষা এবং সাধারণের সর্বনাশসাধন ইত্যাদি সবকিছুই নাট্যদেহে যুক্ত হয়ে গেছে এবং কোনোটিই আরোপিত মনে হয় নি। নাটকের মূল বক্তব্যটি হ'ল, দেশের কৃষক - শ্রমিকের সমস্যা সমাধানের পথ বাইরে থেকে কেউ এসে বাতলে দিতে পারবে না, তাদের নিজেদেরই পথ করে নিতে হবে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ঃ " ওরে পরের কাছা ধার করে কে জিতেছে কবে ... চাষার ভাগ্যি চাষা ছাড়া কে ফিরালো ভবে ..."[৩২] চাষী ছিদাম উপলব্ধি করেছে এই সত্য। ত্রিপাক্ষিকের রস তার মিটে গেছে। কোনো তৃতীয় পক্ষ নয়, চাষাকে নিজের বুঝ নিজেই বুঝে নিতে হবে ঃ "পরের কাছা ধার করে পার পাওয়া যাবে না। কত্তা, গরিবেরে বাঁচাতে হলে ... তার নিজেরে দাঁড়াতে হবে, লড়তে হবে !"[৩৩] নাটকের শেষে ধ্বনিত হয়েছে আশাবাদ ঃ

> "ও ছিদেম, লেগে পড়। পারবি পারবি... পারলে তোরাই পারবি। ... উল্টেপাল্টে দে। আসছে বছর আমরা এসে যেন দেখতে পাই, ও ছিদেম, ভবের অসুর নাশ হয়েছে, তোরা জয়ী হয়েছিস ... পৃথিবী সুন্দর হয়েছে ... মধুর হয়েছে ... আসছে বছর আমরা তোদের ঘরে উঠব ..."[৩৪]

এই আশাবাদ এবং নাটক জুড়ে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক বাস্তবতার উল্লেখ সত্ত্বেও 'শিবের অসাধ্যি', 'চাক ভাঙা মধু', এমনকি 'নেকড়ে'র তুলনায়ও দুর্বল সৃষ্টি। 'শিবের অসাধ্যি' নাটকে Seriousness কম, রসিকতা বেশি। থিম এক, প্লটও প্রায় চেনা। চরিত্রগুলির ভূমিকা সমকালের বাস্তবতার সঙ্গে মেলানো। জোতদার-চাষীর দ্বন্দ্ব এবং শেষপর্যন্ত শোষিত কৃষককে নিজের শক্তিতে উঠে দাঁড়াতে হবে – এই তাত্ত্বিক উপস্থাপনা খুব Seriously করা হয় নি। বিষয়বস্তুর নিরিখে সমসাময়িক কালে এর কিছুটা গুরুত্ব থাকলেও চিরকালীন নাট্যিক আবেদন এতে নেই। প্রতিরোধের নাটক হিসেবে যেমন দৃঢ় নয়, তেমনি কৌতুকনাটক হিসেবেও খুব একটা সফল নয়। কৌতুক অনেক ক্ষেত্রে ভাঁড়ামিতে পর্যবসিত এবং কোথাও কোথাও অনাবশ্যক দৈর্ঘ্যে ভারাক্রান্ত। মনোজ মিত্রের অনেক বক্তব্যপ্রধান নাটকও যেমন নাট্যিক শর্ত পূরণ করেছে, এই নাটক কিন্তু তা পারে নি।

'নরক গুলজার' নাটকেও সমকালীন সমাজ-রাজনীতির প্রতি রঙ্গ-ব্যঙ্গের শেল নিক্ষেপের জন্য মনোজ বেছে নিয়েছেন Epic form। 'শিবের অসাধ্যি'তে দেবতা নেমে এসেছিলেন মর্ত্যে আর 'নরক গুলজার'-এর কাহিনি স্বর্গ-মর্ত্য-নরকে প্রসারিত। বিশ শতকের সত্তরের দশকের পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের সামাজিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত রূপটি ধরা পড়েছে এই নাটকে। পিতামহ ব্রহ্মা স্বর্গের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন, নরকের পাপীরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে — তাদের পুনর্জন্ম চাই। মর্ত্যের পশ্চিমবঙ্গে ফিরে গিয়ে তারা আবার নিজ নিজ কুকর্মে লিপ্ত হতে চায়। যমের ছোটো বৌকে তারা হাইজ্যাক করেছে দাবী পূরণের লক্ষ্যে। ব্রহ্মা কোনো কড়া পদক্ষেপ নিতে পারছেন না, কারণ এরা সব তারই সৃষ্টি এবং নিজের গদি টেঁকাতে তিনি অনেক সময়ই এই মস্তান, পুলিশ এবং গুরুঠাকুরদের সহায়তা নিয়ে থাকেন। কৌশলে কার্য-সিদ্ধির জন্য তিনি নারদকে নরকে পাঠালেন নেতা বাঁটুল বিশ্বাসের ছদ্মবেশে। কিন্তু ফল হ'ল উল্টো। নারদ বাঁটুল বিশ্বাসের ছদ্মবেশ ধারণ করে আসল বাঁটুল বিশ্বাসের মতো আচরণ করতে শুরু করল। কারণ নেতার পোশাক পরলেই নেংটি ইঁদুরও বাঘ হয়ে যায়। এদিকে যম আসল বাঁটুলকে মারতে ব্যর্থ হয়ে মেরে নিয়ে এসেছে ঠেলাচালক 'মরা গরিব' মানিকচাঁদকে। মর্ত্যে মানিকচাঁদের কষ্টের সংসার ফুল্লরা আর শিশু সন্তানকে নিয়ে। নানা দিকের পীড়ন সহ্য করতে না পেরে, স্ত্রী-পুত্রের কষ্ট দেখতে না পেরে মানিক আত্মহত্যা করেছে। পুনর্জন্ম সে চায় না, মর্ত্যের জীবনে আর ফিরে যেতে চায় না। কিন্তু শোষকশ্রেণির যে মর্ত্যে মানিককে অবশ্যই চাই। নইলে কে ঘোড়ুই-এর লাঙল ঠেলবে, কে পান্নার গুদাম সাফা করবে, কে বাঁটুলের বেগার খাটবে, কার নারীকে ভোগ করবে গুঁইবাবা? ব্রহ্মা মানিককেই ঠেলে দেন নরকের পাপীদের কাছে। কারণ রক্তপায়ীর মুখে অবিরাম খাদ্যের যোগান না দিয়ে গেলে তার গদি টেঁকে না। লড়াইতে কিন্তু জিতে যায় মানিক। শিকল ছাড়া হারাবার যার আর কিছুই নেই, সেই মানিক সর্বশক্তি প্রয়োগ করে জিতে যায় নেংটি-ঘোড়ুই-বাঁটুল-গুঁইবাবার বিরুদ্ধে। নারদ ব্রহ্মার চাল বানচাল করে দিয়ে মানিকচাঁদ-ফুল্লরাকে পুনর্জন্ম দিয়ে দেন। কারণ মর্ত্যে লড়তে হবে শেষ লড়াই — সে লড়াই বাঁটুল-ঘোড়ুইয়ের বিরুদ্ধে। মানিকও এবার রাজি হয় ফিরে যেতে। কারণ ঃ "জ্যান্ত শয়তানের থাবা থেকে ছেলেডারে বাঁচাতে হবে ... পিথিবীরে বাঁচাতে হবে।"[৩৫] সব শয়তান এবং সেইসঙ্গে ভগবানকেও নারদ ঢুকিয়ে দিলেন পুনর্জন্মের তালিকায়। তাদের জন্ম মানুষের নয়, গাভীর। গভীর ক্রোধে মনোজ মিত্র সমস্ত শয়তান এবং সেইসঙ্গে তাদের নিয়ন্তাকেও গো-জন্ম দিয়ে যেন মনের রাগ মেটান। এই গোরুদের লালন-পালনের ভার এখন থেকে সাধারণ মানুষ মানিকের।

আনন্দবাজার পত্রিকা এই নাটক সম্পর্কে লিখেছিল ঃ " পলিটিক্যাল ড্রামা বলতে যা বোঝায়, এই প্রথম তা মঞ্চস্থ হ'ল।"[৩৬] সমকালীন ভারতবর্ষ, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের অবক্ষয়ী রাজনীতির দিকে আঙুল তুলেছেন মনোজ মিত্র এই নাটকে। স্বর্গ-নরক ইত্যাদির দ্বারা কৌতুকের একটা আবরণ সৃষ্টি করলেও ভেতরের খোঁচাটা বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। নাট্যকারের প্রধান কৃতিত্ব এইখানে যে, দু'একটি মাত্র শব্দের কুশলী ব্যবহারে তিনি লক্ষ্যভেদ করে ফেলেন। ব্রহ্মা জানেন নেংটি ঘোড়ুইদের কুকীর্তি, কিন্তু তিনি নিজেও ষড়যন্ত্রের বাইরে নন, তাই ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না। মাঝেমধ্যে একটু-আধটু শাস্তি দিতে হয় লোকদেখানো, কিন্তু আসলে তাদের মধ্যে রয়েছে গভীর আঁতাত। নাট্যকারের তীব্র ক্রোধ সমকালীন পশ্চিমবঙ্গের শাসককুলের সঙ্গে কেন্দ্রের শাসকের আঁতাতটিকে

স্পষ্ট করে দেয় সামান্য আয়োজনে ঃ " এই হাত ... এই হাত রক্তমাখা! এ কার হাত! কার ? ভগবানের হাত ... সব ভগবানের হাত ! "[৩৭] নিয়ন্তা যদি নিজেই দুর্নীতিপরায়ণ হন তবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার সাধ্য তার থাকে না। গুঁইবাবার কুকীর্তি জানা সত্ত্বেও জনমতের চাপে তাকে স্বর্গে রাখতে বাধ্য হন ব্রহ্মা। এভাবেই নানাদিকে 'তাপ্পি' দিয়ে তাকে স্বর্গ চালাতে হয়। ঘোড়ুই এর উৎকোচও তাই গ্রহণ করতে হয় ব্রহ্মাকে এবং উৎকোচ গ্রহণের যে সাফাই তিনি দেন তাতে ব্রহ্মাকে সমকালের এবং চিরকালের একজন তথাকথিত দেশনেতা হিসেবে চিনে নিতে কষ্ট হয় না ঃ " উৎকোচ ছাড়া আমাদের ইনকামটা কী, অ্যাঁ? আমরা কি খাটি, না এগ্রিকালচার করি না মেসিন বানাই ?"[৩৮] এই পরগাছাই শোষকের মুখে শোষিত যোগান দেবার কাজটি করে থাকে এবং তার মধ্য দিয়ে নিজের গদি সুরক্ষিত রাখে। পান্না-ঘোড়ুই-বাঁটুল-গুইবাবা সেই শোষক শ্রেণি আর মানিকচাঁদ শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধি। শোষক শ্রেণি একটি চেন। লিডার, জোতদার, মজুতদার, মস্তান, পুলিশ, ধর্মগুরু সকলে মিলে এক লম্বা শৃঙ্খল। এই শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে সাধারণ মানুষ। সত্তরের দশকের পশ্চিমবঙ্গ এই অশুভ শৃঙ্খলের দ্বারা যেন সত্যিকারের ভূতের রাজত্বে পরিণত হয়েছিল। এই নরক গুলজার থেকে মানুষকে মুক্ত করতে প্রয়োজন সর্বহারার সংগ্রাম। কোমরের শিকল খুলে রেখে মানিক সেই চরম সংগ্রামে আহ্বান জানিয়েছে শোষক শ্রেণিকে এবং সেই সংগ্রামে জয় হয়েছে সর্বহারার। এই জয়ই দেখাতে চান মনোজ মিত্র। তীব্র ক্রোধে ভস্ম করতে চান অত্যাচারী, অমানবিক শক্তিকে। এই শক্তির স্বরূপ উন্মোচনেও তিনি নির্মম। শাসন কায়েম রাখতে যাদের তোল্লা দেওয়া হয়, একদিন তারাই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন হয়ে ওঠে, চলে যায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সত্তরের দশকে এই ফ্রাঙ্কেনস্টাইনদের দৌরাত্ম্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গ, তাদের সামলাতে তখন জারি করতে হয় জরুরি অবস্থা। 'শিবের অসাধ্যি' যে নাটকত্বের অভাবে সার্থক হতে পারে নি, সেই নাটকত্বের সার্থক উপস্থাপনাতেই 'নরক গুলজার' বক্তব্যপ্রধান হয়েও সফল নাটক হয়ে উঠেছে।

'নেকড়ে' এবং 'চাক ভাঙা মধু'র serious ধরণ থেকে সরে এসে মনোজ 'শিবের অসাধ্যি' এবং 'নরক গুলজার'-এ প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক বাস্তবতা আমদানি করলেন, কিন্তু দেবতা ও ভূতের আধিপত্যে এগুলি ফ্যান্টাসির দিকে এগোল। এই দেবতা বা ভূতেরা যে আসলে মানুষেরই ক্যারিকেচার তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। রাজনৈতিক দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গে তখন এক অস্থির অবস্থা। নকশাল আন্দোলন দমনের নামে চলছে রাষ্ট্রীয় পীড়ন, মানুষের অধিকার হচ্ছে পদদলিত এবং কিছুদিনের মধ্যেই জারি হয়ে যাচ্ছে জরুরি অবস্থা। বিশিষ্ট সমালোচক এই সময়কে চিহ্নিত করেছেন এভাবে ঃ

> "ভিতু বাঙালি গান্ধী পরিবারের মাতা ও কনিষ্ঠ পুত্রের ভয়াবহ সব কার্যকলাপ নিয়ে কানা-কানি করি – চাকরি নেই, নিরাপত্তা নেই, মুখ ফুটে অভিযোগ করবার অধিকার নেই, ধ্বসে যাচ্ছে সুস্থ জীবনের মূল্যবোধ।"[৩৯]

এই ধ্বসে যাওয়া মূল্যবোধের কথাই ব্যক্ত হয়েছে 'শিবের অসাধ্যি' বা 'নরক গুলজার'-এ। তবে তা ব্যক্ত হয়েছে মজা-হুল্লোড়ের মধ্য দিয়ে। 'নেকড়ে' বা 'চাক ভাঙা মধু'র সঙ্গে আরেকটি বড়ো পার্থক্য আছে এই দুটি নাটকের। প্রথম দুটিতে বাস্তবকে মান্যতা দিয়ে নাটক শেষ হয়েছে আশাবাদে। বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনো নেতা বা তত্ত্ব নয়, ছিদাম-মানিকদের সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে নিতে হবে তাদের নিজেদেরই, এরকম ইঙ্গিত আছে নাটকের শেষে। নাটকের এই কথনভঙ্গি কেউ

কেউ হয়তো পছন্দ করেন নি, কিন্তু এটাই মনোজ মিত্রের বক্তব্য প্রকাশের ধরণ এবং সে ধরণটি গড়ে উঠছে এখান থেকেই। 'শিবের অসাধ্যি'তে নাটকের গড়ন কিছুটা শিথিল, কিন্তু 'নরক গুলজার'-এ অনেকটাই সামলে নিয়েছেন মনোজ। হাসি-মজা-হুল্লোড় সত্ত্বেও গভীর নাটক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এখানে। স্মর্তব্য যে, এই পথেই এরপর লেখা হবে মনোজের শ্রেষ্ঠ নাটক 'সাজানো বাগান', ফ্যান্টাসির জগৎও যেখানে জীবনবোধে উজ্জ্বল।

মনোজ মিত্রের প্রত্যক্ষ রাজনীতির উত্তাপযুক্ত নাটক বলতে মোটামুটি এগুলিই। চিৎকৃত ঢঙে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রচার নাট্যকার তাঁর লক্ষ্য নয়। তাঁর পথ ভিন্ন। নাট্যকার হিসেবে নিজের সহানুভূতি কোন্‌দিকে সেকথা স্পষ্টই জানিয়েছেন তিনি ঃ"Of course, my sympathy lies with the poor and victims of exploitation"[৪০]

কিন্তু দরিদ্র মানুষের এই exploitation যে রাজনীতি নির্বিশেষে যে কোনো দলের দ্বারাই ঘটে থাকে তাও জানেন তিনি। তাই রাজনীতির প্রতি তাঁর কটাক্ষ সাধারণীকৃত হয়ে পড়ে। কোনো বিশেষ মতাদর্শ প্রচারে দায়বদ্ধ নন তিনি, দায়বদ্ধ মানুষের দুঃখ-বেদনা প্রকাশে। সেই দুঃখ-বেদনার কারণ হিসেবে যেই তাঁর চোখের সামনে পড়েছে তাকেই আঘাত করেছেন তিনি। যেমন 'শিবের অসাধ্যি' নাটকে জোতদারকে একহাত নেবার পাশাপাশি তিনি সেই নেতাদেরও রেহাই দেন নি, যারা সর্বহারা মানুষের হয়ে লড়তে গিয়ে জোতদারের সঙ্গে রফা করে। মনোজ মিত্র আসলে দেখাতে চান 'আলোছায়ায় ঘেরা মানুষ' এবং মানুষের বিচিত্র সমস্যা ও তা থেকে উত্তরণের পথ। তা দেখাতে গিয়েই তাঁর নাটকে প্রসঙ্গক্রমে আসে রাজনীতি। সে রাজনীতি কখনো এক দলকে আঘাত করে, আবার সময়ের বিবর্তনে তাই হয়তো হয়ে দাঁড়ায় বিপরীত মতাদর্শে বিশ্বাসী কোনো রাজনৈতিক দলের বিরাগের কারণ। ঠিক যেমনটি ঘটেছে পূর্বে উল্লিখিত 'চোখে আঙুল দাদা' একাঙ্কটির ক্ষেত্রে। মনোজ ১৯৭৬ সালে রচিত এই নাটকে সৃষ্টি করলেন এমন একজন মানুষকে যে কিনা সকলের, এমনকি বিধাতার কাজেরও খুঁত ধরে। অথচ তাকে যখন একটি মানুষ তৈরি করতে দেওয়া হ'ল, সে তৈরি করল এক কিম্ভূতদর্শন জন্তু, যার হাতের জায়গায় পা, চোখের ওপর নাইকুন্ডলি, কান দুটো কুলোর মতো। এই অদ্ভুত সৃষ্টির হাতেই চোখে-আঙুলের বিনাশ। নাটকের এই বিষয়বস্তু সমকালে জরুরি অবস্থার সমর্থকদের উল্লসিত করেছিল, আর বিরোধীদের ক্রোধান্বিত। দশ বছরের ব্যবধানে ক্ষমতা বিপরীতগামী হতেই নাটকটি নিয়ে দু'দলের প্রতিক্রিয়াও হয়ে গেল সম্পূর্ণ বিপরীত।

'মহাবিদ্যা' (১৯৮৬) এবং টু-ইন-ওয়ান' (১৯৯১) এরকমই সাধারণীকৃত রাজনৈতিক একাঙ্ক। প্রথমটিতে দেখানো হয়েছে 'অনুন্নত কিংবা উন্নতিশীল কিংবা নিতান্তই উন্নতিকামী' এক রাষ্ট্রে চরম অর্থনৈতিক সংকটের কালে রাজা-দেওয়ান-কোতোয়াল-সান্ত্রী প্রমুখ রক্ষকেরা কীভাবে ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। সান্ত্রী চায় গৃহস্থের জুতো, কোতোয়াল চায় নিদ্রিতা নারীর অলঙ্কার, দেওয়ান চান সম্পূর্ণ নারীটাকেই। শেষে দেখা যায়, রাজা আগেই গৃহস্থের ঘরে ঢুকে একলা গৃহবধূকে মুখে কাপড় গুঁজে শৌচাগারে বেঁধে রেখে সব জিনিস সংগ্রহ করে নিয়েছেন, ঠিক বেরিয়ে আসার সময়টিতেই একে একে হাজির হয়ে পড়েছে সান্ত্রী, কোতোয়াল, দেওয়ান। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজপুরুষেরা ব্যবহার করেছে ধাঙড় তুলসীদাসকে, মদ খাইয়ে যাকে সহজেই সবকিছু ভুলিয়ে দেওয়া যায়। রাজা-মন্ত্রি-সান্ত্রীর রূপক ব্যবহার করলেও সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটটি এ নাটকে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। নেশা ছুটে যাওয়া তুলসীর উক্তিতে মাঝে মাঝেই ধরা পড়েছে

সমকালে অথবা সর্বকালে দেশের অবস্থা। সান্ত্রী-কোতোয়াল-দেওয়ানের টুকরো উক্তিতেও যে দেশের ছবি ফোটে তা যে আসলে আমাদেরই জননী জন্মভূমি সেকথা বুঝতেও অসুবিধে হয় না। যেমন, চরম অর্থনৈতিক সংকটে দেশ যখন জেরবার, যখন কর্মচারীদের মাইনে দেওয়া যাচ্ছে না তখনও দেশকে 'অনুন্নত' বলা যাবে না ঃ

> "না, অনুন্নত বলবে না কোতোয়াল... বলবে উন্নতিশীল কিংবা উন্নতিকামী দেশ! আমাদের প্রিয় মহারাজ দেশের প্রভূত উন্নতি কামনা করে বিদেশ থেকে প্রতিদিন প্রভূত ঋণ আনয়ন করছেন। এক দেশ থেকে ঋণ এনে আরেক দেশের সুদ মেটাচ্ছেন। দেশের উন্নতিতে তুমি বিশ্বাস হারিয়ো না কোতোয়াল।"[৪১]

যিনি রাতে চুরি করছেন তিনিই দিনে তদন্ত সমিতি বসাচ্ছেন এবং তদন্ত সমিতির পক্ষে জোরদার মামলা করার সুবিধে হবে ভেবে তিনি অপরাধীকে অপরাধ করার সুযোগ দিচ্ছেন, এমন সংবাদ দেশ-কাল-নির্বিশেষে যে কোনো শাসককেই বিদ্ধ করে। রাজা ক্রমাগত ঋণ নিয়ে দেশকে প্রায় বিকিয়ে দিয়েছেন। যারা একসময় আগ বাড়িয়ে ঋণ দিয়েছিল, তারাই এখন পাওনা আদায়ের জন্য চাপ দিচ্ছে। অগত্যা প্রজার সর্বনাশ করা ছাড়া রাজার আর কোনো পথ নেই। প্রকাশ্য কর বসিয়ে অর্থ সংগ্রহ সম্ভব নয়, কারণ তাহলে প্রজারা ক্ষেপে যাবে। দেশের অস্থির অবস্থায় বিদেশী ঋণ বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং প্রজার ধন অপহরণই একমাত্র পথ। রাতে অপহরণ করে দিনে তদন্ত সমিতি বসিয়ে বিদেশের দৃষ্টিতে দেশের আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত দেখানো হচ্ছে। মনোজ মিত্র নাটকের শেষে দেখান, প্রকৃত অপরাধীরা পার পেয়ে যায়, চুরির দায়ে ধরা পড়ে তুলসীদাসের মতো সাধারণ মানুষেরা। রাজা-সান্ত্রী-কোতোয়াল-দেওয়ান সকলে বেরিয়ে যাবার পর গৃহস্থ গৌরহরি যখন তুলসীদাসকে জাপটে ধরে 'চো-ওর ! চো-ওর !' বলে চিৎকার করছে তখন তুলসী দাসের গলা ফাটিয়ে হাসি যেন ব্যবস্থার দিকে আঙুল তুলে নাট্যকারেরই অট্টহাসি।

'টু-ইন-ওয়ান' নাটকে নিঃসন্তান সুলতান যখন নিজের সন্তানলাভ সম্পর্কে আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন, তখন তিনি পিতা হলেন একসঙ্গে জোড়া সন্তানের। পরস্পর পিঠের দিকে জোড়া দুই ছেলের নাম রাখা হ'ল ঝুল মহম্মদ গুল মহম্মদ। সার্জেন অস্ত্রোপচার করে দু'জনকে পৃথক করতে চাইলেও তা কার্যকর করা হয় না ফৈজীর এই যুক্তিতে যে, একসঙ্গে থাকলে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে গোল বাঁধবে না, কেউ কারো বিরুদ্ধে চক্রান্তে করতে পারবে না, পরামর্শের প্রয়োজন হ'লে দু'ইঞ্চি ঘাড় হেলিয়েই তা সম্ভব হবে, আবার এক মুখের হাসি অন্য মুখের কান্না দেখিয়ে জনগণকে বোকা বানানোও সম্ভব হবে। অতএব যুক্ত অবস্থাতেই শাহজাদারা দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠতে থাকে এবং ক্রমেই বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতপার্থক্য প্রকট হয়ে পড়ে। কোনো কিছুতেই তারা সহমত হতে পারে না, অথচ নিয়তি তাদের এক মাংসপিণ্ডে জুড়ে দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে এই নাটক রচনার কিছুদিন আগেই ভারতের কেন্দ্রে আবার নতুন করে শুরু হয়েছে জোট রাজনীতির অনুশীলন। আদর্শগত দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুতে অবস্থিত দুটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতার জন্য কীভাবে সহাবস্থান করে তা বিস্মিত করেছে ভারতবাসীকে। এই নাটকে সম্ভবত সেদিকেও সূক্ষ্ম একটা ইঙ্গিত আছে। ফৈজীর পরামর্শে সুলতান সিংহাসন ছেড়ে দেন শাহজাদাদের। কিন্তু সেখানেও তুচ্ছ বিষয়কে অবলম্বন করে পারস্পরিক বিরোধ। এদিকে এই সুযোগে এগিয়ে আসে বিদ্রোহীরা, বিদ্রোহ দমন

করতে গিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে মরতে মরতে বেঁচে যায় শাহজাদারা, বুঝতে পারে, তাদের নসিব একসঙ্গে গাঁথা। মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফেরা শাহজাদাদের জীবন্ত স্ট্যাচু বানিয়ে দেয় রাজ্যের মানুষ। মনোজ মিত্রের অন্য অনেক নাটকের মতোই এই নাটকে রাষ্ট্রনীতির সমালোচনা আছে, মসনদ নিয়ে লড়াইয়ের প্রতি কটাক্ষ আছে, বৃদ্ধ বয়সেও গদির লোভের প্রতি ব্যঙ্গ আছে, শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনকে বিদ্ধ করা আছে এবং ডাক্তারের অত্যধিক কাঁচিপ্রিয়তার কথাও আছে। কিন্তু তাঁরই অন্যান্য নাটকের মতো এখানে যা নেই তা হ'ল শেষপর্যন্ত কোনো সুস্থ, শুভবোধে উত্তরণ।

এরকম সাধারণীকৃত রাজনৈতিক প্রসঙ্গ মনোজ মিত্রের আরো অনেক নাটকেই আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'মেষ ও রাক্ষস' (১৯৭৯), 'রাজদর্শন' (১৯৮১), 'নৈশভোজ' (১৯৮৪-৮৫), 'কিনু কাহারের থেটার' (১৯৮৮), 'পুঁটি রামায়ণ' (১৯৮৯-৯০) প্রভৃতি নাটকগুলির কথা। সাধারণভাবে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ, রাজনীতি ও রাজনীতিকদের ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রভৃতি এসব নাটকে তাঁর ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনার বিষয় হলেও 'রাজনৈতিক নাটক' এগুলিকে বলা চলে না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কোনো নাটকই সেই অর্থে 'রাজনৈতিক' নয়। কারণ নিজের বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাস থাকলেও দলীয় রাজনীতিতে আস্থাহীন মনোজ কোনো বিশেষ মতাদর্শের বিরোধিতা বা কোনো বিশেষ মতাদর্শ প্রচারের দায় গ্রহণ করেন নি। সাধারণভাবে রাজনীতির স্খলন-পতন দরিদ্র সাধারণ মানুষের জীবনকে যেভাবে বিষিয়ে তোলে তা তাকে ব্যথিত করেছে এবং সেই ব্যথাই তাকে প্রণোদিত করেছে রাজনীতির দিকে ব্যঙ্গের তীর নিক্ষেপে। সেই তীর কখন কোন্ তত্ত্ব বা দলকে আঘাত করছে তা তিনি খেয়াল করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তা সত্ত্বেও 'নেকড়ে', 'চাক ভাঙা মধু', 'শিবের অসাধ্যি' এবং 'নরক গুলজার' নাটকগুলিতে যেভাবে শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের জাগরণ অথবা জয়কে তুলে ধরেছেন তা সমকালের বাংলা নাটকে একটি রাজনৈতিক মতাদর্শের সার্বিক প্রভাবসঞ্জাত বলেই মনে হয়।

উৎপল দত্তের মতো প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক নাটকের রচয়িতা নন মনোজ মিত্র। উৎপল দত্ত শ্রেণিশত্রুর প্রতি সামান্য ক্ষমাকেও শ্রেণি-সমঝোতা বলেই বিশ্বাস করতেন। কিন্তু মনোজ মিত্র সেই ধারার শিল্পী, যিনি ঃ "শ্রেণীসমূহের প্রতি সচেতন থেকেও তার সংগ্রামের সীমাকে কোনো নির্দিষ্ট গন্ডীতে বেঁধে রাখতে চান না।"[৪২] তিনি মানুষ ও সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি-অসঙ্গতিকে দেখতে চেয়েছেন ব্যক্তিগত উপলব্ধির আলোকে। শ্রেণিপরিচয় মনে রেখেও ব্যক্তি মানুষের বিশিষ্টতাকে তুলে ধরেছেন। তাঁর নাটকে রাজনীতি উপরিতলে নয়, গভীরে বহমান। তাঁর প্রথম দিককার নাটকগুলিতে গণনাট্যের রাজনৈতিক ভাবাদর্শই নিঃসন্দেহে জয়যুক্ত হয়েছে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন ঃ

> "গণনাট্যের বিভিন্ন সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব এবং তার অনুসরণে রচিত গণনাট্যগুলির সঙ্গে মনোজ মিত্রের 'চাক ভাঙা মধু', 'শিবের অসাধ্যি', 'সাজানো বাগান' অথবা 'নৈশভোজে' খুব একটা পার্থক্য নেই। গণনাট্য শিল্পী তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' কিংবা গণনাট্যের উত্তরাধিকারী বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবী গর্জনে'র সঙ্গে মনোজ মিত্রের 'নৈশভোজে'র দৃষ্টিভঙ্গিগত কোন বিরোধ চোখে পড়ে না।"[৪৩]

নাট্যকার উৎপল দত্তও 'চাক ভাঙা মধু'কে ব্রেখ্‌টের প্রতিবাদী থিয়েটারের উত্তরাধিকারী বলে

অভিনন্দিত করেছেন ঃ "কার্ড-বাহী অনেক নাটকের চেয়ে এ নাটক আসল ব্রেখ্‌টের অনেক কাছাকাছি। ব্রেখ্‌টের যেটা মর্মবাণী তাঁর বিষয়বস্তু, তাঁর বিদ্রোহের ডাক, চাক ভাঙা মধু সেটিকে আত্মস্থ করে নিয়েছে।"[৪৪]

বাংলা নাটক এবং থিয়েটারের যে সংগ্রামী ঐতিহ্য রয়েছে তাতে কোনো একজন সচেতন নাট্যকারের পক্ষে রাজনীতি সম্পর্কে উদাসীন থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি নিজের নাটককে রাজনৈতিক প্রচারের মাধ্যমে করবেন, অথবা নিজের রাজনীতিবোধকে ব্যবহার করে সামাজিক দ্বন্দ্বগুলিকে বিশ্লেষণ করবেন – তা একান্তভাবে তাঁরই স্বাধীনতা। মনোজ মিত্র দ্বিতীয় ধারাটিকে গ্রহণ করে নিজের ভূমিকা পালন করেছেন। সামাজিক দিক থেকে দুটি ধারাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন বিশিষ্ট সমালোচক ঃ

> "(মনোজ) মিত্রকে অরাজনৈতিক চেতনার নাট্যকার কখনই বলা যায় না, যদিও তিনি উৎপল দত্তের ন্যায় একজন মার্কসবাদী চেতনার নাট্যকার বা প্রয়োজক নন। মার্কসবাদী চেতনায় সমাজ বিশ্লেষণের নাট্যকাররা সাধারণত সোচ্চার রাজনীতির নাটক লেখেন, তাঁরা এক অর্থে রাজনৈতিক প্রচারের ভ্যানগার্ড, অ্যাজিটেটর। রাজনৈতিক থিয়েটারে অ্যাজিটেটরের যেমন গুরুত্ব আছে, তেমনই যেসব জীবনস্রষ্টা নাট্যকার বা শিল্পী রাজনীতিটাকে উপরিতলে না ধরে অন্তস্তলে ধরেন এবং মানবিক ও সামাজিক জীবনের দ্বান্দ্বিকতার মধ্যেই রাজনৈতিক মতাদর্শকে গভীর ব্যঞ্জনাবহ করে তোলেন, তাঁদের গুরুত্বটা কম তো নয়ই, বরং বেশি।"[৪৫]

মনোজ মিত্রের রাজনীতিচেতনার কেন্দ্রে রয়েছে মানুষ, যে মানুষ বহুমাত্রিক। সেই মানুষের জয় দেখানোই মনোজ মিত্রের লক্ষ্য। প্রত্যক্ষ দলকেন্দ্রিক রাজনীতির প্রচারের চেয়ে মানবিক ও সামাজিক জীবনের গভীরে স্থিত এই রাজীনিতিচেতনার মূল্য কিছু কম নয় বলেই মনোজ মিত্রকে অন্যতম সেরা রাজনৈতিক নাট্যকার বলতে চেয়েছেন চন্দন সেন ঃ

> "সবরকম ভন্ডামি, নষ্টামি, আধিপত্যবাদ আর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ, তার সাধারণ জীবন আর অনিঃশেষ ভালোবাসার জয় যে নাটককার শুনিয়ে যাচ্ছেন গত প্রায় পাঁচ দশক ধরে, শাস্ত্রজ্ঞ রাজনীতির পন্ডিত আর তাদের কূপমন্ডুক শিষ্যদের মঞ্চায়িত শ্লোগান আর পোস্টার ছাপিয়ে তিনিই বোধহয় আমাদের সেরা রাজনৈতিক নাটককারদের অন্যতম; জীবনের মতো রাজনীতির চেতনাও যাঁর কাছে কোন গন্ডিবাঁধা চারণ-ভূমিতে আটকে থাকে না।"[৪৬]

রাজনীতির চেয়ে তাঁর নাটকে তাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে রাজনৈতিক বোধ, সেই বোধ সাধারণ মানুষকে জয়ী দেখতে চায়, প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ - শিবনাথ শাস্ত্রী - বিশ্ববাণী প্রকাশনী - কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ.২২৪

২) রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - বঙ্কিম রচনাবলী - দ্বিতীয় খন্ড - কামিনী প্রকাশালয় - ১১৫, অখিল মিস্ত্রী লেন - কলকাতা-০৯, পৃ.৮৩৪-৩৫

৩) নীলদর্পণ - সম্পাদনা ড. শুদ্ধসত্ত্ব বসু ও যতীন্দ্র সেনগুপ্ত - বিশ্বাস বুক স্টল - কোলকাতা-০৯ - ২০০১, পৃ.২১

৪) আধুনিকতার স্বরূপ ও লক্ষণ, বাংলা নাটকে আধুনিকতার কাল নির্ণয় - ড. দীপক চন্দ্র - বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা - দে'জ পাবলিশিং - কোলকাতা-৭৩ - দ্বিতীয় সংস্করণ - ২০০১, পৃ.১৬

৫) ঐ, পৃ.১৭

৬) দৃষ্টিকোণ - ঐ, পৃ.৯-১০

৭) উপসংহার - ঐ, পৃ.২৭৯-৮০

৮) ঐ, পৃ.২৭৯

৯) ঐ, পৃ.২৭৭

১০) কিছু লোক কিছু নাটক - মনোজ মিত্র - বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ - সৃষ্টি প্রকাশন-কলকাতা - ০৯ প্রথম প্রকাশ - বইমেলা, ২০০১, পৃ.১৪

১১) 'চেষ্টা করে নাটককে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখব কীভাবে?' - সঞ্জয় সিংহ কর্তৃক গৃহীত মনোজ মিত্রর সাক্ষাৎকার।

১২) কিছু লোক কিছু নাটক - মনোজ মিত্র - বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ, পৃ.১৫

১৩) ব্যঙ্গের প্রয়োজন কী চাণক্য - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র - বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ, পৃ.৫২

১৪) ঐ, পৃ.৫২

১৫) ঐ, পৃ.৫২

১৬) কিছু লোক কিছু নাটক - মনোজ মিত্র - বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ, পৃ.১৫

১৭) নেকড়ে - মনোজ মিত্র - অপেরা - ৬৫, সূর্য সেন স্ট্রীট - কোলকাতা-০৯ - বৈশাখ ১৩৯৭, পৃ.৭৩

১৮) ঐ, পৃ.৬৩

১৯) ঐ, পৃ.৭১

২০) কিছু লোক কিছু নাটক - বাংলা নাট্য ঃ হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ, পৃ.১৪

২১) ঐ, পৃ.১৫

২২) চাক ভাঙা মধু - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ-মাঘ ১৪০৩, পৃ.৯

২৩) ঐ, পৃ.৩৯

২৪) ঐ, পৃ.৪৮

২৫) ঐ, পৃ.২১

২৬) ঐ, পৃ.২১

২৭) ঐ, পৃ.৩৫

২৮) নাট্যকার মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড - এর ভূমিকা - পবিত্র সরকার, পৃ.৭

২৯) 'শিবের অসাধ্যি নৈশভোজ পুঁটিরামায়ণ' গ্রন্থের মুখবন্ধ - রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - অপেরা - শ্রাবণ ১৪১২,পৃ.৭

৩০) শিবের অসাধ্যি - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ-অগ্রহায়ণ ১৪০১, পৃ.৩০৮

৩১) ঐ, পৃ.৩০৮

৩২) ঐ, পৃ.২৯৪

৩৩) ঐ, পৃ.৩১৭

৩৪) ঐ, পৃ.৩১৯

৩৫) নরক গুলজার - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড -মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ-মাঘ ১৪০২,পৃ.১০৫

৩৬) আনন্দবাজার পত্রিকা - জুন, ১৯৭৭

৩৭) নরক গুলজার - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৭২

৩৮) ঐ, পৃ.৭২

৩৯) নাটককার মনোজ মিত্র - জনপ্রিয়তার দুই দশক - সৌমিত্র বসু - স্যাস্ ১৯৯৩, পৃ. ৮৬

৪০) The tree haunted me - Manoj Mitra - PCP - 25.10.1986

৪১) মহাবিদ্যা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.৪১০

৪২) মনোজ মিত্রের বিশ্বাসের জগৎ - বিষ্ণু বসু - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র -দ্বিতীয় খন্ড-এর ভূমিকা

৪৩) 'শিবের অসাধ্যি নৈশভোজ পুঁটিরামায়ণ' গ্রন্থের মুখবন্ধ - রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ.৭

৪৪) উৎপল দত্ত - এপিক থিয়েটার (১৯৭৩) পত্রিকা। মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ডের 'নাট্য পরিচিতি' অংশে উৎকলিত

৪৫) সুন্দরমের শোভাযাত্রা - নৃপেন্দ্র সাহা - গণশক্তি - ১১.০২.১৯৯২

৪৬) নাট্যকার মনোজ মিত্র ঃ ৪৮ বছরের জমি, জিরেত আর আকাশ - চন্দন সেন - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ডের ভূমিকা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১৩

পুরাণ-আশ্রিত নাটক

প্রত্যয়গত অর্থে 'পুরাণ' বলতে বোঝায় 'পুরাকালীন'। প্রকৃতপক্ষে পুরাণ হ'ল, অতি প্রাচীনকালের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও সমাজধর্ম ইত্যাদি অবলম্বনে রচিত আখ্যায়িকা। তবে সাধারণভাবে প্রাচীন কাহিনি বা উপাখ্যান, মহাকাব্য, ধর্মগ্রন্থ ইত্যাদি, এমনকি প্রাচীন ইতিহাসের ঘটনাবলী ও প্রচলিত লোককথাও পুরাণ বলে গৃহীত হয়ে থাকে। অভিধান মতে, পুরাণ দুই ভাগে বিভক্ত – মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ ইত্যাদি আঠারোটি মহাপুরাণ। এছাড়াও রয়েছে আরো আঠারোটি উপপুরাণ। উনিশ শতকের বাংলাদেশে পৌরাণিক নাটক একটি মুখ্য স্থান অধিকার করেছিল। বাঙালি চরিত্রের ভক্তিভাবুকতা এবং দৈব বিশ্বাস এই ধরণের নাটকের আনুকূল্য করেছে। পুরাণ কাহিনিকে নাটকে রূপান্তরিত করার পক্ষে অনেকগুলি সমস্যা থাকলেও বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রায় এক শতাব্দীব্যাপী যে পৌরাণিক নাটকের জয়যাত্রা অব্যাহত থেকেছে তার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন ঃ

> ''উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই যদিও বাংলা দেশে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চিন্তার প্রসার ত্বরান্বিত হয়েছিল কিন্তু ধর্মপ্রাণ বাঙালী তার পুরাণকে কখনই ত্যাগ করে নি। কৃত্তিবাস-কাশীরামদাসের রচনা উনবিংশ শতাব্দীর জীবনবেদ বলা চলে।''[১]

এসব নাটকে অভিধানিক অর্থের পুরাণের পরিবর্তে রামায়ণ-মহাভারত এবং প্রচলিত লোককথাকেন্দ্রিক লৌকিক পুরাণের ব্যবহারই বেশি হয়েছে। অলৌকিকতা এবং অতিপ্রাকৃতের ব্যবহার, দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার, ভক্তিরসের অবাধ বিস্তার বাংলা পৌরাণিক নাটকের বৈশিষ্ট্য। গিরিশচন্দ্র ঘোষ নিঃসন্দেহে বাংলা পৌরাণিক নাটকের প্রাণপুরুষ। কিন্তু এই ধারাটির সূচনা আরো অনেক আগে। বাংলায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন-কে পৌরাণিক নাটকই বলতে হবে। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রুক্মিণীহরণ', মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক', রাজকৃষ্ণ রায়ের দু' একটি নাটক প্রভৃতি প্রাক্-গিরিশ বাংলা পৌরাণিক নাটক। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'রাবণবধ', 'দক্ষযজ্ঞ', 'নলদময়ন্তী', 'চৈতন্য-লীলা', 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর', 'জনা', 'পাণ্ডবগৌরব' ইত্যাদি। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম' ও 'নরনারায়ণ'ও উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক নাটক।

ভক্তিভাব বর্জন করে পুরাণের ঘটনা ও চরিত্রকে আধুনিক বাস্তবের পটভূমিকায় সন্নিবেশিত করা শুরু হ'ল দ্বিজেন্দ্রলালের সময় থেকে। 'পাষাণী', 'সীতা' ও 'ভীষ্ম' নাটকে তিনি পুরাণকে উপস্থিত করেছেন বাস্তব প্রেক্ষাপটে। পুরাণের আধারে বাস্তব রস পরিবেশনের এই ধারাটি বিশেষ গতি লাভ করে রবীন্দ্রোত্তর যুগে। এ যুগে যাঁরা পুরাণভিত্তিক নাটক লিখলেন তাঁদের নাটকের সঙ্গে পূর্ববর্তী পৌরাণিক নাটকের কোনো সাদৃশ্য নেই। পুরাণের ঘটনা বা চরিত্র গৃহীত হয়েছে কিন্তু ধর্মভাব প্রচার, দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রকাশ প্রভৃতি নাট্যকারের লক্ষ্য নয়। এসব নাটকে কখনো রাজনীতির রূপক হিসেবে পুরাণ ব্যবহৃত হয়েছে, কখনো বা পুরাণের ঘটনা ও চরিত্রকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, কখনো পুরাণের নিন্দিত, অবজ্ঞাত ঘটনা বা চরিত্রকে নতুন দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ আধুনিক জটিল জীবনকে বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশ করার জন্যই পুরাণ ব্যবহৃত হয়েছে। এই ধরণের পুরাণাশ্রিত নাটক রচনার সূত্রপাত বলা যেতে পারে মন্মথ রায় থেকে। তাঁর 'কারাগার' নাটক পৌরাণিক পটভূমিকায় পরাধীন জাতির তীব্র মুক্তিবাসনা। পুরাণের খলচরিত্র কংস এখানে নাট্যকারের সহানুভূতি লাভ করে

ট্রাজিক রস সংবেদনার আশ্রয়। 'দেবাসুর', 'সাবিত্রী', 'চাঁদসদাগর', 'সীতা', প্রভৃতি তাঁর অন্যান্য পুরাণাশ্রিত নাটক। নাটক সবসময়ই যুগবৈশিষ্ট্য, দর্শকরুচি এবং রঙ্গমঞ্চের প্রকৃতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। নাটকের সামাজিক গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন ঃ "সমকালীন যুগ, সমকালীন অভিনেতা এবং সমকালীন দর্শকের মধ্যে সেতুবন্ধনই নাটকের দায়িত্ব — সে নাটক পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ইত্যাদি যে কোন কাহিনী-সঞ্জাত হোক না কেন।"[২] এই কারণেই ভিন্ন ভিন্ন যুগে রচিত একই ধারার নাটকে ভিন্নতা লক্ষিত হয়। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল বা দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে মন্মথ রায়ের পৌরাণিক নাটক তাই মেলে না। প্রত্যেকেই নিজের যুগ ও দর্শকরুচির অনুকূল করে নাটক রচনা করেছেন। এই যুগরুচির পরিবর্তনের ফলেই বিশ শতকে পৌরাণিক নাটকের অবলুপ্তি ঘটল। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জলধর চট্টোপাধ্যায়, মন্মথ রায় প্রমুখ বিশ শতকের ত্রিশের দশক পর্যন্ত পৌরাণিক নাটকের ধারায় কিছু নাটক রচনা করলেও ক্রমশ যুগের চাহিদা হয়ে উঠতে থাকে সামাজিক সমস্যামূলক নাটক। এই প্রেক্ষাপটে পৌরাণিক নাটকের অবলুপ্তির কারণ নির্দেশ করেছেন নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসকার ঃ

> "বাংলার বিগত শতাব্দীর পৌরাণিক নাটক প্রধানতঃ বিশ্বাস ও ভক্তিরসাশ্রিত ছিল, আজ জাতির মন হইতে বিশ্বাস ও ভক্তির ভাব দূর হইয়া গিয়া যুক্তিবাদের বিকাশ হইয়াছে। যুক্তিবাদের সম্মুখে পৌরাণিক আদর্শ টিঁকিয়া থাকিতে পারে না, সেইজন্য আধুনিক যুগে পৌরাণিক নাটকের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না।"[৩]

কিন্তু পুরাণপ্রীতি বাঙালির মজ্জাগত। গিরিশচন্দ্র যথার্থই বলেছিলেন, 'বাঙালির মর্মে মর্মে ধর্ম, মর্মাশ্রয় করিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।' আজও পুরাণের আধারে যে কোনো বিষয়ের উপস্থাপনা বাঙালি পাঠক-দর্শকের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য ও বোধগম্য হয়ে থাকে। তাই আধুনিককালেও অনেক নাট্যকার সামাজিক সত্য প্রকাশে পুরাণকে আশ্রয় করে থাকেন। আলঙ্কারিক লক্ষণ অনুসারে এগুলি পৌরাণিক নাটক নয়, এদের বলা চলে পুরাণ-নির্ভর নাটক। নতুন যুগের এই নাটক সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন ঃ

> "এগুলি পৌরাণিক নাটক নয়, এদের বলা চলে 'পুরাণ-নির্ভর নাটক'। সিদ্ধরসের নিখুঁত অনুসারী পৌরাণিক নাটক রচনা আর সম্ভব নয়। পুরাণের পরিচ্ছদে সমকালই সেখানে প্রতিষ্ঠা পায়, যেমন পাচ্ছে লোহার ভীম, কুরুক্ষেত্র, মারীচ সংবাদ, নরক গুলজার, শিবের অসাধ্যি ইত্যাদি নাটকে। উত্তরকালেও এমনই ভাবে আরো অসংখ্য পুরাণ নির্ভর নাটক লেখা হতে পারে যার নায়ক নায়িকা হয় অভিমন্যু, নয় মেঘনাদ কিংবা সীতা — অবশ্যই তাঁদের জীবন সমস্যার সঙ্গে ভবিষ্যতের মানুষের সমস্যা মিলবেই। এইভাবেই জন্ম নেবে নতুন পৌরাণিক নাট্যধারা।"[৪]

মনোজ মিত্রের নাট্যরচনার শিকড় প্রোথিত দেশজ মাটিতে। তাঁর যে কোনো নাটকই প্রবলভাবে সামাজিক কিন্তু সেই সামাজিক বিষয়কে তিনি প্রকাশ করেছেন দেশজ সংস্কৃতির বিভিন্ন আধারে। সে আধার কখনো পুরাণ, কখনো গ্রামীণ বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি কখনো বা কথকতার ভঙ্গি। পটভূমি হিসেবে তিনি পুরাণকে ব্যবহার করেছেন 'অশ্বত্থামা' (১৯৬৩ / ১৯৭২-৭৩), 'তক্ষক' (১৯৬৭), শিবের অসাধ্যি (১৯৭৪), 'নরক গুলজার (১৯৭৪), 'পুঁটি রামায়ণ' (১৯৮৯-৯০), 'যা নেই ভারতে' (২০০৫), 'ভেলায় ভাসে সীতা' (২০০৭), 'হনুমতী পালা বা মন্দোদরী হরণ' (২০০৯) নাটকে। এরমধ্যে 'শিবের অসাধ্যি', 'নরক গুলজার' এবং 'পুঁটি রামায়ণ'-এ সমকালীন সমাজ-

রাজনীতির প্রত্যক্ষ ছায়াপাত ঘটেছে বলে এই নাটকগুলিকে 'রাজনৈতিক' বর্গের অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। এই বর্গে আমরা প্রধানত আলোচনা করব 'অশ্বত্থামা', 'তক্ষক' এবং 'যা নেই ভারতে' নাটক তিনটির। ১৯৬৩ সালে রচিত এবং ১৯৭২-৭৩ সালে পুনর্লিখিত 'অশ্বত্থামা' নাটকের কাহিনিসূত্র সংগৃহীত হয়েছে মহাভারতের 'সৌপ্তিক পর্ব' থেকে। গদাঘাতে ভগ্নোরু দুর্যোধন পড়ে আছেন কুরুক্ষেত্রের এক প্রান্তে। বুকে তাঁর প্রতিহিংসার দুরন্ত বাসনা। কৃপাচার্য, কৃতবর্মা এবং অশ্বত্থামা এসেছেন দুর্যোধনের কাছে। দুর্যোধনের বিলাপ এবং ভীমের অন্যায় আচরণের বর্ণনা শুনে উত্তেজিত অশ্বত্থামা একাই পান্ডববিনাশের সংকল্প করেছে। নিশীথ-অভিযানে কৌরব সেনাপতি পদে বৃত হয়েছে অশ্বত্থামা। রাত্রির অন্ধকারে তিন বীর চললেন পান্ডব শিবিরের দিকে। কৃপাচার্য অশ্বত্থামাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ঃ

"... হেন কর্ম না হয় উচিত।
নিদ্রিত জনেরে নাহি মারি কদাচিৎ।।"[৫]

এই পরামর্শে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন অশ্বত্থামা। জন্মাবধি অন্নদাতা দুর্যোধনকে তুষ্ট করতে তিনি পাণ্ডবসংহারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ – হোক তা অন্যায় যুদ্ধে। পাণ্ডবের শিবির রক্ষা করছেন স্বয়ং মহাদেব। যুদ্ধে তাঁকে পরাস্ত করতে না পেরে অশ্বত্থামা মহাদেবের স্তব করলেন। প্রীত মহাদেব পান্ডবপুরী রক্ষার একবছরের শর্ত পূরণ হয়েছে বলে অশ্বত্থামাকে দ্বার ছেড়ে দিলেন, সঙ্গে দিলেন নিজের খড়্গ। সেই খড়্গের আঘাতে পঞ্চপান্ডব ভ্রমে মুন্ডচ্ছেদ করলেন দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের। পরম উল্লাসে ছিন্নশির নিয়ে এসে যখন দেখালেন দুর্যোধনকে, তখন নির্বংশ হবার শোকে দুর্যোধন দেহত্যাগ করলেন।

মহাভারতীয় এই কাহিনীকে সামান্য রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নাটকে গ্রহণ করেছেন মনোজ মিত্র। আধুনিক নাটক বলেই মহাদেব কর্তৃক পান্ডবের দ্বাররক্ষা এবং অশ্বত্থামার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের অলৌকিক ঘটনাটি এড়িয়ে গেছেন। তার পরিবর্তে পান্ডবদের শিবিরে অসতর্কতার কারণ হিসেবে নির্দেশ করেছেন তাঁদের শোকরজনী পালনকে। বর্ণনামূলক মহাকাব্যের কাহিনিকে করে নিয়েছেন দ্বন্দ্বমূলক নাটকের উপযোগী। এই দ্বন্দ্বমুখরতা প্রধানত চরিত্র-আশ্রয়ী। মহাভারতে কৃপাচার্য অশ্বত্থামার সৈনাপত্য গ্রহণের কোনো বিরোধিতা করেন নি। কৃতবর্মার সঙ্গে তিনিও সংগ্রহ করে এনেছেন অভিষেকবারি। কিন্তু সেখানে ইঙ্গিত ছিল কৃপাচার্যের ভিন্ন ভাবনার। অশ্বত্থামা নিদ্রিত পান্ডবদের হত্যার পরিকল্পনা করলে তিনি বাধা দিয়েছেন। সদসৎ ভাবনা তাঁর চরিত্রে ছিল, আর ছিল অশ্বত্থামার প্রতি ভালোবাসা। এই ইঙ্গিতের সুযোগ নিয়ে মনোজ মিত্র কৃপাচার্যকে স্থাপন করেছেন আধুনিক শাসকশক্তির যুদ্ধবাসনার বিপ্রতীপে। শাস্ত্রজীবী এই ব্রাহ্মণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও সারাজীবন অন্নদাতা দুর্যোধনের সঙ্গ দিয়েছেন – কুরুবংশের স্বার্থরক্ষা করেছেন। কুরুক্ষেত্রের আকাশ-বাতাস যখন মৃত্যুর নিঃশ্বাসে ভারী তখন তিনি অশ্বত্থামাকে নিয়ে পান্ডবের মার্জনা ভিক্ষা চাইতে যেতে চেয়েছেন অথবা বহুদূরে কোথাও নিভৃত কুটিরের শান্ত আশ্রয়ে অশ্বত্থামাকে জ্ঞানশিক্ষা দিতে চেয়েছেন। অশ্বত্থামার সৈনাপত্য গ্রহণের বিরোধিতা করেছেন তিনি। দীর্ঘ ধ্বংসলীলার শেষে বিপুল শক্তিকে আহ্বান করেছেন সৃজন-স্বপ্নের দিকে। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির হননেচ্ছার কাছে ব্যর্থ হয়ে গেছে সে স্বপ্ন। অশ্বত্থামাকে নিশীথ-অভিযানের সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। বুঝেছেন, রাজার অন্ন সত্যিই গুরুপাক। সে অন্নের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আর বিষক্রিয়া গলা টিপে ধরে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার। যাঁর স্বপ্ন দেখে সুস্থ সবল মানব সমাজের, শাসকের ইচ্ছায় তাঁদের হাতেই ধ্বংস হয় ভবিষ্যৎ। রাজার পালিত ঘাতক যে কোনোদিন মহান ধর্মকে চূর্ণ করতে পারে না – নাটকের শেষে এই বার্তা ঘোষিত হয়েছে কৃপাচার্যের কন্ঠে।

কৃতবর্মা মহাভারতে নির্বাক চরিত্র। নাট্যকার মনোজ মিত্র এই চরিত্রটিকে কৃপাচার্যের সৃজনভাবনার বিপরীতে ধ্বংসের প্রতীক রূপে প্রতিষ্ঠিত করে নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছেন। রাষ্ট্রশক্তির সহায়ক এই চরিত্রের মাধ্যমেই ঘোষিত হয়েছে রাষ্ট্রের আদেশ। সে আদেশের সঙ্গে কখনো মিশে গেছে ব্যক্তিগত ইচ্ছাও। অশ্বত্থামাকে কৃপাচার্যের প্রভাব থেকে মুক্ত করে যুদ্ধে উদ্বোধিত করতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন কৃতবর্মা। অশ্বত্থামাকে নিয়ে তাঁর এবং কৃপাচার্যের টানাপোড়েন নাটককে গতিমুখর করেছে। রাজানুগত্য এবং সেই সূত্রে রাজকীয় ক্ষমতার আংশিক আস্বাদন কৃতবর্মা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। পান্ডবনিধনে ক্ষুদ্র ভোজ রাজ্যের রাজা হয়েও যে তার ভূমিকা থাকছে – এই ভেবে তিনি উল্লসিত। অশ্বত্থামা যতবার হতাশায় ভেঙে পড়েছে কিংবা কৃপাচার্য তাঁকে উদ্বোধিত করেছেন শান্তির বাণীতে, ততবার কৃতবর্মা তাঁকে উত্তেজিত করেছেন যুদ্ধে, তাঁর মধ্যে জাগিয়েছেন ধ্বংসের উদ্দীপনা। রাজা দুর্যোধনের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই এই নাটকে – রাজার প্রতিভূরূপে আছেন কৃতবর্মা। রাষ্ট্রের পক্ষে তিনিই চেয়েছেন প্রতিদান ঃ ‘‘অনাহারে শুকিয়ে একবস্ত্রে ঐ শিশুপুত্রের হাত ধরে দাঁড়াননি কুরুরাজের দুয়ারে হাত পেতে? ... কে আশ্রয় দিয়েছিল ... কে অন্ন দিয়েছিল ... কে দুবেলা শাস্ত্রপাঠের সুযোগ দিয়েছিল আপনাদের।’’[৬] এভাবেই যুগে যুগে রাষ্ট্র কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-সাধকের কাছে চেয়েছে প্রতিদান। উশুল করেছে অন্নের মূল্য। কৃতবর্মা সেই শাসক শক্তির সহায়ক যাঁরা সব কিছুকে বিচার করেন স্বার্থের মাপকাঠিতে। কৃতবর্মা চতুর, কূটকৌশলী। কৌশলে তিনি পান্ডবশিবিরের অসতর্ক অবস্থার কথা জেনে নিয়েছেন কৃপাচার্যের কাছে আর সেই সংবাদে অশ্বত্থামাকে প্রলুব্ধ করে প্রবৃত্ত করেছেন যুদ্ধে।

মহাভারতের অশ্বত্থামা চরিত্রে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। প্রথম থেকেই সে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে উন্মুখ। কিন্তু নাটকের অশ্বত্থামা তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ। এই দ্বন্দ্বই চরিত্রটিকে ট্র্যাজিক করেছে – আধুনিক নাটকের উপযোগী করেছে। অনন্যসাধারণ বীর অশ্বত্থামা এমন সময় কৌরব সেনাপতির দায়িত্ব পেয়েছে, যখন তাঁর আর কিছুই করার নেই। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য এই চারজনের পর পঞ্চম কৌরব সেনাপতি অশ্বত্থামার সঙ্গী কেবল কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মা। দায়িত্ব নিশীথ-অভিযানের, পঞ্চপাণ্ডব সংহারের। যুদ্ধের প্রথমদিন তাঁকে সেনাপতি করলে ফল অন্যরকমও হতে পারত। কিন্তু তখন জুটেছে শুধুই উপেক্ষা। অশ্বত্থামা অভিমানী হয়েছে, তবু আজীবন থেকেছেন কৌরব-অনুগত, দুর্যোধনের রক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ। কিন্তু আজ কুরুক্ষেত্রের মহারণের অন্তিমপর্বে হিসেব যে তাঁর মিলছে না। আঠারো দিনে আঠারো হাজার মানুষ হত্যা করেও মূল লক্ষ্য যে আজও অধরা – পাণ্ডব এখনও জীবিত। আবার দুর্যোধনকেও তিনি রক্ষা করতে পারেন নি। সারাজীবন কি কেবল ভুল করে গেলেন? বীরশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা রাজশক্তিকে রক্ষা করতে না পেরে গ্লানিজর্জর, কুরুক্ষেত্রে সহস্র বক্ষের অকারণ রক্তপাতে অনুতপ্ত, একবারও প্রকৃত লক্ষ্যে আঘাত হানতে না পেরে হতাশ, অন্তত একবার সাফল্যের জন্য লোলুপ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের এই শেষলগ্নে একদিকে দুর্যোধনের প্রতিনিধি কৃতবর্মা তাঁকে যুদ্ধে উত্তেজিত করেছেন, অন্যদিকে মাতুল কৃপাচার্য তাঁকে আহ্বান জানিয়েছেন নির্জন নিভৃত জ্ঞানতপস্যার শান্ত আশ্রয়ে। কোন্ দিকে যাবে সে – এই দ্বন্দ্বেই মহাভারতের অশ্বত্থামা হয়ে উঠেছে আধুনিক জটিল জীবনের সংক্ষুব্ধ চরিত্র। কখনো ভেবেছে, কৌরব বা পাণ্ডব কোনো রাজদ্বারেই আর কৃপাভিক্ষা করবে না, মাতুল কৃপাচার্যকে নিয়ে চলে যাবে দূর নির্জনে। গুল্মলতায় কুটির বাঁধবে, দুরন্ত শীতে কদম গাছের নিচে আগুন জ্বালবে, শৈলচূড়া থেকে আনবে দ্রাক্ষাফল, বনে বনে শিকার করবে কচি হরিণ, বৃদ্ধ

সজারু। সন্ধ্যাবেলায় কৃপাচার্যের পায়ের কাছে বসে শুনবে 'ভূলোক দ্যুলোক নভোমন্ডল আর জীবনের অগাধ সব রহস্যকথা', সব রক্ত মুছে ফেলবে, নীরবে নিভৃতে অশ্রুপাত করে ধুয়ে দেবে দু'চোখের অন্ধতা। কিন্তু ঘাতক শাসক কেন সুস্থ জীবনে ফিরে যেতে দেবে তার পালিত ঘাতককে? তাই স্বপ্নাবেশের পর মুহূর্তেই কৃতবর্মা অসতর্ক পাণ্ডবশিবিরের সংবাদ দিয়ে অশ্বত্থামার মধ্যে জাগিয়ে তোলেন সাফল্যের জন্য লুব্ধতা। সেই যে শৈশবে দুর্যোধন তাঁর কুলনাশ করে ব্রাহ্মণত্ব ঘুচিয়ে বুকে এঁকে দিয়েছিলেন ক্ষত্রিয়ের রক্ততৃষ্ণা — আজ উপযুক্ত অবসরে জিহ্বা বিস্তার করেছে সেই তৃষ্ণা। সারাজীবন যে সাফল্যের সন্ধান সে করেছে, আজ তার সুযোগ। বিভ্রান্তির আর কোনো অবকাশ নেই। শোকমগ্ন পান্ডবেরা নিরস্ত্র, ধ্যানমগ্ন। একসঙ্গে পাওয়া যাবে পাঁচজনকে। চকিতে জেগে ওঠে অশ্বত্থামার ক্রমাগত ব্যর্থ হতে থাকা সাফল্যলুব্ধ মন। প্রস্তুত হয় সে নিশীথ-অভিযানের জন্য। রাতের অন্ধকারে পান্ডব শিবিরে ঢুকে ছিন্ন করে পঞ্চশির। উপহার দিতে আনে দুর্যোধনকে। কিন্তু কৃপাচার্য আবার জাগান দ্বন্দ্ব। কে শত্রু, কেন শত্রু? যে পান্ডবেরা ধর্মরাজ্য গড়তে চেয়েছে তাঁরা কেন হবে অশ্বত্থামার শত্রু? শৈশব থেকে ভুল শত্রু চিনিয়েছে শাসকশক্তি। পান্ডবদের ওপর নিজের কোনো রোষ তো ছিল না অশ্বত্থামার। সে কেবল রাজার বিকৃত বাসনা চরিতার্থ করেছে মাত্র। এবার অশ্বত্থামার মানসদ্বন্দ্ব — তবে কি এতদিন সে স্বজনবধ করল? আজন্ম যা সত্য বলে জেনেছে, আজ কৃপাচার্যের কথায় যখন তা মিথ্যে বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে তখন অশ্বত্থামা মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। শত্রু-মিত্র, ভালো-মন্দ জ্ঞান তাঁর গুলিয়ে যাচ্ছে। শক্তি চাইছে সে চিরদিনের আশ্রয় দুর্যোধনের কাছে : "মহারাজ, আমাকে উদ্ধার করো ... আমি বড় একা। ... তুমি আমাকে ঘিরে থাকো। দূর করো যত লজ্জা সংশয় ভয় ... শক্তি দাও।"[৭] এই আশ্রয় না পেলে লুপ্ত হয়ে যায় অশ্বত্থামার অস্তিত্ব। এখানেই তাঁর ট্র্যাজেডি। এতদিন যাঁকে ধ্রুব বলে জেনে নিজের প্রাণপাত করেছে, আজ দেখছে তার স্বার্থান্ধ রূপ। আর যাঁদের জেনেছে শত্রু বলে — তাঁদের মধ্যেই খুঁজে পাচ্ছে স্বজনকে। এই নিরালম্ব অবস্থায় শাসককে আঁকড়ে ধরেই সে শক্তি পেতে চেয়েছে, বিবেকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শেষবারের মতো ঘুরে দাঁড়াতে চেয়েছে। রাজাকে বলেছে :

> "বলো মহারাজ, এই শেষ রক্ত! ... আর হিংসা নয়, আর ধ্বংস নয় — এবার সৃজন! ... বলো মহারাজ, এই ধরিত্রীর তৃণমূলে জল দেব। তাকে লালন করব! অনাবৃত ধরণীর উলঙ্গ রূপ ঢেকে দেব পল্লবিত বিকাশে .."[৮]

কিন্তু আবারও যে ভুল! পঞ্চপাণ্ডবের পরিবর্তে সে হত্যা করেছে তাঁদের পাঁচ শিশুপুত্রকে। অশ্বত্থামার নিদারুণ ট্রাজিক উচ্চারণ : "ভুল! ভুল! আবার ভুল করেছি আমি ... অন্ধ! অন্ধ! আমি ভীষণ অন্ধ!"[৯] নিজের অজ্ঞাতেই অশ্বত্থামা হয়ে গেছে 'নরঘাতী যৌবন'।

মনোজ মিত্র নিজেই বলেছেন যে, বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদ তাঁর আছে কিন্তু দলীয় রাজনীতিতে আস্থা নেই। প্রত্যক্ষ রাজনীতির আঁচ তাঁর নাটকে তাই কম। তবে সাধারণভাবে রাজনীতির স্খলন-পতনের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তাঁর নাটকে দেখা যায়। মনোজ মিত্রের যে সামান্য কয়েকটি নাটকে সমকালীন প্রত্যক্ষ রাজনীতির ছায়াপাত ঘটেছে বা বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে 'অশ্বত্থামা' তাদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও এই নাটকের অনেক অংশই সমানভাবে শাসকশক্তির বিরোধী। কারণ রাষ্ট্রশক্তির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি সব যুগেই মোটামুটি এক। ১৯৭২-৭৩-এ পুনর্লিখিত এই নাটকে সাতের দশকে

পশ্চিমবঙ্গের উত্তাল রাজনীতির ছায়া আছে। পুরাণের অশ্বত্থামাকে অবলম্বন করে মনোজ মিত্র দেখিয়েছেন, সমকালের শাসক শ্রেণির অনুগত বাঙালি যুবকের চিত্তের উদ্‌ভ্রান্তি। শাসকের প্ররোচনায় ভুল হয়ে গেছে শত্রু-মিত্র বিচার। ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষমতা লুপ্ত – শুধু নির্বিচারে আদেশ পালন করে যাওয়া। নিজের বিকৃত বাসনা চরিতার্থ করতে যৌবনকে কাজে লাগিয়েছে শাসকশক্তি, তাকে করে তুলেছে 'নরঘাতী'। যে যৌবন ভাঙাচোরা পৃথিবীতে বলিষ্ঠ মানবসমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিল, সেই যৌবনকে শাসকশক্তি চালিত করেছে বিপথে। যে শক্তি ছিল এই নতুন পৃথিবী গড়ার কারিগর, শাসকের প্ররোচনায় সেই স্বজনকেই হত্যা করেছে অশ্বত্থামার মতো ট্র্যাজিক যৌবন। এই ব্যর্থ যৌবনের হাহাকারে ভারী হয়ে আছে নাটক, যেমন ভারী হয়েছিল সমকালীন পশ্চিমবঙ্গেঃ ''শত্রু চিনি না! শত্রুকে আঘাত করতে পারি না! শেষ মুহূর্তে ভুল করি! একটা দৃষ্টিহীন বিশাল খড়্গ কাঁধে আমি জনারণ্যে ঘুরপাক খাই।''[১০] সমকালীন রাজনীতি সমাজে যে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করেছিল তার ছবি এঁকেছেন মনোজ মিত্র রূপকের অকারে। কুরুক্ষেত্র উঠে এসেছে সমাজ-বাস্তবতার ক্ষত বুকে ধারণ করে ঃ

''কৃপ ।। ... অশ্বত্থামা, কুরুক্ষেত্রে কাতারে কাতারে মৃতদেহ ...

অশ্ব ।। নিরন্তর বন হতে পিপীলিকার সারি ফেলে ...

কৃপ ।। বেরিয়ে আসছে শৃগাল কুকুর ...

অশ্ব ।। আকাশে শকুনি ... কৃষ্ণকায় উল্কা ...

কৃপ ।। মহাভোজ ... দেশ জুড়ে আজ মহাভোজ। ষট্‌বিংশতি সহস্র মানুষ।

অশ্ব ।। অকারণ ... কী অকারণ রক্তপাত।''[১১]

ক্রমাগত ভুল মানুষ হত্যা করে করে ক্লান্ত যৌবন আজ আত্মঘাতী হতে চায়। এই যৌবন আদর্শের প্রতি অনুগত ছিল, আদর্শের কাছে আশ্রয় চেয়েছিল। কিন্তু আদর্শের মধ্যেই যখন দেখেছে স্বার্থান্ধতা, তখন নিরালম্ব হয়ে পড়েছে। দুর্যোধনের সহায়তা নিঃস্বার্থ ছিল না, অনুগ্রহের বিনিময়ে সে কিনতে চেয়েছে আনুগত্য। মাতুল কৃপাচার্য অশ্বত্থামার দৃষ্টি উন্মোচিত করেছে, তাকে জানিয়েছে, রাজার অন্ন কখনো নিঃশর্ত হতে পারে না। আদর্শের এই স্খলন বিভ্রান্ত করেছে অশ্বত্থামাকে। কিন্তু তবু আদর্শকে ছেড়ে যেতে পারে না সে। শাসক দুর্যোধনের হাতে ব্যবহৃত যৌবন অশ্বত্থামা, কিন্তু যখন সে তা উপলব্ধি করে তখন অনুতাপই হয় একমাত্র সম্বল। রাষ্ট্রের পালিত এই ঘাতকবাহিনীর উল্লেখ সত্তরের দশকের পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বাস্তবতাকেই স্মরণ করায়। এই ঘাতকবাহিনীর বিনাশ অনিবার্য বলে আশা প্রকাশ করেছেন নাট্যকার এবং কপিধ্বজ রথে পান্ডবদের আগমনবার্তার মধ্যে দ্যোতিত করেছেন বামপন্থী আদর্শ প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিতকেই। অর্থাৎ এই নাটকে মনোজ মিত্র পুরাণকে ব্যবহার করেছেন একটি বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থা থেকে মুক্তির তাগিদে এবং একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিষ্ঠার বাসনায়। কৃপাচার্যের সংলাপে সেই অভিপ্রেত বক্তব্যেরই প্রকাশ ঃ

> ''ঘাতক আমরা, রাজার পালিত ঘাতক ... আমাদের সাধ্য কি কৃতবর্মা, মহান ধর্মকে চূর্ণ করি। যুগে যুগে মৃত্যুর নাগপাশ ছিন্ন করে বেরিয়ে আসবে সে – অধর্মের বিনাশে! ... ঐ কপিধ্বজ রথে দ্যাখো গান্ডীবধারী অর্জুন! নাশ করবে ... নাশ করবে এই ভ্রষ্ট যোদ্ধাদের! মহাকালের বিচার! মুক্তি নেই ... আমাদের মুক্তি নেই ...''[১২]

ধর্মযোদ্ধাদের হাতে ভ্রষ্ট যোদ্ধাদের বিনাশ এবং তারপর এক নতুন সামাজিক ব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষা করেছেন মনোজ মিত্র।

এই নাটকে সংলাপ রচনায় আশ্চর্য সিদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন নাট্যকার। মহাভারতীয় গাম্ভীর্য যথাযথ রক্ষিত হয়েছে। ভাষা হয়েছে ওজস্বিনী। কৃপাচার্যের আক্ষেপ, কৃতবর্মার চাতুর্য এবং অশ্বত্থামার ট্র্যাজিক হাহাকার প্রকাশে এই নাটকের সংলাপ অতুলনীয়। কতগুলি জায়গায় নাট্যসংলাপ কাব্যসৌরভমণ্ডিত। যেমন কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মা যখন দুই বিপরীত দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন অশ্বত্থামাকে ঃ

"কৃপ ।। চলে এসো অশ্বত্থামা ...

অশ্ব ।। ... বেলা ডুবে যায় গোধূলি হারায় ... আঁধার ঘনায় শিলায় শিলায় ...

কৃত ।। আঁধার ... আঁধার নামছে! প্রশস্ত লগ্ন ...

অশ্ব ।। শৈলচূড়ে গুল্মলতায় ...

কৃপ ।। আঁধার ঘনায় পেঁচার চোখে ...

অশ্ব ।। রাত্রি নামে নদীর কূলে ... বৃক্ষশাখায় ... চরাচরে ..."[১৩]

এধরণের সংলাপ মঞ্চের মায়াময় প্রতিবেশে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন চরিত্রের কণ্ঠে উচ্চারণে অপূর্ব নাট্যমুহূর্তে সৃষ্টি হয়। তাছাড়া এই সংলাপ পাঠ্যনাটক হিসেবেও নাটককে সার্থক করে তোলে। দীর্ঘ অনাবশ্যক ভুল রক্তপাতের পর অন্তত একটি সার্থক লক্ষ্যভেদের জন্য অশ্বত্থামার তীব্র আকুলতা ঃ "একটা পাহাড় — কয়েকটা পতিত শস্যক্ষেত্র আর একটা শূন্য জনপদ পার হতে পারলে আমার সাফল্য! সঠিক শিকার! একটা রাত্রি! রাত্রিশেষে মুছে যাবে আমার সমস্ত অকীর্তি।"[১৪] আবার অশ্বত্থামা যেখানে কৃতবর্মাকে বর্ণনা দিচ্ছেন পাণ্ডবসংহারের ঃ

"অশ্ব ।। দেখি পাঁচ ভাই শ্রান্ত ক্লান্ত পাশাপাশি শুয়ে ...

কৃত ।। ঘুমায় ওরা?

অশ্ব ।। ঘুমায় ওরা, বর্মবিহীন সংজ্ঞাহীন শিথিল বেশবাস ...

কৃত ।। শিয়রে প্রদীপ ...

অশ্ব ।। জ্বলে না প্রদীপ, একটিও ধূপ ... শিয়রে তাদের খোলা বাতায়ন ...

কৃত ।। বাহিরে জ্যোৎস্না?

অশ্ব ।। কোমল জ্যোৎস্না লুটায় তাদের বাজুপরে আর কেশদামে ...

কৃত ।। হ্যাঁ হ্যাঁ ...

অশ্ব ।। মন্দ বাতাস বহিছে সেথা, থরথর ভাসে বনযূথিকার বাস ...

কৃত ।। বাহিরে ঝিল্লি?

অশ্ব ।। বাহিরে ঝিল্লি নীরব হলো! মিলায় জ্যোৎস্না ... হারায় দৃষ্টি ... কোথা গেল চলি
সিক্ত যূথীর বাস ..."[১৫]

ক্রিয়াপদের সামান্য স্থান পরিবর্তনে এবং সুনির্বাচিত শব্দের ব্যবহারে গদ্যসংলাপ এখানে কাব্যময়তায় উত্তীর্ণ। গোটা নাটক জুড়েই এধরণের সংলাপের বিপুল আয়োজন। কখনও তা বিশ্লেষণ করেছে চরিত্রের অন্তর্লোক, কখনো উদ্ভাসিত করে তুলেছে রক্তস্নাত ভারতবর্ষের স্বরূপ। কেবল সংলাপ নয়, এই নাটকের মঞ্চনির্দেশগুলিও অপূর্ব সাহিত্যগুণমন্ডিত। মনোজ মিত্র যেন বিস্মৃত হয়েছেন, তিনি অভিনেয় নাটক লিখেছেন, না গল্প-উপন্যাস-কবিতার মতো পাঠ্য সাহিত্য সৃষ্টি করছেন। এর ফলে নাটকটি পাঠ করার সময় সংলাপের গাম্ভীর্যের সঙ্গে মঞ্চ নির্দেশের যথাযোগ্য সঙ্গত অপূর্ব স্বাদুতার সৃষ্টি করে। যেমন, নাটকের সূচনায় ঃ

> ''তখন গোধূলিবেলা। দিগন্তে উজ্জ্বল হলুদ আলো। প্রান্তরের মাঝখানে একটি যুদ্ধরথ দাঁড়িয়ে ছিল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অবস্থায়। ... কৃপের বিস্ফারিত দৃষ্টি সম্মুখে দূরদূরান্তে স্থির, অনিমেষ। কৃতবর্মাও নীরব নিশ্চল ভয়ার্ত। চরাচর নিঃশব্দ।''[১৬]

এ নিছক মঞ্চনির্দেশের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বস্থিত পরিবেশ ও চরিত্র ব্যাখ্যা। মঞ্চনির্দেশে মনোজ মিত্র যখন লেখেন ঃ ''দিঙ্মন্ডলের আলোকে অশ্বক্ষুরের পুঞ্জ পুঞ্জ ধূলি উড়ছিল — রাশি রাশি স্বর্ণচূর্ণ যেন।''[১৭] তখন তিনি যেন মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করেন আসন্ন সন্ধ্যায় ভগ্নোরু দুর্যোধনের কাছে অশ্বত্থামার আগমনকে। মঞ্চনির্দেশে একেবারে পাঠ্য সাহিত্যের মতো উপমাও ব্যবহার করেন তিনি। যেমন ঃ ''অশ্বত্থামা অভিমানী সর্পের মতো বড় বড় নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে থাকে।''[১৮] নাটকের মঞ্চরূপেই কথা নিশ্চয়ই খেয়াল থাকে না তাঁর, যখন তিনি নিবিষ্ট মনে লেখেন ঃ ''নেপথ্যের একাধিক যুদ্ধাশ্বের হ্রেষারব ঘনায়মান অন্ধকারকে ভারী করে তুলছিল।''[১৯] নিশীথ পর্বের সূচনাটি তো ঠিক যেন একটি ছোটগল্পের প্রথম কয়েকটি বাক্য ঃ

> ''তখন মধ্যরাত্রি। ঘনঘোর তমসা। প্রান্তরে পরিত্যক্ত রথখানির ভিতরে মৃদু আলো জ্বলছিল। তারই আলোছায়ায় চতুর্ধার চিত্রিত। দিগ্বলয়ে বিন্দু বিন্দু তিনটি মশাল জ্বলে উঠতে দেখা গেল। ক্রমে অশ্বক্ষুরধ্বনি ভেসে এলো। তিনটি বেগবান তুরঙ্গম মধ্যনিশীথ প্রকম্পিত করে তাদের প্রত্যাবর্তন ঘোষণা করছিল। রথের মধ্যে নিদ্রা টুটলো সেই অদৃশ্য রথী দুর্যোধনের। তার চেতনা দলিত মথিত করে অশ্বগুলি এগিয়ে আসছে।''[২০]

এইভাবে অভিনেয় নাটক একই সঙ্গে পেয়েছে পাঠ্য নাটকের গৌরব। পুরাণকে সমকালীন প্রেক্ষাপটে স্থাপন করায়, আধুনিক মানুষের হৃদয়যন্ত্রণা প্রকাশে, দূষিত রাজনীতির প্রভাবে মানবতার লাঞ্ছনার করুণ চিত্রাঙ্কনে, বিষয়োপযোগী ভাষার ব্যবহারে 'অশ্বত্থামা' হয়ে উঠেছে মনোজ মিত্রের একটি সার্থক সৃষ্টি।

নাট্যকার হিসেবে মনোজ মিত্রের বৈশিষ্ট্যই হ'ল — নাট্যভাবনায় একটা বিষয় যখন এল, তখন তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একাধিক নাটকে ব্যবহার করা। এভাবেই তিনি ১৯৬৭ সালে পুরাণ আশ্রয় করে আবার লিখলেন একাঙ্ক নাটক 'তক্ষক'। মহাভারতের আদিপর্বে শৃঙ্গী কর্তৃক মহারাজ পরীক্ষিৎকে শাপদান এবং তার প্রতিক্রিয়া এই নাটকের বিষয়। 'অশ্বত্থামা'য় পুরাণ ব্যবহৃত হয়েছিল সমকালীন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে আঘাত করতে, তাই সেখানে ছিল রাজনীতির প্রত্যক্ষ উত্তাপ। কিন্তু 'তক্ষক' নাটকে জীবন-সম্পর্কিত বিশেষ এক দর্শনকে তিনি প্রকাশ করেছেন। মৃত্যুর আলোকে দেখেছেন জীবনকে। জেনেছেন, মৃত্যুর চেয়ে জীবন অনেক বড়, অনেক মহান। এই নাটকের দ্বন্দ্ব জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব। যে দ্বন্দ্ব শেষপর্যন্ত জয়ী হয় জীবন, আর মৃত্যু তার পায়ের কাছে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করে।

মহাভারতীয় কাহিনীর খুব বেশি পরিবর্তনের প্রয়োজন এখানে হয়নি। দু'একটি ইঙ্গিতকে বিস্তৃততর করেছেন মাত্র। মৃগয়ায় গিয়ে আহত হরিণের পেছনে ছুটতে ছুটতে তৃষ্ণার্ত রাজা পরীক্ষিৎ এসে পৌঁছেছেন ঋষি শমীকের তপস্যার স্থানে। বারংবার ডেকেও ঋষির ধ্যান ভাঙাতে ব্যর্থ, পিপাসায় কাতর রাজা অধৈর্য হয়ে একটি মরা সাপ ঝুলিয়ে দেন ঋষির গলায়। ঋষিপুত্র শৃঙ্গী অভিশাপ দেয়, সাতদিনের দিন তক্ষকের দংশনে মৃত্যু হবে রাজার। ঋষি ধ্যানভঙ্গের পর কুপিত হন নিজের সন্তানের প্রতি – কেন সে শাপ দিল ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত অতিথিকে? পিতাপুত্রের ভাবনাগত এই বিরোধের যে আভাস মহাভারতে ছিল, মনোজ মিত্র তাকে বিস্তৃততর করে দু'জনকে উপস্থিত করেছেন জীবন এবং মৃত্যুর প্রতীক হিসেবে। ঋষির কন্ঠে তুলে দিয়েছেন শাশ্বত বাণী : "পুণ্যার্জনই সব নয় শৃঙ্গী, পুণ্য রক্ষা করতে শেখো!"[২১] রাজা তৃষ্ণার্ত জেনে শৃঙ্গী অনুতপ্ত হয় কিন্তু ব্রহ্মশাপ সে ফিরিয়ে নেবে না কিছুতেই। তাঁর অনুরোধে শমীক মায়াসরোবর সৃজন করলেন রাজার পথে, সৃজন করলেন ঝর্ণা, তন্ত্রিপালের মাধ্যমে পাঠালেন সুমিষ্ট ফল কিন্তু ততক্ষণে রাজার মধ্যে শুরু হয়ে গেছে মৃত্যুভয়। সরোবরের সবুজ তৃণাঙ্কুরকে তাঁর মনে হ'ল তক্ষক, বহতা ঝর্ণাকে মনে হ'ল তাঁর দিকে ছুটে আসা বিষধর সাপ, তন্ত্রিপালের নিঃস্বার্থ সেবাকে সন্দেহ করলেন, মন্ত্রিও রেহাই পেলেন না তাঁর সন্দেহ থেকে। অবশেষে সারথি তন্ত্রিপাল শেখালো রাজাকে জীবন-উপভোগের তত্ত্ব। ব্রহ্মশাপ সত্য হলেও তো মৃত্যু আসবে সপ্তম দিনে। তার আগে ছ'ছটা দিন – ছ'ছটা সমুদ্রে প্রাণ ভরে বাঁচা কেন নষ্ট করবেন? কেন মরার আগে মরবেন? রাজা শিখলেন মৃত্যুর ওপর জয়ী হবার মন্ত্র। যখনই মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে ঘুরে দাঁড়ালো জীবন, তখন জ্বালা শুরু হ'ল মৃত্যুর। জীবনের কাছে এই পরাজয় সে মেনে নিতে পারে না। শৃঙ্গী তাই রাজাকে মুক্তি দিতে চায় ব্রহ্মশাপ থেকে, তক্ষকের দংশন নিতে চায় নিজের ব্রহ্মতালুতে। কিন্তু রাজা তো আর জিততে দেবেন না শৃঙ্গীকে – জিততে দেবেন না মৃত্যুকে। তিনি যে জেনেছেন : "মৃত্যুকে ভয় করে বাঁচা যায় না ... প্রতি মুহূর্তে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে, আঘাত করে তাকে পরাজিত করে তবেই না জীবনকে ভোগ করা যায় ..."[২২] শৃঙ্গীর অভিশাপে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেই এই বোধ জেগেছে রাজার। জীবন-উপভোগের এই সুযোগ তিনি হারাতে চান না। মৃত্যুকে তিনি আহ্বান করছেন প্রসন্ন চিত্তে : "মিনতি করি, সাতদিনের দিন সহস্র ফণার ভয়ংকর সাজে সজ্জিত হয়ে তুমি দেখা দাও।"[২৩] জীবন যখন মৃত্যুকে ভয় পায় না তখন মৃত্যু বড় অসহায়। সেই অসহায়তা দেখা গেছে শৃঙ্গীর মধ্যে। পরীক্ষিতের পায়ে আছড়ে পড়ে সে ক্ষমা ভিক্ষা করছে : "ক্ষমা করো ... ক্ষমা করো পরীক্ষিৎ ... আমি হেরে গেছি ... দয়া করো! দয়া! দয়া!"[২৪] পরীক্ষিৎ জয় করেছেন মৃত্যুকে, তাই তাঁর "পায়ের কাছে একটা তক্ষক ভয়ে এতটুকু হয়ে গেছে .. হতভাগ্য নিজের বিষে জ্বলছে আর ছটফট করছে।"[২৫]

প্রথম জীবনে দর্শনের ছাত্র এবং পরে অধ্যাপক মনোজ মিত্রের দার্শনিক সত্তাই এখানে প্রধান। নির্লিপ্ত নিরাসক্ত ভঙ্গিতে তিনি এখানে জীবন-মৃত্যুর স্বরূপকে বিশ্লেষণ করেছেন। দেখেছেন, মৃত্যু হ'ল জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি। বুঝেছেন : "সেই তো মূর্খ, যে সেই পরিণতিকে মানে না – আবার সেই তো কাপুরুষ যে তার ভয়ে ভীত হয়।"[২৬] মৃত্যু জীবনের সমাপ্তি নয়, বরং জীবনের পরিপূরক – এই ভাবনাই এখানে রূপায়িত। পরিপূর্ণ জীবন উপভোগের পর অনিবার্য মৃত্যুকে মেনে নেওয়াই পৌরুষ। যে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তার ভাবনায় জীবনের দিনগুলিকে অনাবশ্যক বিস্বাদ করার কোনো কারণ নেই। নাট্যকার মনোজ মিত্রের এই জীবনভাবনা প্রকাশ পেয়েছে সারথি তন্ত্রিপাল চরিত্রের মধ্য দিয়ে। মহাভারতে এই চরিত্রটি ছিল না। নাট্যকারের সৃজনী ভাবনায় এই চরিত্র স্বতন্ত্র মাত্রা পেয়েছে। 'সারথি' হয়েই সে

রাজাকে দেখিয়েছে জীবনের পথ। শমীক এবং শৃঙ্গী চরিত্র দুটি এই নাটকে জীবন এবং মৃত্যুর রূপকে উপস্থিত করেছে। শমীকের সৃষ্টির মাঝে বারবার ধ্বংসের মূর্তিতে হানা দিয়েছে শৃঙ্গী। তাঁদের কথোপকথনে গভীর দার্শনিক সত্যকে প্রকাশ করেছেন মনোজ মিত্র ঃ

''শৃঙ্গী ।। তুমি জীবন ... তুমি স্থিতি! আমি তক্ষক ... আমি মরণ। মহাপ্রলয়! এ অরণ্য যে বিরাট রহস্যময় বিশ্বের প্রতীক পিতা! পিতা, পিতা, পরীক্ষিৎ এসব দেখেছে?

ঋষি ।। (চমকে) কী সব?

শৃঙ্গী ।। জীবন-মৃত্যুর এই রূপ?

ঋষি ।। শৃঙ্গী!

শৃঙ্গী ।। তাদের এক রূপ? তারা যে আলাদা কিছু নয় ... তারা অভিন্ন এক দেহে লীন ...

ঋষি ।। শৃঙ্গী!

শৃঙ্গী ।। পিতাপুত্রে আমরা জীবন-মৃত্যু! সে কি দেখেছে, মৃত্যু জীবনেরই সন্তান। সে কি পেরেছে জীবনমৃত্যুর এই রহস্য উন্মোচন করতে?''[২৭]

'অশ্বত্থামা' নাটকের সাফল্যের চরমোৎকর্ষ লাভ করতে না পারলেও এই নাটকের সংলাপও বিষয়বস্তু এবং তত্ত্বভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। মহাভারতীয় গাম্ভীর্য মোটামুটি রক্ষিত হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে সংলাপ তো যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক। যেমন, তপস্যারত ঋষি শমীকের কাছে তৃষ্ণার্ত পরীক্ষিতের আর্তি ঃ '' অটল অচল ক্ষুধাতৃষ্ণাজয়ী মহাত্মা, বলো ... আমাকে বলো ... কেমন করে মানুষ প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে ওঠে ... কেমন করে বুকের তৃষ্ণাও তুচ্ছ করা যায়!''[২৮] অথবা তন্ত্রিপালের নিঃস্বার্থ সেবাকে ষড়যন্ত্র মনে করে পরীক্ষিতের সংলাপ ঃ ''রাজার শিরে সহস্র ফণা সে তো শুধু নাগনাগিণী তোলে না ... তোলে সহস্র লোভী প্রজা ... সন্দেহ, হিংসা, ঘৃণা, প্রতারণা, ভয় ... পাঁচটি পোষা কবুতর ... হস্তিনার প্রাসাদচূড়ায় বসে রাত্রিদিন বকম্ বকম্ করে।''[২৯]

এসব সংলাপ নাটকের পাঠ্যগুণ যথেষ্ট বাড়িয়ে তুলেছে। অভিনয়ের সময় মঞ্চেও এধরণের সংলাপ নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টিতে সার্থক হয়ে থাকে। সংলাপের মতই এ নাটকের মঞ্চনির্দেশগুলিও সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ, কখনো বা সংলাপের চেয়ে বেশিই। যেমন, নাটকের সূচনায় ঃ ''অন্ধকারে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে। ক্ষুরধ্বনি কখনো সতেজ উচ্চরোল, কখনো দূরাগত।''[৩০] শেষ দৃশ্যের সূচনায় মনোজ মিত্র লিখেছেন ঃ ''শৃঙ্গী ও ঋষি। তাদের থমথমে মুখচোখে বুকের মাঝে উথাল পাথাল ঝড়ের ইঙ্গিত। তাদের নিঃশব্দ দ্রুত পদচারণায় তীব্র উত্তেজনা। সমগ্র পরিবেশ দুর্বোধ্য রহস্যজালে ঘেরা।''[৩১] গাম্ভীর্যপূর্ণ সংলাপের পাশাপাশি এ ধরণের মঞ্চনির্দেশ নাটক পাঠের সময় এক রমণীয় স্বাদুতা সৃষ্টি করে।

'যা নেই ভারতে' (২০০৫) নাটকের কাহিনিবীজ সংগৃহীত হয়েছে মহাভারত থেকে, কিন্তু সেই কাহিনির ফাঁকফোকরে ছায়া ফেলেছে সমকালীন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা এবং চরিত্রসমূহ। মহাভারতের যে মহান ভাবটি প্রায় সিদ্ধরসে পরিণত, মনোজ মিত্র সেই ভাবটিকে ভেঙেচুরে যুক্তির সাহায্যে দেখিয়েছেন, সেখানেও পুরুষতান্ত্রিকতা, শাসকের যুদ্ধপ্রিয়তা, বর্ণভেদ-সমস্যা, সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব প্রভৃতি সবই ছিল আজকের পৃথিবীর মতোই। পুরাণকে নতুন দৃষ্টিতে বিচার করতে গিয়ে মহান ভীষ্ম প্রতিভাত হয়েছেন যুদ্ধবাজ, ক্ষমতাপ্রিয় রাজনীতিক হিসেবে, আর ধৃতরাষ্ট্র হয়ে উঠেছেন শান্তিকামী শাসক। কঞ্চুকী এবং পাতকিনীর মতো কাল্পনিক অথচ সম্ভাব্য চরিত্র সৃষ্টি করে তিনি তাদের সাহায্যে ভেঙে দিয়েছেন মহাভারতীয় গাম্ভীর্য। ভীষ্ম, ব্যাস প্রকৃতি চরিত্রের বিভিন্ন আচরণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী করে কঞ্চুকী ধরিয়ে দিয়েছে তাদের অন্যতর পরিচয়টি। আর পাতকিনীর মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছে রাজবাড়ির কলঙ্ককাহিনি।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর লাঞ্ছনা সেকালের মতোই সত্য একালেও। তাই অম্বিকার সংলাপে আমরা শুনি সর্বকালের মানবীর স্বর ঃ "ভীষ্ম পারে না, পারতে হবে অম্বিকাকে! যত দায় দায়িত্ব পালন করতে হবে নারীকে। তার বেলা পঙ্কে পতন নয়! স্বর্গের ঐশ্বর্যের প্রত্যাশী সে হতে পারে না! যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিতে হবে তাকে?"[৩২] এই নারীকেই রাজবংশ রক্ষার কারণে ভীষ্মের নির্দেশে শয্যাসঙ্গিনী হতে হয় ব্যাসদেবের। অথচ ব্যাসদেব নয়, তার কাঙ্ক্ষিত পুরুষ ছিল ভীষ্ম। নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা এখানে মূল্যহীন, কারণ পুরুষের দৃষ্টিতে সে কেবল বংশরক্ষার উপায়, পুত্র উৎপাদনের যন্ত্র। নারীত্বের এই অবমাননা যেমন মহাভারতে ছিল, তেমনি আছে আধুনিক ভারতেও। ভীষ্ম-নিয়ন্ত্রিত কুরুবংশের মধ্যে মনোজ মিত্র দেখেছেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে। এই শক্তি গান্ধার রাজ্য বিধ্বস্ত করে গান্ধারীকে লুণ্ঠন করে এনেছে আবার যুদ্ধবিদ্ধস্ত গান্ধারকে পুনর্গঠিত করার নামে সেই রাজ্যের ওপর নিজেদের অধিকার কায়েম করেছে। আধুনিক বিশ্বে শক্তিধর রাষ্ট্র এভাবেই সাহায্যের নামে নিজেদের 'উপনিবেশ' গড়ে বিভিন্ন দেশে। নারী তাই উদ্যত প্রতিশোধ গ্রহণে। পাণ্ডু নির্বীর্য, গান্ধারী নিজের জরায়ু বিনষ্ট করে নির্বংশ করবে কুরুবংশ, প্রতিশোধ নেবে নিজের পিতার ছোটো রাজ্যের ওপর অনুষ্ঠিত অত্যাচারের। পাণ্ডু সিংহাসন ত্যাগ করে স্ত্রী-দের নিয়ে বনবাসী হয়েছে, তাই ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনে বসেছে। সিংহাসনে বসেই সে নিষিদ্ধ করেছে অশ্বমেধ, বন্ধ করতে বলেছে যুদ্ধ। ভীষ্মের যুদ্ধপ্রিয়তার বিপরীতে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে শান্তির বাণী। নতুন ভাবনায় উদ্বোধিত ধৃতরাষ্ট্র স্পষ্ট বলেছে ঃ "অশ্বমেধ কোনো যজ্ঞই নয়। ওটা অবাধ লুণ্ঠনের একটি শাস্ত্রীয় পন্থা মাত্র"[৩৩] কিন্তু ভীষ্ম, যে ভীষ্ম সংসারও করে না, রাজত্বও করে না, যুদ্ধ ছাড়া তার করণীয় আর কী আছে? তাই নিজের যুদ্ধবাসনা চরিতার্থ করতে সে ব্যগ্র হয়। সিংহাসন সে নেবে না, কিন্তু সিংহাসনকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে। তাই পাণ্ডুর সন্তানদের বরণ করে নেওয়া হয় কুরুপুরে। মনোজ মিত্র ভারতকাহিনিরই সূত্রের যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যায় প্রশ্ন জানিয়েছেন পাণ্ডবদের অস্তিত্ব নিয়ে ঃ

> "দেবতার তত্ত্বটি চমৎকার। একটাই খটকা, দেবতারা যদি ক্রন্দনে সাড়াই দিলেন, তা হলে পাণ্ডুর ক্রন্দনে সাড়া দিয়ে তার অক্ষমতাই তো দূর করতে পারতেন। সেটাই হত দেবতার পক্ষে শোভনসুন্দর। তা না করে নিজেরাই সন্তানদান করতে গেলেন কেন? দেবতাদের কি একটু চতুর লাগছে না ভগবান?"[৩৪]

এই ঘটনাকে নাট্যকার ব্যাখ্যা করেছেন দুই বিপরীত ভাবনার দ্বন্দ্ব হিসেবে। একদিকে রয়েছে যুদ্ধবাজ রাজনীতিকরা, অন্যদিকে অবহেলিত, প্রান্তিক মানুষের ঐক্যবোধ। এই ব্যাখ্যা প্রকাশিত ধৃতরাষ্ট্রের সংলাপে ঃ

> ''আমরা একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্তের শিকার। যাঁরা আমাকে কোনোদিন সিংহাসনে দেখতে চান নি, আজও মেনে নিতে পারছেন না ... যাঁদের পেশিশক্তি আর অস্ত্রশক্তির গৌরব আমি কেড়ে নিচ্ছি ... ঐ অজ্ঞাতকুলশীল বালকগুলিকে দাঁড় করিয়েছেন তাঁরা!''[৩৫]

শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, চক্রান্ত প্রতিরোধের জন্য ধৃতরাষ্ট্রকেও বাহিনী গড়তে হয়। সেই বাহিনী গড়ে ওঠে রাজধানীর অদূরে বেড়ে ওঠা রাজবাড়িরই উচ্ছিষ্ট জংলি মানুষদের নিয়ে।

ভারতকাহিনির আধারে মনোজ মিত্র যে আসলে সমকালীন ভারত তথা বিশ্বপরিস্থিতির কথাই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন, তা স্পষ্ট হয়েছে নাটকের একাধিক ইঙ্গিতে। যুদ্ধ এবং শান্তির যে দুই বিপরীত দর্শনের দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন তা আধুনিক পৃথিবীরই দ্বন্দ্ব। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যেভাবে পররাজ্য লুণ্ঠন ও গ্রাস করে, ধ্বংসের পর পুনর্গঠনের নামে সেই দেশে স্থায়ী ঘাঁটি গাড়ে, তা প্রদর্শিত হয়েছে গান্ধার রাজ্য আক্রমণের মধ্যে। আধুনিক ভারতের সমাজে শ্রেণিবিভেদ এবং শ্রেণিদ্বন্দ্বের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ধৃতরাষ্ট্রের সংলাপে ঃ

> ''আমি বংশের সুবিধা ভোগ করি, তুমি বঞ্চিত। আর সমাজের সব বঞ্চিত অংশ যেমন ক্ষোভ যন্ত্রণা লুকিয়ে অধিক মাত্রায় মূলস্রোতে লগ্ন থাকতে চায়, সর্বক্ষণ প্রমাণ করতে চায় সে কতো বিশ্বস্ত, কতো ঐতিহ্যানুগত, কতো তৃপ্ত, কৃতার্থ — তুমিও তাই বিদুর।''[৩৬]

বঞ্চিত মানুষকেই চিরকাল প্রমাণ করতে হয় নিজের বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্য, সুবিধাভোগী শ্রেণির সেই দায় নেই। রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণে মনোজ মিত্রের ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর একাধিক নাটকে। আলোচ্য নাটকেও সেই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ধৃতরাষ্ট্রের সংলাপে ঃ

> ''আমি তো বুঝতে পারছি না, তপস্যা ছেড়ে দল বেঁধে সহসা তাঁরা নগরীতে হানা দিচ্ছেন কেন? রাজকার্যে মুনিঋষির হস্তক্ষেপ রাজ্যটাকে উচ্ছন্নে পাঠাবে। শীঘ্র ওঁদের গিরিগুহায় ঢুকে যেতে বলুন ...। অন্যথায় বিতাড়িত হবেন।''[৩৭]

মনোজ মিত্র বলতে চান, এই হস্তক্ষেপ সেকালেও কল্যাণ করে নি, একালেও ভালো করতে পারে না।

'অশ্বত্থামা' এবং 'তক্ষক'-এর মতো এই নাটকের সংলাপেও রক্ষিত হয়েছে ধ্রুপদী গাম্ভীর্য। সূচনার মঞ্চনির্দেশেই সেই গাম্ভীর্য প্রকাশিত — 'অন্ধকারে ছায়ামূর্তি সঞ্চরমান।' কিন্তু সর্বত্র এই গাম্ভীর্য ইচ্ছে করেই রক্ষা করেন নি নাট্যকার। কারণ, তিনি ভারতকাহিনির খোলসে আসলে ভরে দিতে চেয়েছেন সমকালীন ভারতকেই। বিশেষত কঞ্চুকী এবং পাতকিনীর সংলাপ প্রাত্যহিকতার কাছাকাছি। এদের মাধ্যমেই নাট্যকার মহাভারতের মহান ভাবটিকে চূর্ণ করেছেন। একদিকে মহাভারতের চরিত্রগুলির সংলাপের গাম্ভীর্য, অন্যদিকে কঞ্চুকী-পাতকিনীর সাধারণ সংলাপ নাটকে বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে। এই দু'রকমের সংলাপের দ্বারা সৃষ্ট নাট্যরসের দৃষ্টান্ত হিসেবে নিম্নোদ্ধৃত অংশটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

"ভীষ্ম ।। কী হল, প্রভাত না হতে কীসের কোলাহল ? গান্ধাররাজ সুবল নিজের প্রয়োজনেই এখানে অবস্থান করছেন ! যুদ্ধবিধ্বস্ত গান্ধাররাজ্য গড়ে তুলতে তিনি আমাদের সাহায্যপ্রার্থী । এতে তোমাদের বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ দেখি না । যাক্ । তোমরা সবাই আছো ... অম্বিকাও আছো ... ভালই হল । কদিন ধরে একটা কথা ভাবছি । পুত্রেরা বড় হয়েছে, রাজ্যের ভালমন্দ বুঝতে শিখেছে । এবার বোধহয় শাসনভার ওদের হাতে তুলে দিয়ে আমার মতো প্রবীণের সরে দাঁড়ানোই ভাল ।

কঞ্চুকী ।। নিশ্চয় ভাল । বোধহয় কেন, অবশ্যই ভাল । যে ব্যক্তি পণ করেছে কোনোকালে কোনো অবস্থাতেই রাজমুকুট মাথায় তুলবে না ... তার পক্ষে বছরের পর বছর অন্যের হয়ে রাজত্ব করার যে কী বিড়ম্বনা ... (ভীষ্মের পাশে এসে চোখ মটকে) সত্যি ছাড়বে ? নাকি আরও কিছুদিন যেমন চলছে চালাবে ?

ভীষ্ম ।। না । আর না । বড় দীর্ঘকাল চালানো গেল । আমার তো ক্লান্তিও আসতে পারে কঞ্চুকীমশাই ...

কঞ্চুকী ।। আসতে পারে কি, আসা উচিত । না এলে বুঝতে হবে – তোমার কোনো অভিসন্ধি আছে । সত্যি বলতে কি, রাজা না হয়েও তুমি যতকাল রাজত্ব করলে, এতটা কিন্তু রাজা হয়েও লোকে করে উঠতে পারত না ! (চোখ মটকে) সব ছেড়ে দেবে, নাকি কিছু কিছু হাতে রাখবে ?"[৩৮]

ভীষ্মের সংলাপ ত্যাগের যে মহিমা প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে, কঞ্চুকীর সংলাপ টেনে বের করছে তার ভেতরকার কৌশলটিকে, মহত্ত্বের আবরণে ঢাকা অগৌরবটি ।

এই তিনটি নাটকের পটভূমি পুরাণকথা, কিন্তু মনোজ মিত্র সেই পুরাণের আধারে প্রকাশ করেছেন সমকালীন সমাজসত্য এবং দর্শনভাবনা । যে কারণে তিনি নাটকে ইতিহাসের পটভূমি বা রূপকের আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন, পুরাণ-নির্ভরতাও সেই একই কারণে । এ যেন সমকালকে একটু দূরত্বে স্থাপন করে দেখা এবং সমকালকে চিরকালের সঙ্গে লগ্ন করে দেওয়া ।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) বাংলা পৌরাণিক নাটকের ভবিষ্যৎ - রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক - পুস্তক বিপণি - ২৭ বেনিয়াটোলা লেন - কলকাতা-০৯ - দ্বিতীয় সংস্করণ - বৈশাখ ১৪০০, পৃ.২৬৫-৬৬

২) ঐ, পৃ.২৬৫

৩) বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (২য় খন্ড) - আশুতোষ ভট্টাচার্য - ১৯৬১ - রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক' গ্রন্থে উৎকলিত

৪) বাংলা পৌরাণিক নাটকের ভবিষ্যৎ - রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক, পৃ.২৭২

৫) সৌপ্তিক পর্ব - মহাভারত - কাশীরাম দাস - অক্ষয় লাইব্রেরী - শ্রাবণ ১৩৯৩

৬) অশ্বত্থামা - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ, অগ্রাহায়ণ ১৪০১, ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ.৬২

৭) ঐ, পৃ.৭৮

৮) ঐ, পৃ.৭৮

৯) ঐ, পৃ.৭৯

১০) ঐ, পৃ.৬১

১১) ঐ, পৃ.৬১

১২) ঐ, পৃ.৭৯

১৩) ঐ, পৃ.৬৮-৬৯

১৪) ঐ, পৃ.৭০

১৫) ঐ, পৃ.৭৪

১৬) ঐ, পৃ.৫৫

১৭) ঐ, পৃ.৫৫

১৮) ঐ, পৃ.৬৩

১৯) ঐ, পৃ.৭০

২০) ঐ, পৃ.৭২

২১) তক্ষক - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ, ১৪০২, পৃ.৪২৫

২২) ঐ, পৃ.৪৩৮

২৩) ঐ, পৃ.৪৩৮

২৪) ঐ, পৃ.৪৩৮

২৫) ঐ, পৃ.৪৩৮

২৬) ঐ, পৃ.৪৩৫

২৭) ঐ, পৃ.৪৩৬-৩৭

২৮) ঐ, পৃ.৪২৩

২৯) ঐ, পৃ.৪৩৪

৩০) ঐ, পৃ.৪১৯

৩১) ঐ, পৃ.৪৩৫

৩২) যা নেই ভারতে - মনোজ মিত্র -মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১৩, পৃ.৯

৩৩) ঐ, পৃ.৩২

৩৪) ঐ, পৃ.৩৯

৩৫) ঐ, পৃ.৩৯

৩৬) ঐ, পৃ.৪০

৩৭) ঐ, পৃ.৩৯

৩৮) ঐ, পৃ.১৯

ইতিহাসের পটে লেখা নাটক

ঐতিহাসিক নাটক নাটকের বিষয়গত অন্যতম বিভাগ। সাধারণভাবে বলা চলে, যে নাটকের বিষয়বস্তু ইতিহাস থেকে গৃহীত, তাই ঐতিহাসিক নাটক। সমালোচকের ভাষায় ঃ "ইতিহাসের কোনো ঘটনা বা কাহিনি, যথা, সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রনায়কের উল্লেখযোগ্য কোনো বৃত্তান্ত ইত্যাদি নিয়ে লেখা নাটকই ঐতিহাসিক নাটক।"[১] কেবল বিষয়বস্তু ইতিহাস থেকে গৃহীত হলেই হবে না, দেখতে হবে সেই বিষয়বস্তুতে নাটকের উপযোগী দ্বন্দ্ব আছে কিনা। ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকারকে ইতিহাসের তথ্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হয়; বর্ণিত কালের উপযোগী ভাষা, আচরণ এবং পোষাক যথাযথ রক্ষা করতে হয়, ইতিহাসসখ্যাত চরিত্রকে কোনোভাবেই বিকৃত করার অধিকার তাঁর নেই। ইতিহাস যেখানে নীরব বা অস্পষ্ট, কেবল সেখানেই তিনি কল্পনার আশ্রয় নিতে পারেন। কিন্তু সেই কল্পনাকেও হতে হয় সম্ভাব্যতার সূত্র-অনুসারী। ঐতিহাসিক চরিত্রের মানবিক পরিচয়ের প্রকাশও ঐতিহাসিক নাটকে প্রত্যাশিত। অনৈতিহাসিক চরিত্রকে নাট্যকার ইতিহাসের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে স্থাপন করতে পারেন। ইতিহাস থেকে নাটকের উপাদান গ্রহণ করা হলে তার প্রকৃতি কেমন হবে, অর্থাৎ ইতিহাস ও নাটকের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হবে সে বিষয়ে অ্যারিস্টটলের মন্তব্য আজও প্রাসঙ্গিক ঃ

> "যা সত্যি সত্যি ঘটেছে তা বর্ণনা করাই কবির কাজ নয়, বরং যা ঘটা সম্ভব বা অনিবার্য তার বর্ণনা করাই কবির কাজ। করি আর ঐতিহাসিকের পার্থক্য এই নয় যে একজন পদ্যে লেখেন আর একজন লেখেন গদ্যে ... আসল পার্থক্য হল যে একজন বলেন যা ঘটে গেছে তার কথা, আর একজন বলেন তার কথা যা ঘটা সম্ভব। এই জন্যই কাব্য ইতিহাসের চেয়ে বেশি দার্শনিক এবং বেশি গভীর কারণ ইতিহাস বলে নির্দিষ্ট তথ্যের কথা, আর কাব্য বলে সার্বজনীন সত্য।"[২]

বাংলা নাটক বিশেষ বিশেষ কালপর্বে বিশেষ উদ্দেশ্যে ইতিহাসকে আশ্রয় করেছে। সে উদ্দেশ্য কখনো নবজাগরণের কালে অতীত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার, কখনো পরাধীন জাতির হৃদয়যন্ত্রণা প্রকাশ করে স্বাধীনতার জন্য উদ্দীপনা সঞ্চার। প্রাথমিকভাবে বাংলা ঐতিহাসিক নাটকগুলি লেখা হয়েছে ইতিহাসের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলিকে অবলম্বন করে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' থেকে শুরু করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস', 'নূরজাহান', 'মেবার পতন', 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদৌল্লা', 'মীরকাশিম', 'ছত্রপতি' প্রভৃতি সব নাটকেরই কাহিনি গড়ে উঠেছে কোনো না কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্রে রেখে। কিন্তু আধুনিককালে দেখা গেছে ইতিহাসের বিচিত্র ব্যবহার। কখনো প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে আঘাতে জর্জরিত করতে, কখনো অতীতের পটভূমিকায় স্থাপন করে আঘাতকে প্রত্যক্ষতার আঁচ থেকে দূরে স্থাপন করতে, আবার কখনো বা সম-সময়ে হাঁপিয়ে উঠে নিভৃত মানসমুক্তির প্রয়োজনে আধুনিক বাংলা নাটক অতীতচারী হয়েছে।

'শোভাযাত্রা' (১৯৯০) এবং 'দর্পণে শরৎশশী' (১৯৯১) কিংবা আরো একটু আগে 'কিনু কাহারের থেটার' (১৯৮৮) থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, মনোজ মিত্রের এবারের প্রবণতা পেছন ফেরার দিকে, শিকড় সন্ধানের দিকে। ১৯৮৮ সালের 'কিনু কাহারের থেটার' থেকে শুরু করে ১৯৯৭-৯৮ সালে রচিত 'ছায়ার প্রাসাদ' পর্যন্ত যেন শিকড় সন্ধানের দশ বছর। এর মাঝখানে অন্য ধারার নাটক

একেবারেই নেই এমন নয়, তবে এই পর্বে তাঁর প্রধান সৃষ্টিগুলিই ইতিহাস-আশ্রিত। সে ইতিহাস কখনো বাস্তব, আবার কখনো বা কাল্পনিক। কিন্তু কাল্পনিক হলেও সম্পূর্ণতই ইতিহাসের সম্ভাবনা-প্রসূত। এই পর্বে তাঁর প্রধান তিনটি সৃষ্টি 'গল্প হেকিমসাহেব' (১৯৯২-৯৩), 'দেবী সর্পমস্তা' (১৯৯৫) এবং 'ছায়ার প্রাসাদ' (১৯৯৭-৯৮)।

মনোজ মিত্রের নাটকে ইতিহাস-চর্চা ঐতিহাসিক নাটক রচনার সাধারণ কারণগুলির দ্বারাই পুষ্ট। নাটক রচনার প্রেক্ষাপট হিসেবে তিনি যাই ব্যবহার করুন না কেন, তাঁর লক্ষ্য সমকালীন সমাজ। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই মূলত তাঁর নাট্যরচনা। ফলে ইতিহাসের আশ্রয় তিনি নিয়েছেন সমকালকে প্রতিফলিত করতেই। তিনি নিজেই এই কারণের কথা জানিয়েছেন একটি সাক্ষাৎকারে ঃ

> "বর্তমানের প্রয়োজনেই অতীতচর্চা করেছি। নইলে আর পুরাতনে কী প্রয়োজন? কিছু একটা অনুসন্ধানের জন্যই মাটি খোঁড়াখুঁড়ি। ... শেকড় জ্যান্ত থাকলে, তাতে জলসিঞ্চন করা। তাকে জাগানো, বাড়ানো, ফুল ফলের স্বপ্ন দেখা।"[৩]

এই স্বপ্ন দেখা, এই অনুসন্ধান বর্তমানের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে মানসিক বিশ্রাম পেতেই। আরও বাস্তব কারণের কথা বলেছেন তিনি একই সাক্ষাৎকারে ঃ

> "মানুষ কিন্তু পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটার জন্যই ঘাঁটে না, তার প্রয়োজনে বর্তমানে লাগে বলেই সে অতীতকে টানে। অনেকসময় বর্তমানকে বর্তমানের প্রেক্ষিতে ধরতে গেলে নানারকম চাপের মুখোমুখি হতে হয়। বাহ্যিক এবং মানসিক। এরকম একটা প্রয়োজন থেকেও নাট্যকার ফিরে যেতে পারেন অতীতে।"[৪]

এই বক্তব্যর সূত্রেই ইতিহাস লগ্ন হয়ে যায় বর্তমানের। সমকালের সামাজিক-রাজনৈতিক উত্তাপের আঁচকে কিছুটা সহনীয় করে তোলার জন্যই নাট্যকার ইতিহাসের ব্যবধান রচনা করেছেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) ফলে জমিদার, তালুকদার, তহশীলদার, পত্তনিদার প্রভৃতি অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগীর নিরন্তর শোষণে দেশে যখন বিষম আকাল, সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে এক নিঃস্বার্থ পরোপকারী হেকিমের গল্প 'গল্প হেকিমসাহেব' (১৯৯২-৯৩)। এরপর মনোজ মিত্র আবার ইতিহাস আশ্রয় করেন ১৯৯৫ সালে। লর্ড ডালহৌসীর স্বত্ববিলোপ নীতির ফলে দেশীয় রাজার প্রাণান্তকর অবস্থা এবং রাজ্য ও বংশ রক্ষার্থে আদিম জনজাতির আশ্রয়গ্রহণ অবলম্বনে রচিত নাটক 'দেবী সর্পমস্তা'। এই দুই নাটকে তাঁর বিচরণ নিকট-অতীতে। কালগত ব্যবধান দেড়শ থেকে দুশো বছরের মধ্যে। কিন্তু এর পরের নাটকে তিনি বেছে নিলেন খ্রী. পূ. তৃতীয় শতকের এক অস্থির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মৃত্যু এবং অশোকের সিংহাসনে আরোহণের মধ্যবর্তী সংক্ষিপ্ত সময়কাল বিন্দুসারের রাজত্ব, যা ইতিহাসে খুব একটা উজ্জ্বল নয়। সেই অস্থির সময়ের নাট্যচিত্র 'ছায়ার প্রাসাদ' (১৯৯৭-৯৮)।

ইতিহাস-আশ্রিত নাটক বা উপন্যাস দু'ভাবে রচিত হতে পারে। প্রথমত, ইতিহাসের প্রধান পাত্র-পাত্রীকে মুখ্য ভূমিকায় স্থাপন করে আর দ্বিতীয়ত, অনৈতিহাসিক চরিত্রকে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করে ঐতিহাসিক চরিত্রকে অপ্রধান অংশে স্থাপন করে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ইতিহাসের বিশেষ সময়কালে

সাধারণ মানুষের জীবনের স্পন্দনটি ধরা সম্ভব। ইতিহাসখ্যাত চরিত্রের পরিবর্তনসাধন অপেক্ষাকৃত কঠিন বলে নাট্যকারের কাঙ্ক্ষিত সত্যের প্রতিষ্ঠা অনৈতিহাসিক চরিত্রের সাহায্যেই বেশি সম্ভব। মনোজ মিত্র তাই এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই গ্রহণ করেছেন এবং ইতিহাসকে যুক্ত করে দিয়েছেন বর্তমানের প্রাসঙ্গিকতায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় মধ্যস্বত্বভোগী তালুকদারের আশ্রয়ে থাকা হেকিমের গল্পে তাই অনায়াসে খুঁজে পাওয়া যায় মানবকল্যাণের জন্য অসম সংগ্রামে লিপ্ত এক যোদ্ধাকে । সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এই হেকিমের মধ্যে দেখেছেন 'অগ্রগতির রুদ্ধ দরজার সামনে নিষ্ফল করাঘাতরত ভারতীয় বিজ্ঞানীর প্রতিনিধি'কে। ওয়ালী খাঁ বা পশুপতি পোদ্দার যে শোষকের সেই চিরন্তন সত্তা, যারা প্রজাকল্যাণ ততদূর পর্যন্ত বরদাস্ত করেন যতক্ষণ তা নিজেদের প্রতিস্পর্ধী না হয়ে ওঠে – সেকথাও ইতিহাসের আড়াল ঘুচিয়ে সহজেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সব যুগেই সামাজিক মানুষেরা যে একইভাবে নিগৃহীত হন ওয়ালী আর পশুপতিদের হাতে – 'গল্প হেকিমসাহেব' সেকথাই স্মরণ করায়। শিক্ষায় রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসকের হাতে সত্যসন্ধানীর জুতো পেটা খাওয়া, ব্যর্থতা-হতাশা নিয়ে প্রতিভার দেশত্যাগ, বিশ্বজুড়ে কায়েমি স্বার্থের একই রূপ, প্রতিবেশী দেশে অন্তর্ঘাত প্রভৃতি একালের সমস্ত বিষয়কেই মনোজ মিত্র তুলে ধরেছেন দু'শো বছর আগেকার পটভূমিকায় : "মনোজ মিত্র সময়টাকে দেড়শ বছর পিছিয়ে রাখলেও বক্তব্যের স্পষ্টতায় ঋজুতায় অত্যন্ত আধুনিকমনস্ক"[৫] চিরন্তন এই শোষণ ও অত্যাচারের কাহিনীকে তিনি ধরেছেন বাংলার প্রাচীন লোককথার আদলে । 'গল্প হেকিমসাহেব' নাটকের চিরন্তনতা মনে করায় রবীন্দ্রনাথের সেই উক্তি : "আধুনিক সমস্যা বলে কোনো পদার্থ নেই, সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের।"[৬] যে অত্যাচার সহ্য করেছিলেন সত্যসন্ধানী গালিলিও গালিলেই, হেকিমের ওপর অনুষ্ঠিত অত্যাচার তারই সমগোত্রীয়।

'দেবী সর্পমস্তা' নাটকের আশ্রয় কাল্পনিক ইতিহাস। 'অধীনতামূলক মিত্রতা' নীতিতে ব্রিটিশরাজের সঙ্গে আবদ্ধ সিংহগড়ের রাজা লোকেন্দ্রপ্রতাপ পড়েছেন 'স্বত্ববিলোপ নীতি'র খপ্পরে। রেসিডেন্ট সাহেবের স্ত্রী চান কুলদেবী সর্পমস্তার ১০৮টি মরকতখণ্ডে গাঁথা মালা। একদিকে বংশের ঐতিহ্য, অন্যদিকে রেসিডেন্টের আব্দার না মানলে রাজ্যের সংকট। বিশ্বাসঘাতকতার ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারেই সেনাপতি ধনঞ্জয় ইংরেজের পক্ষে, তার লক্ষ্য সিংহাসন। পুরোহিত প্রভাকর শর্মা কিছুতেই সিংহগড়ের ঐতিহ্য তুলে দেবেন না ইংরেজের হাতে। একদিন গভীর রাতে দেবীর কণ্ঠহার আর নিজের কন্যা গৌরীকে নিয়ে তিনি গোপনে গৃহত্যাগ করেন। সঙ্গ নেয় বিদূষক রঙ্গলাল। গিয়ে উপস্থিত হন বহু দূরবর্তী এক আদিবাসী গ্রামে, যে গ্রাম থেকে লোকেন্দ্রপ্রতাপের পূর্বপুরুষ হরণ করে এনেছিল দেবী সর্পমস্তাকে। প্রাণ বাঁচাতে প্রভাকর শর্মা গৌরীকে দেবী সর্পমস্তার মানবীরূপ বলে প্রচার করেন। সরল আদিবাসীরা সেকথা বিশ্বাস করে গৌরীকে দেবীত্বে প্রতিষ্ঠা করে। এরপর দেবীর মানবায়নের গল্প, যা ইতিহাসের সঙ্গে ততটা সম্পৃক্ত নয়। এদিকে মালার ভাগ না পেয়ে হতাশ রঙ্গলাল ফিরে গিয়ে সংবাদ দিলে লোকেন্দ্রপ্রতাপ সসৈন্য আসেন মরকতমালা উদ্ধারে। সাঁওতাল আদিবাসীরা নিয়ে যেতে দেবে না মালা। নিয়ে যেতে দেবে না তাদের দেবীকে। নানা ঘটনা পরম্পরায় অবশেষে লোকেন্দ্রপ্রতাপ ইচ্ছেকে বিয়ে করে ফিরে পান লুপ্ত যৌবনশক্তি। সাহেবদের মুঠো থেকে সিংহগড় উদ্ধারে প্রাণ দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় আদিবাসীরা। এই ইতিহাস কাল্পনিক কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যটি চিরন্তন।

'ছায়ার প্রাসাদ' (১৯৯৭-৯৮)-এর কালপর্বকে অনেকটাই পিছিয়ে নিয়ে গেছেন মনোজ মিত্র। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পর এবং অশোকের আগে বিন্দুসারের যে স্বল্পকালীন রাজত্বকাল অবক্ষয়ে চিহ্নিত সেই সময়কে তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন সমকালের রাষ্ট্রব্যবস্থার অবক্ষয়ের সঙ্গে। সমালোচক এই নাটকে প্রত্যক্ষ করেছেন বিশ শতকের একেবারে শেষ পর্বের ভারতবর্ষকে ঃ

> ''নাটকে উপস্থাপিত নানা বিষয়ে আমাদের সমকালকে আমরা চিনে নিতে পারি – স্বৈরাচার, অপশাসন, গুপ্তচর ও ঘাতকসমেত পুলিশরাজ, রাজনীতির ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ, দুর্নীতি, কুসংস্কার, জাতপাতের সমস্যা, দলিত জাগরণ, স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশে সরকারি বাধা, নারীর অবমাননা, ডাইনি বানিয়ে নির্যাতন ইত্যাদি।''[৭]

এইসব ঘটনার মধ্য দিয়ে ইতিহাস আর সমকাল এক বিন্দুতে এসে মিশেছে। সুদূর চন্দনা গ্রাম থেকে শুরু করে রাজধানী পাটলিপুত্র পর্যন্ত সর্বত্রই কুসংস্কারের কালো ছায়া। অশিক্ষিত গ্রামবৃদ্ধ থেকে রাজা বিন্দুসার – সকলেই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। কুসংস্কারকে তারা ব্যবহার করেন সমস্যা থেকে প্রজার দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে। শ্মশান-ঠাকুর দ্বৈপায়নের পালিতা কন্যা সুভদ্রাঙ্গীকে তাই পিশাচিনী সাজিয়ে গ্রামছাড়া করা হয়। দ্বৈপায়ন নিজের কন্যা আর গোবৎস গচ্ছিত রাখে রাজার কাছে কিন্তু রাজা ব্যর্থ হন সাধারণ প্রজার সম্পদ রক্ষায়। সমাজের কুসংস্কারের ছায়া থেকে পাটলিপুত্রের প্রাসাদে এসেও কুসংস্কার, নির্যাতন থেকে সুভদ্রাঙ্গী রেহাই পায় নি। পুত্রকাম্য সুভদ্রাঙ্গীকে গ্রহণ করেছেন বিন্দুসার। নাটকের শেষে প্রিয়দর্শী অশোক যে সুভদ্রাঙ্গীর সন্তান এবং সে-ই যে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করবে – এই ইঙ্গিত আছে।

ইতিহাস-আশ্রিত এই তিনটি নাটকেই মনোজ মিত্র ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে চেয়েছেন একটিই কথা। তিনি নিজেও স্বীকার করেন যে, একটি থিম অবলম্বনে একাধিক নাটক লেখা তাঁর অভ্যাস। আলোচ্য তিনটি নাটকে তিনি দেখিয়েছেন, সভ্যতার যা কিছু সম্পদ, তা রক্ষিত হয় সাধারণ মানুষদের দ্বারাই – তথাকথিত অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, মন্ত্রহীনদের দ্বারাই। রাষ্ট্র বা শাসকশক্তি উচ্ছৃঙ্খলতায়, বৈনাশিক দর্পে যা ছড়িয়ে ফেলে, গুঁড়িয়ে ফেলে, পরম মমতায় তাকেই গুছিয়ে রাখে মন্ত্রহীনেরা। ইতিহাসের চাকাকে সচল রাখে তাঁরাই। 'গল্প হেকিম সাহেব' নাটকে হেকিমের মহামূল্যবান আবিষ্কার কতটা নিজেদের স্বার্থরক্ষায় কাজে লাগবে – তাই নিয়েই ব্যস্ত হয়েছে পশুপতি পোদ্দার এবং ওয়ালী খাঁ। যতক্ষণ হেকিম এবং তাঁর আবিষ্কার তাঁদের স্বার্থরক্ষা করেছে, ততক্ষণই হেকিম তাঁদের কারো কাছে 'বেটা', কারো কাছে 'ভাই'। শাসকস্বার্থের সঙ্গে প্রজাকল্যাণের সংঘাতে অভিযুক্তের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে হেকিমকে। কোথাও জুতোপেটা, কোথাও পদাঘাত সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। যে 'সুবিদ্যা' আবিষ্কার করতে চেয়েছিল হেকিম, বৃহত্তর মানবকল্যাণের স্বার্থে কোনো তালুকদারই তার নিঃস্বার্থ আনুকূল্য করে নি বা সেই আবিষ্কার রক্ষা করতে চেষ্টা করে নি। বুদ্ধিজীবীরা কীভাবে ব্যবহৃত হয় শাসকদের লড়াইয়ে, আপন চেতনায় বিশ্বাস স্থাপন করে এগিয়ে যেতে চাইলে কীভাবে লাঞ্ছিত হতে হয় মানুষকে, এই নাটক সেই চিরন্তন ইতিহাসকেই স্মরণ করায়। যখন প্রত্যক্ষ আঘাত এসেছে ওয়ালী খাঁর শরীরে, জবাব দিয়ে গেছে পীরজাদা ডাক্তার, তখন তার মনে পড়েছে হেকিমের কথা, হেকিমের আবিষ্কারের কথা। কিন্তু তখন হেকিম হারিয়ে ফেলেছে পুঁথি, ভুলে গেছে ওষুধ তৈরির পদ্ধতি। এরপরই মনোজ মিত্র দেখান, ইতিহাসের চিরন্তন সত্য – হেকিমের পাশে এসে দাঁড়ায়

গঙ্গামণি আর ছায়েম। হেকিমের পোড়োভিটেতে ছায়েমের শুয়ে থাকা যেন সেই সুবিদ্যাকেই পাহারা দেওয়া। তারই হাতে পড়েছে হেকিমের তালপাতার পুঁথি। মনোজ মিত্রের নাটকের বৈশিষ্ট্য মেনেই তালুকদার ওয়ালী খাঁর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছায়েমের প্রতিবাদ উচ্চকিত নয় — চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ওয়ালী খাঁর মুখোমুখি কথা বলার সাহস ছায়েমের নেই, কিন্তু সে নীরবে সরিয়ে নিয়ে গেছে পুঁথি — ওয়ালী খাঁর পক্ষে যে পুঁথি হতে পারত সঞ্জীবনী সুধা। একেবারে শেষে সেই পুঁথি নিয়ে সে এসে দাঁড়িয়েছে হেকিমের কাছে। সুবিদ্যার আকর যোগ্য লোকের হাতে তুলে দিয়ে নিজেও হতে চেয়েছে পুণ্যের শরিক। গঙ্গামণিও এসে দাড়িয়েছে বিধ্বস্ত হেকিমের পাশে , তাঁকে উজ্জীবিত করেছে ঃ

> "ওঠেন হেকিম সাহেব। চলেন দাওয়াই বানাবেন না, দাওয়াই। চলেন আমি গাছতলায় চুলা খুঁড়ে দিচ্ছি। আপনি শুধু বসে বসে দাওয়াইটি বানিয়ে দিবেন, আমি মাথায় নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরি করে বেড়াব।"[৮]

ওয়ালী খাঁ হাকিমের গোলাপ বন্ধ করে বাঈজীকে খুশি করেন, আর গঙ্গামণিরা সুবিদ্যাকে রক্ষা করতে পরম নিষ্ঠায় ফোটায় রক্ত গোলাপ। দৃঢ় প্রত্যয়ে উচ্চারণ করে ঃ "আমি দিব না হতে বৃথা। চলেন পাত্রে জোছনা ধরব আমরা, ধরে রাখব! আকাশ দিগন্তে বিদ্যুতের ঝলকানি উঠলে, সেই ঝলকানিটিও ধরে রাখব।"[৯] এই বিদ্যুৎ ঝলকানির অন্যতর ইঙ্গিতেই শেষ হয়েছে নাটক। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক যে বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়েছিল, মানুষের ধর্মীয় পরিচয়ই যখন বড় হয়ে উঠেছিল, তখন মনোজ মিত্র ইতিহাসের দূরত্বে সৃষ্টি করেলেন হেকিমের মতো চরিত্র, যে বিপন্ন মানুষের কোনো পরিচয় বিচার না করে হেঁকে ফিরেছে 'দাওয়াই চাই গো ... দাওয়াই'। এই দাওয়াই ধ্বস্ত মানবতাকে সুস্থ করার দাওয়াই। কালগত ব্যবধান সৃষ্টি করে একটু দূর থেকে মনোজ মিত্র এই নাটকে দেখেছেন সমকালের সমাজসত্যকে। সেই বিষয়টিই স্বীকৃতি পেয়েছে সমালোচকের দৃষ্টিতে ঃ

> "মনোজ মিত্রের নাটক 'গল্প হেকিমসাহেব' কিন্তু কোনও গল্পকথা বা হেকিম সাহেবের জীবনগাঁথাকে মঞ্চস্থ করেনি, তুলে ধরেছে এক অতি চেনা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর বাস্তবতা। রূপক কাহিনীর আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক নিষ্ঠুর সত্য যা সমকালীন সমাজব্যবস্থার এক নিষ্ঠুর সত্যকে তুলে ধরে।"[১০]

'দেবী সর্পমস্তা' নাটকেও কাল্পনিক ইতিহাসের আশ্রয়ে ইতিহাসের চিরন্তন সত্য প্রকাশিত। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুগে যুগে অন্ত্যজরাই আশ্রয় দিয়েছে, সেবা করেছে নাগরিক মানুষদের। রাজ্যহারা রামচন্দ্র পেয়েছিলেন নিষাদদের আশ্রয়, জতুগৃহে পান্ডবদের হয়ে পুড়ে মরেছিল নিষাদ মাতা ও তার পাঁচ পুত্র, রাজ হরিশ্চন্দ্রকে আশ্রয় দিয়েছিল চন্ডালেরাই। এই সেবা, আত্মোৎসর্গের প্রতিদানে নাগরিক মানুষের কাছে তারা পেয়েছে শুধু প্রবঞ্চনা। অন্ত্যেবাসী মানুষকে কোনোদিন মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত করেনি কোনো শাসক। চিরন্তন সেই সত্য উচ্চারিত হয়েছে দেওয়ানের সংলাপে ঃ

> "মহারাজ এই বনচারী মানুষদের কোনওদিনই কি আপনি প্রজা বলে পালন করেছেন? রাজ্যের কোনও সুফল কি ভোগ করে এরা? ... এদের ওপর অভিমান বা ক্রোধ প্রকাশের অধিকার আছে কি আপনার, কিংবা বলপ্রয়োগের?"[১১]

নগর চিরকাল হরণ করেছে অন্ত্যজ মানুষের সম্পদ, সুযোগ নিয়েছে তাদের সরলতার। যাদবেন্দ্র সিংহ কর্তৃক দেবী সর্পমস্তার মূর্তি হরণ কিংবা প্রভাকর শর্মা কর্তৃক গৌরীকে দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা তারই

দৃষ্টান্ত। যুগে যুগে সঙ্কটাপন্ন নগর সভ্যতা সাহায্যের জন্য যখনই হাত বাড়িয়েছে অনার্য অসভ্য জাতির প্রতি তখনই তারা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ঃ

> ''রাজারা যখনই রাজ্য হারিয়েছেন, ছুটে এসেছেন এইখানে ... বনে জঙ্গলে অন্ত্যজ সমাজের দ্বারে। আমাদের ইতিহাস পুরাণ পরম্পরা তাই বলছে, সঙ্কটপন্ন নগর সভ্যতাকে রক্ষা করে আসছে বনপাহাড়। এটাই এদেশের শক্তি ... শক্তির ভান্ডার।''[১২]

দেবী সর্পমস্তা অন্ত্যজদেরই দেবী, লোকেন্দ্রপ্রতাপের পূর্বপুরুষ তাঁকে হরণ করে এনেছিলেন নগরে। আবার সেই দেবীর মরকতমালার ওপর যখন রেসিডেন্ট সাহেবের স্ত্রীর লুব্ধদৃষ্টি পড়ল, তখন সেই মরকতমালা নিয়ে প্রভাকর শর্মা আশ্রয় পেলেন সেই অন্ত্যজদেরই কাছে। লোভী ইংরেজ যখন লোকেন্দ্রপ্রতাপের রাজ্য গ্রাস করতে উদ্যত, তখন সিংহগড়ের স্বাধীনতা রক্ষায় তারা প্রাণ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অবিনাশী এক পাপবোধ রাজাকে পরিণত করেছিল অক্ষম, ক্লীব মানুষে। তাকে যৌবনশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছে অন্ত্যজকন্যা ইচ্ছা। স্বত্ববিলোপ নীতির ফাঁড়া কেটেছে। যুগে যুগে নাগরিক মানুষ বারবার ঠকিয়েছে তাদের, কার্যসাধনের পর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, কিন্তু তবু তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় নি, চরম বিপদের দিনে বাড়িয়ে দিয়েছে সাহায্যের প্রসারিত হাত – রক্ষা করেছে সভ্যতাকে, সচল করেছে ইতিহাসকে।

'ছায়ার প্রাসাদ' সাধারণ মানুষকে কেন্দ্রে রেখে ইতিহাসের পটচিত্র অঙ্কন। ঐতিহাসিক চরিত্র বিন্দুসার-চাণক্যের পাশাপাশি নাট্যকার মনোজ মিত্র এই নাটকে স্থাপন করেছেন অনৈতিহাসিক চরিত্র দ্বৈপায়নকে। এই চরিত্রটি অনৈতিহাসিক কিন্তু ইতিহাসের সম্ভাবনা-প্রসূত। অবক্ষয়ী রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা কীভাবে বিপর্যস্ত হয়, তাদের নিরাপত্তা কীভাবে বিঘ্নিত হয় তা-ই দেখিয়েছেন নাট্যকার এই নাটকে। সমালোচক তাই এই নাটক সম্পর্কে বলেছেন ঃ ''মনোজ মিত্রের সৃজনী কল্পনার বিচিত্র বিন্যাসে তবু মানুষের ইতিহাস নয়, মূর্ত হয়ে উঠেছে ইতিহাসের মানুষ।''[১৩] প্রতিটি দৃশ্যের সূচনায় ছোটো ছোটো ছড়ার আকারে শিরোনাম দেওয়া হয়েছে, যা দৃশ্যের প্রতিপাদ্য বিষয়কে নির্দেশ করে। ইতিহাসের যে দোর্দন্ডপ্রতাপ চাণক্যকে আমরা দেখেছি, নাটকের চাণক্য তার ছায়ামাত্র। বৃদ্ধ, অশক্ত সেই চাণক্যকেই বিন্দুসারের ভয়, কারণ তিনি জনবিদ্রোহের নায়ক। তিনি ঘোষণা করেছেন, শূদ্রের গলা থেকে ঘন্টা খুলে দেবেন। চাণক্যের কলম কেড়ে নিয়ে তাকে পাটলিপুত্রের প্রাসাদে বন্দী করে স্বস্তি পেতে চান বিন্দুসার। সেখানে চাণক্য মারা যান কিন্তু জাগিয়ে দিয়ে যান, নাড়িয়ে দিয়ে যান বিন্দুসারের বিবেকবোধকে। আসলে বিন্দুসারও 'রক্তকরবী'র রাজার মতোই ব্যবস্থার শিকার, সু এবং কু-এর দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। সুভদ্রাঙ্গী সেই অভাগিনী, যাকে পিশাচিনী সাজিয়ে রাষ্ট্র নিজের অক্ষমতা ঢাকতে চেয়েছে। এক সময় সে নিজেও বিশ্বাস করে ফেলেছে যে, প্রকৃতই সে পিশাচিনী। নাটকের শেষে এই নারীকেই শক্তিরূপিণী হিসেবে দেখান মনোজ মিত্র। অত্যাচারের প্রতিবিধান করতে সে থেকে যায় প্রাসাদে। তাঁরই কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে নবযুগের আগমন-সম্ভাবনা ঃ ''আমার প্রিয়দর্শী ধ্বংস করবে শাস্ত্রবিধান, এই সাম্রাজ্যের যত অনাচার।''[১৪] সুমন যেন মহারাজ বিন্দুসারের শুভচেতনার মূর্তরূপ। পারিপার্শ্বিক প্রভাবে যে শুভচেতনা অবদমিত হয়ে আছে বিন্দুসারের মধ্যে, তাই প্রকাশিত চাণক্য-শিষ্য সুমনের মধ্যে। সে যেন 'মুক্তধারা'র সেই অভিজিৎ, যে নিজের জীবনের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠা করেছিল সাধারণ প্রজার অধিকার। সুমনও তক্ষশীলার বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে কোথায় হারিয়ে গেছে ... মিলিয়ে গেছে ... সে জীবিত না মৃত কোনো সংবাদ নেই। কিন্তু সে জাগিয়ে গেছে বিন্দুসারের অন্তরাত্মাকে, জাগিয়ে গেছে শাসকের অনুতাপবোধকে। সুমনের সংলাপেই

উচ্চারিত হয়েছে সেই শাশ্বত বাণী ঃ "সব যুদ্ধেরই ফল এক! যুদ্ধ যখন শেষ হবে, শস্যক্ষেত্রে শস্য থাকবে না, মানুষের হৃদয়ে থাকবে না স্নেহ-প্রেম-মমতা। স্বার্থান্ধ কিছু শ্রেষ্ঠী বণিক মানুষের আত্মা সওদা করে ফিরবে।"[১৫] চাণক্য এই নাটকে নীরব অথচ সবচেয়ে মুখর চরিত্র। এই চাণক্য জরাগ্রস্ত, স্থবির – অথচ পাটলিপুত্রে তাঁর দীর্ঘ ছায়া। বিন্দুসার রাজ্যে দেখেন চাণক্যের ষড়যন্ত্রের ছায়া; মহামাত্য মনে করেন, চাণক্যের ছেড়ে যাওয়া পদে কাজ করছেন বলেই তিনি যথেষ্ট বিকশিত হতে পারছেন না। চাণক্য শূদ্রমুক্তির ডাক দিয়েছেন – শূদ্ররা জেগে উঠেছে। পারিষদ-নিয়ন্ত্রিত বিন্দুসার চাণক্যের কলম জোর করে স্তব্ধ করেছেন, তাকে বন্দী করেছেন পাটলিপুত্রে। পাটলিপুত্রের রুদ্ধ বাতাসে প্রাণধারণ করতে পারেন নি চাণক্য, কিন্তু তিনি বিন্দুসারের মনের অর্গল খুলে দিয়ে গেছেন, মৃত চাণক্য বিন্দুসারের মনে জাগিয়েছেন অনুশোচনা। ক্ষৌণি সেই ধর্মধ্বজীদের প্রতিনিধি, যুগে যুগে যারা ধর্মকে ব্যবহার করে শাসককে কাজে লাগিয়েছে স্বার্থপূরণে। দন্ডপাল স্বার্থান্বেষীদের সভায় উপেক্ষিত এবং পদচ্যুত, পদলেহী সখারাম তার স্থলাভিষিক্ত। হংসী জেদী ও প্রতিবাদী, সেই সঙ্গে আছে শূদ্র বলে অসহায়তা। ইতিহাস আমাদের বারবার একথাই শিখিয়েছে যে, শাসকশক্তি যখন সভ্যতা নাশ করে, তখন তা রক্ষার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নেয় সাধারণ, প্রান্তবাসী মানুষ। নিম্নবর্গের ব্রাহ্মণ দ্বৈপায়ন সেই মানুষের প্রতিনিধি। এই চরিত্রটি সম্পর্কে মনোজ মিত্রের বক্তব্য ঃ

> " 'ছায়ার প্রাসাদ' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র দ্বৈপায়নকে পেয়েছি কল্পনায়। দ্বৈপায়ন সেই লোক, সে যা কিছু পরিত্যক্ত সেগুলোকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে রাখে। শ্মশানে পড়ে থাকা মানবশিশু, রাস্তায় হারিয়ে যাওয়া গো-শাবক ইত্যাদি সবই। এই যে কুড়িয়ে বাড়িয়ে ঘরকন্না সাজানো – এই কাজটার মধ্যে রয়েছে গৃহিণীপনা। তাই পুরুষটির আধখানা রমণী। অতএব মনে রাখবেন আমি কোনো নপুংসকের জীবনযন্ত্রণা দেখাবার জন্য চরিত্রটা দাঁড় করাইনি। সাধারণ মানুষ তুচ্ছ জিনিসকে সংগ্রহ করে লালন পালন করে, এর ওপরেই সভ্যতা সংস্কৃতি দাঁড়িয়ে। সরকারি ভাবে কখনোই সংস্কৃতি রক্ষিত হয় না। পুরুষ ও প্রকৃতির মেলবন্ধন আছে চরিত্রটির মধ্যে। সে আকাশের জ্বলজ্বলে সন্ধ্যাতারাকে মনে মনে ছোটো বোন ভেবে আপন করে নেয়। একটা আধমরা গাছ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে। ভারতীয় দর্শনের সবার ভেতরে আত্মাকে দেখতে পাওয়া – যে গাছ হোক, গবাদি পশু হোক বা নদীই হোক যেখানে যা কিছু চলমান – বিকাশমান – তার সঙ্গেই আত্মীয়তা।"[১৬]

নিম্নবর্গের এই ব্রাহ্মণ নারী-পুরুষের বিচিত্র সমবায়ে তৈরি, গভীর মানবিক তাৎপর্যে উদ্ভাসিত। ইতিহাসের নায়ক যখন ধ্বংস করে সমাজ-সভ্যতা, তখন এই সাধারণ মানুষদের হাতেই তা রক্ষিত হয়। নাটকে বিন্দুসার নিজেও তা স্বীকার করেছেন। তিনি জানেন, সুভদ্রার সন্তান পাটলিপুত্রের প্রাসাদে নিরাপদ নয়। চাণক্য-উত্তর পাটলিপুত্রে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে চলবে অন্ধ কু-সংস্কারের রাজত্ব – সুভদ্রার সন্তানকেও পিশাচ বলে ধ্বংস করা হবে। তাই শ্মশানের জিনিস 'কুড়িয়ে বাড়িয়ে রাখে' যে দ্বৈপায়ন তার ওপরেই তিনি ভার দিতে চান পাটলিপুত্রের মহাশ্মশানের অনাদৃত প্রাণ প্রিয়দর্শীকে রক্ষা করার ঃ "সম্রাট যা রক্ষা করতে পারে না, তুমি তা পারো ... সম্রাট যা অবহেলা করে তোমরা তা ধরে রাখো। তাই জগৎ সংসার চলে। নিয়ে যাও তোমার প্রিয়দর্শীকে ... আমার আতঙ্ক ঘুচাও ..."[১৭] বিন্দুসারের এই সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার মনোজ মিত্র পাঠক-দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন ইতিহাসের গর্ভে লালিত চিরন্তন মানবসত্যের দিকে।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ - কুন্তল চট্টোপাধ্যায় - রত্নাবলী-৩৯ এ পটুয়াটোলা লেন -কোলকাতা-০৯ -চতুর্থ সংস্করণ - অক্টোবর, ২০০৪, পৃ.১১৩

২) ইতিহাস ও কাব্য - অ্যারিস্টটল - কাব্যতত্ত্ব - অনুবাদ শিশিরকুমার দাশ - প্যাপিরাস - গণেন্দ্র মিত্র লেন - কোলকাতা-০৪ - ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ.৬৯

৩) অনুষ্টুপ, নাট্যবিষয়ক বিশেষ সংখ্যা - ২ - ১৪০৭/কথোপকথন ঃ নাট্যভাবনা

৪) ঐ, পৃ.

৫) তৃণমূল স্তরের নাটক 'গল্প হেকিমসাহেব' - নির্মল ধর - প্রতিদিন-১৫.০১.১৯৯৫

৬) প্রস্তাবনা - রক্তকরবী - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - রবীন্দ্র-রচনাবলী - ষষ্ঠ খন্ড - পশ্চিমবঙ্গ সরকার - ফাল্গুন ১৩৯২, পৃ.১৯৪

৭) মনোজ মিত্রের অসামান্য অভিনয় - মনসিজ মজুমদার - আনন্দবাজার পত্রিকা - ৩ জুলাই ১৯৯৯

৮) গল্প হেকিমসাহেব - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ-মাঘ ১৪০২, পৃ.১৬২

৯) ঐ, পৃ.১৬৩

১০) বারবার দেখা যায় গল্প হেকিমসাহেব - দেবাশিস মজুমদার - সোনার বাংলা - ০৭.০১.১৯৯৪

১১) দেবী সর্পমস্তা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড, পৃ.৩৬৮

১২) ঐ, পৃ.৩৭৮

১৩) অস্থির আবর্তমান সময়ের নাট্যচিত্র 'ছায়ার প্রাসাদ' - অশোক মুখোপাধ্যায় - প্রতিদিন - ৩০.১০.১৯৯৮

১৪) ছায়ার প্রাসাদ - - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র-চতুর্থ খন্ড-মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ-'রাসপূর্ণিমা', কার্তিক ১৪১০, পৃ.১৪৯

১৫) ঐ, পৃ.১৪৪

১৬) কথোপকথন ঃ নাট্যভাবনা - অনুষ্টুপ, নাট্যবিষয়ক বিশেষ সংখ্যা - ২ - ১৪০৭

১৭) ছায়ার প্রাসাদ - - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র-চতুর্থ খন্ড, পৃ.১৪৮

আঙ্গিক যখন রূপক

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে যে কোনো নাটককেই 'রূপক' বলা হয়েছে, কারণ সেখানে একজন অন্য আরেকজনের রূপ ধরে অভিনয় করে। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বের আদর্শে বাংলায় যে সাহিত্যতত্ত্ব গড়ে উঠেছে সেখানে 'রূপক নাটক' নাটকের একটি বিশেষ শ্রেণি বলে পরিগণিত। ইংরাজি Allegory শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবেই এখানে 'রূপক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অ্যাব্রাম্‌স রূপকের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে ঃ

> "An allegroy is a narrative in which the agents and action, and sometimes the setting as well, are contrived not only to make sense in themselves, but also to signify a second, correlated order of persons, things, concept or events."[১]

রূপকের মূল কথাটিই হ'ল আপাতসরল একটি কাহিনির আড়ালে একটি গূঢ় ভাবসত্যের ব্যঞ্জনা। বাইরের কাহিনি নয়, নাট্যকারের অভিপ্রেত এই ভেতরের গূঢ় সত্যটি। বাইরের খোলসটি পাঠকের বুদ্ধির দুয়ারে নাড়া দিয়ে ভেতরের সত্যটিকে বুঝে নিতে সাহায্য করে। বাইরের আবরণ ভেঙে এই ভেতরের সত্যে পৌঁছতে পাঠক-দর্শককে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয় না, সামান্য বুদ্ধির প্রয়োগেই তা সম্ভব হয়। নাট্যকারও রূপক ভাঙার অসংখ্য ইঙ্গিত তৈরি রাখেন। রূপক নাটকের আবেদন মূলত বুদ্ধির কাছে। এই নাটক স্পষ্টতই উদ্দেশমূলক। সেই উদ্দেশ্য সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা অন্য যে কোনো কিছু হতে পারে। এই ধরণের নাটকে নাট্যকারের একটি শিক্ষা দেবার অভিপ্রায় থাকে। কিন্তু সেই অভিপ্রায়টিই মুখ্য হয়ে উঠলে শিল্পরচনা হিসেবে নাটকটি ব্যর্থ হয়। নাট্যকার যা বোঝাতে চান বা যে শিক্ষা দিতে চান, তা করতে হয় যথাযথ শিল্পরূপ মান্য করেই।

নাট্যকার হিসেবে মনোজ মিত্র নিজের কালের কাছে দায়বদ্ধ। সমাজে যে ভ্রষ্টাচার, অনিয়ম ও নৈতিকতার পতন দেখেছেন,তারই বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছেন তিনি। কিন্তু তাঁর প্রতিবাদের ধরণ স্বতন্ত্র। সমকালীন বাংলা নাটকের প্রচলিত প্রবণতা অনুয়ায়ী বিশেষ মতাদর্শ আরোপ করে সমস্যা সমাধানের পথ তাঁর নয়। তাঁর অস্ত্র রঙ্গ, ব্যঙ্গ, শ্লেষ। মনোজের এই ভঙ্গিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন ঃ

> "বাংলা নাটকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে একশ বছর আগে প্রাথমিক যে একটা পথ চলা গোছের সরণি তৈরি হয়েছিল মনোজ মিত্র আজকে সে পথের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগসূত্রটি তিনি ছিন্ন করেন নি"[২]

এই সমালোচক মনোজ মিত্রকে বঙ্কিমের ভাষায় 'রসিক লাঠিয়াল' এবং 'সূক্ষ্ম ল্যানসেট'ধারী ডাক্তার বলে মনে করেছেন, যিনি "প্রয়োজনে মোটা লাঠি ব্যবহার করেছেন আবার প্রয়োজনে সূক্ষ্ম ল্যানসেট"[৩]। সামাজিক জঞ্জাল যখন পাহাড় প্রমাণ তখন সব সূক্ষ্মতা ঝেড়ে ফেলে তিনি হাতে তুলে নিয়েছেন মোটা লাঠি। স্লোগান-সর্বস্বতা নয়, তথাকথিত বিপ্লবের প্রকাশ নয়, কমেডির মধ্য দিয়েই মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার দলিল রচনা করেছেন, হাসতে হাসতেই চিনিয়ে দিয়েছেন শত্রুকে। মনোজ মিত্রের এই ভঙ্গিটি কেউ কেউ আবার পছন্দ

করেন নি। হাসির আড়ালে গভীর কথা চাপা পড়ে যায় বলে তাঁরা আক্ষেপ করেছেন। এমনকি কেউ কেউ তাঁর নাটকের গল্পের কাঠামোকে সমাজিক যাত্রা পালার বিষয়ের সঙ্গেও তুলনা করেছেন : "গল্পের এই কাঠামো কিন্তু অধিকাংশ সামাজিক যাত্রাপালার বিষয়ও বটে"[৪]। হাসি-মজা-হুল্লোড়ে আটকে থেকে মনোজের নাটক গভীরতর বোধের জগতে নাড়া দিতে পারে না বলে এই সমালোচকদের সিদ্ধান্ত : "কিছু আলটপকা মন্তব্যেই আটকে থাকে তাঁর নাটক, হয়তো এই রূপকথার ধরণে গল্প বলার ফলেই বর্তমান কালের একটা ভাসা ভাসা চেহারাই প্রকাশ করা যায়"[৫]। আসলে মনোজ মিত্রের বলার ভঙ্গিটি একান্তভাবে তাঁরই। এই ভঙ্গিতে স্লোগান নেই, আরোপিত বিপ্লব নেই, কিন্তু এমন অনেক নাট্যসংলাপ আছে যেগুলি দেখলে বোঝা যায়, তাঁর কৌতুকের শরসন্ধান ব্যর্থ হয়নি। মনোজ মিত্র আধুনিক কালের নাট্যকার কিন্তু তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনার ধরণ traditional. এ বিষয়ে তাঁকে মধুসূদন দীনবন্ধুর তুল্য মনে করেছেন সমালোচক :

> "কোনও মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে নয় – নিছক নাটক তৈরি এবং অন্তরের তাগিদে মধুসূদন এবং দীনবন্ধু কাজ করেছেন, তাঁদের প্রহসনগুলি তৈরী করেছেন। মনোজ মিত্রও তাই করেছেন। মনোজ যে সময়ে জন্মেছেন এবং বড় হয়েছেন সেই সময়ের কাছেই তাঁর দায়। জীবনের জটিলতাকে তাঁর সময়ের নিরিখেই তিনি ধরতে চেয়েছেন। জন্ম মৃত্যু ক্ষুধা ও অস্তিত্বের আঁকাড়া উপস্থাপনা; লোভ, বেঁচে থাকার ইচ্ছে, স্বার্থ, ভালোবাসা নিয়ে তাঁর উপাখ্যান। সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিশাপ ও ব্যভিচার দেখিয়ে দিয়ে মনোজ পাপীদের অনন্ত নরকে পাঠাতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। শত্রুকে চিনিয়ে দেন মনোজ হাসির বিস্ফোরণে"[৬]

এই কাজ করতে গিয়ে মনোজ মিত্র কিন্তু নাটককে বক্তব্যসর্বস্ব করে তোলেন নি। নিজের সমকালে মনোজ মিত্র দেখেছেন ক্রমাগত শত্রু সংহার এবং মুখোশ ছিঁড়তে ছিঁড়তে ক্লান্ত, 'রূপের দিক থেকে দীন' বাংলা নাটককে। তাই নাটককে একটি সম্পূর্ণ শিল্পকর্ম হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়েও তিনি সচেতন ছিলেন। তাঁর বক্তব্য তাই কখনো ইতিহাসের আশ্রয়ে, কখনো পুরাণ-কাঠামোয়, কখনো বা রূপকের আড়ালে প্রকাশ পেয়েছে।

মনোজ মিত্র তাঁর কয়েকটি নাটকে রূপকের আদল ব্যবহার করেছেন। তবে মাঝে মাঝেই রূপকের খোলসটি ভেঙে গিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়েছে নির্ভেজাল বাস্তব। এই ইলিউশন ভেঙে দেওয়া নাট্যকারের ইচ্ছাকৃত। এই গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে 'মেষ ও রাক্ষস' (১৯৭৯), 'পুঁটিরামায়ণ' (১৯৮৯-৯০), 'রাজার পেটে প্রজার পিঠে' (১৯৮৮), 'নিউ রয়্যাল কিস্‌সা' (১৯৯২) নাটক চারটিকে। এদের মধ্যে প্রথম দুটি পূর্ণাঙ্গ এবং পরের দুটি একাঙ্ক। এছাড়াও কেউ কেউ এই গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন 'রাজদর্শন' (১৯৮২) এবং 'গল্প হেকিমসাহেব' (১৯৯২-৯৩) নাটক দুটিকেও। আমাদের বিচারে অবশ্য 'রাজদর্শন'কে সামাজিক এবং 'গল্প হেকিমসাহেব'কে ঐতিহাসিক বর্গের অন্তর্ভুক্ত করাই সমীচীন। তবে উল্লেখ্য যে, এই গুচ্ছ বিভাজনে কিছু অদল-বদল হওয়াও অসম্ভব নয়। যেমন এই চারটি নাটককেই বিষয়বস্তুর নিরিখে রাজনৈতিক বর্গের অন্তর্ভুক্তও করা চলে অনায়াসে।

'সাজানো বাগান' (১৯৭৬-৭৭)-এর পর মনোজ মিত্রের উল্লেখযোগ্য নাট্য সৃষ্টি 'মেষ ও রাক্ষস' (১৯৭৯)। এই সময়কালে ভারতীয় রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা ঘটেছে। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করেন। ১৯৭৭-এর মার্চ মাসে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের পরাজয় ঘটে এবং কেন্দ্রে জনতা পার্টি ও পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৮-এ জাতীয় কংগ্রেস ভেঙে যায়, ১৯৭৯-তে পতন ঘটে মোরারজি দেশাই-এর জনতা সরকারের, ১৯৮০-র জানুয়ারিতে ভোটে জিতে ক্ষমতায় ফেরেন ইন্দিরা গান্ধী। এই রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের অবস্থা তুলে ধরেছেন মনোজ মিত্র 'মেষ ও রাক্ষস' নাটকে রূপকথার ভঙ্গিতে। কেন তিনি প্রত্যক্ষ ভাষণের পরিবর্তে রূপকথার আড়াল নিলেন সে প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে। কিন্তু বক্তব্য বিন্যাসের জন্য যে কোন আঙ্গিক ব্যবহারের স্বাধীনতা নিশ্চয়ই নাট্যকারের আছে। মূল প্রশ্ন হওয়া উচিত, সে বক্তব্য যথেষ্ট শিল্পিত রূপে পরিবেশিত হয়ে সমস্যার গভীরে পৌঁছতে পেরেছে কিনা এবং সমাধানের কোন ইঙ্গিত দিতে পেরেছে কিনা।

রূপনগর নামে এক কল্পিত রাজ্যের রাজা বিচিত্রদন্ত। অন্ধ বৃদ্ধ কঙ্কের তিন শিষ্য নীলকমল, হীরামন আর সুবর্ণ রাক্ষসকে বন্দী করে মানুষকে মুক্তি দিয়েছে কুশাসন ও শোষণ থেকে। রাক্ষস বন্দী হয়েছে। যে জাদুদন্ডের সাহায্যে রাক্ষস মানুষকে ভেড়া বানিয়ে রাখত তা বিসর্জিত হয়েছে অতল সমুদ্রে। কিন্তু রাক্ষসের সংহার ছাড়া স্বস্তি নেই। সেই সংহার নির্ভর করছে দুর্গম হিমপাহাড় থেকে আনা মৃত্যুবাণের ওপর। তিন বন্ধু নীলকমল, হীরামন আর সুবর্ণ যাত্রা করেছে হিমপাহাড়ের দিকে। যে আনতে পারবে মৃত্যুবাণ, যার হাতে মৃত্যু হবে রাক্ষসের, সেই হবে রূপনগরের রাজা, পাবে কঙ্কের পালিতা কন্যা চন্দ্রলেখাকে। এখান থেকেই নাটকের সূচনা। রাক্ষস কারাগারে বন্দী থাকলেও বাইরে আছে তার অনুচরেরা। ধনপতি, বিচারপতি আর সেনাপতি প্রেতের ছদ্মবেশে বিভেদ সৃষ্টি করে তিন বন্ধুর মধ্যে। মাঝপথ থেকে ফিরে আসে হীরামন আর সুবর্ণ। নীলকমল এগিয়ে চলে। এদিকে জেলের জালে উঠে আসে সেই জাদুদণ্ড। কঙ্ককে দেখাতে নিয়ে এলে তা পড়ে চন্দ্রলেখার হাতে। চন্দ্রলেখা ভালোবাসে কেবল হীরামনকে। জাদুদণ্ড হাতে পেতেই জেগে ওঠে মানুষের চিরন্তন লোভ! চন্দ্রলেখা জাদুদণ্ড তুলে দেয় হীরামনের হাতে। হীরামন রাক্ষসের কাছে শিখে নিক মানুষকে মেষ বানাবার খেলা। হয়ে উঠুক অপরাজেয়। নিজে রাজা হয়ে চন্দ্রলেখাকে করুক রাণী। আত্মসুখ চরিতার্থ করতে সুবর্ণকে জাদুদণ্ড চুরির মিথ্যে অপবাদ দিয়ে জেলে পাঠায় চন্দ্রলেখা। হীরামন কারাগারে যায় রাক্ষসকে লোভ দেখিয়ে জাদুর খেলা শিখতে কিন্তু মুহূর্তের ভুলে রাক্ষসই তাকে মেষ বানিয়ে ফেলে এবং মুক্ত হয়ে গিয়ে সেই মেষকে দিয়ে চালায় নরমেধ যজ্ঞ। এদিকে নীলকমল গিয়ে উপস্থিত হয় হিমপাহাড়ে জ্ঞানী মানুষের কাছে। সেই মানুষ তাকে বললেন, রাক্ষস মারার কোনো মন্ত্র নেই, কোনো পৃথক অস্ত্র নেই। নির্লোভ নিষ্পাপ অভ্রান্ত মানুষ শুদ্ধ জাগ্রত মানুষ রাক্ষসের মহাকাল। জগতে কেউ মহান পবিত্র হয়ে ভূমিষ্ঠ হয় না। বারংবার অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে তাকে সবকিছু অর্জন করতে হয়। সেই তপস্বী নীলকমলকে দিলেন পবিত্র আগুন। যে মানুষ এই আগুনের কুন্ডের মধ্য দিয়ে অদগ্ধ

বেরিয়ে আসতে পারবে সেই হবে রাক্ষসের মহাকাল। নীলকমল অনেক লোভ, অনেক ভয় জয় করে আগুন নিয়ে আসে কিন্তু আত্মগর্বে স্ফীত হয়ে তা রক্ষা করতে পারে না। তার আগেই অবশ্য পন্ডিত কঙ্ক সেই আগুন নিক্ষেপ করেছেন মেষরূপী হীরামনের গায়ে। তাতে মেষের গায়ের চামড়াই কেবল পুড়েছে, বেরিয়ে এসেছে শুদ্ধ মানুষ হীরামন। নীলকমল এবং সুবর্ণও যন্ত্রণার আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হয়েছে। তাদের তিনজনের সম্মিলিত আঘাতে মৃত্যু হ'ল রাক্ষসের। ব্যক্তিগত স্বার্থ শেষে আর প্রাধান্য পায়নি। ব্যক্তিস্বার্থ উত্তীর্ণ হয়েছে সমষ্টি চেতনায়। যে রাজপদ নিয়ে তিন বন্ধুর মধ্যে সন্দেহ-অবিশ্বাস, সেই পদেরই বিলুপ্তি ঘটল : "রাজা আর রইল না – আর ওরা তিনজন বলল – দেশকে মুক্ত করেছি আমরা – এবার মুক্তিকে পাহারা দেব আমরা"[৭]। রাজকুমারী চন্দ্রলেখার প্রসঙ্গটিও উহ্য রেখে রূপকথার আদলে 'তিন পরমা সুন্দরী কন্যে'র সঙ্গে তিন বীরের বিয়ের কথা বলা হ'ল। মনোজ মিত্রের নাটকের শর্ত মেনেই মানুষের জয়ের মধ্য দিয়ে নাটক শেষ হল :

> "যেই না রাক্ষসের রক্ত মাটিতে পড়া অমনি রূপনগরের আকাশ হল নীল, মাঠ হল সবুজ, নদী রূপালি, আর চাঁপার বনে থোকা থোকা হলুদ ফুল ফুটল। আর ফুলের দলে একে একে ভেসে উঠল রূপনগরের হারানো সন্তানদের মুখ ... শিশিরে ধোয়া নির্মল মুখগুলো ... "[৮]

বিশ শতকের সত্তরের দশকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নাট্যরূপ 'মেষ ও রাক্ষস'। ভারতবর্ষের অস্থির সেই রাজনৈতিক আবহ এই নাটকের প্রেক্ষাপট, যখন অশুভ শক্তি দীর্ঘ ক্ষমতা ভোগের পর ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং ক্ষমতা দখলকারী শক্তির লোভ ও অনৈক্যের ছিদ্রপথে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে। ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতাচ্যুত হওয়া এবং পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসার রূপক হিসেবেই এই কাহিনি গৃহীত হতে পারে। মনোজ মিত্র অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের ভাবনা অনুসারেই অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটান শুভবুদ্ধির জাগরণের মাধ্যমে। রূপকের আধারে তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট – স্বার্থলোভী, স্বেচ্ছাচারী যে মানুষেরা মানুষকে মেষ বানিয়ে কার্যসিদ্ধি করে তাদের নিধনে চাই সফল নেতৃত্ব। যে নেতা হবে তাকে অনেক প্রলোভন জয় করে, অগ্নিপরীক্ষায় শুচি হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। হিমপাহাড়ে যে তপস্বীর কাছে আছে রাক্ষসবধের আগুন তারই মুখে উচ্চারিত হয়েছে নাটকের মূল মেসেজ : "মানুষ! নির্লোভ নিষ্পাপ অভ্রান্ত মানুষ ... শুদ্ধ জাগ্রত মানুষ তার মহাকাল"[৯]। এই শুদ্ধ মানুষকেই তো মনোজ মিত্র খুঁজেছেন পরিবার থেকে রাষ্ট্র – সর্বত্র, সর্বদা। রূপকের মাধ্যমে তিনি যেমন চিনিয়ে দিয়েছেন একটি নির্দিষ্ট কালখন্ডের প্রেক্ষাপটে একটি নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডকে, তেমনি আবার অনেক সময়ই তাঁর সংলাপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নির্বিশেষ সত্য। নাটকের অধিকাংশ চরিত্রই রূপক। রাক্ষস সমকালীন এবং চিরন্তন শোষক। আর সুবর্ণ-হীরামন-নীলকমল সংগ্রামী মানুষের প্রতিনিধি। পন্ডিত কঙ্ক অন্ধ। সে সত্য ও বিবেকের প্রতীক। তপ্ত শলাকা বিঁধিয়ে রাক্ষস তাঁর চোখ নষ্ট করে দিয়েছে। শাসকের প্রাথমিক লক্ষ্য সবসময় শিক্ষাকে অন্ধ করে দেওয়া। কঙ্ককে অন্ধ করা তারই প্রতিফলন। কিন্তু কঙ্ককে অন্ধ করে তার আদর্শকে রুদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। অন্তর্দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়েছে তাঁর, পাঠশালাও বন্ধ করতে পারেনি রাক্ষস। কঙ্কের হাতের মঙ্গলদীপ অনির্বাণ। তাঁরই শিষ্যরা রাক্ষসকে বন্দী করেছে, তারাই হিমপাহাড়ে চলেছে রাক্ষসের মৃত্যুবাণ আনতে। কঙ্কের অন্ধতার আরো একটি ব্যাখ্যা নাটকে

আবিষ্কার করা যায়। কঙ্ক স্নেহে অন্ধ। এই স্নেহ পালিতা কন্যা চন্দ্রলেখার প্রতি। সেই অন্ধ স্নেহ এবং বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে চন্দ্রলেখা জাদুদণ্ড তুলে দিয়েছে হীরামনের হাতে। সংগ্রামী মানুষের মধ্যেও যে স্খলন-পতন আসে, লোভ পথভ্রষ্ট করে, তার দৃষ্টান্ত সুবর্ণ এবং হীরামন। মাঝপথ থেকে ব্রত অসম্পূর্ণ রেখে তারা ফিরে এসেছে। জাদুদণ্ড হাতে পেয়ে হীরামনের লোভ জেগে উঠেছে। জেগে উঠেছে মানুষের চিরন্তন প্রভুত্ব বাসনা। এই লোভের ফলেই সে পরিণত হয়েছে রাক্ষসের হাতিয়ার মেষ-এ। মেধাহীন, বোধ-বুদ্ধিহীন এই মেষ শাসকের ইঙ্গিতে স্বজনের বুকের রক্ত ঝরিয়েছে, নগরকে করেছে শ্মশান। শাসকের চিরকালীন তিন সহচর – বণিক, সেনাপতি এবং বিচারপতি। নাটকে প্রাথমিক ভাবে এদের প্রেতরূপে তুলে ধরে নাট্যকার সেই বিশেষ সময়ে এই শ্রেণির মানুষদের প্রেতসদৃশ আচরণকেই প্রতীকায়িত করেছেন। তিন তরুণের হিমপাহাড়ে যাত্রা এরা পণ্ড করতে চায়। কারণ রাক্ষসের পতন হলে এদের পতনও অনিবার্য। তপস্বী চরিত্রটি কীসের প্রতীক তা নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে বিভ্রান্তি আছে। বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে বৈপ্লবিক মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে আসার অর্থ নিষ্কাশন করেছেন কেউ (রবিবাসরীয় জনতা- মেষ ও রাক্ষস - চৈতালী চট্টোপাধ্যায়), কেউ বা একজন তাত্ত্বিকের কাছে দেশের নেতাদের যাত্রা (বিশ্বনাথ বসুর চিঠি) বলে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। কিন্তু খুব সহজভাবে ভাবা যায়, এই তপস্বী মানুষের শুদ্ধ চৈতন্যের প্রতীক। যে চৈতন্য প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে কিন্তু তার উদ্বোধনের জন্য বা তার কাছে পৌঁছনোর জন্য অনেক দুরূহ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগোতে হয়। যে অমোঘ অস্ত্রে তিনি হিমপাহাড়ের ডাকিনীকুল নির্মূল করে স্বপ্নের রাজ্য গড়েছেন তা আসলে মানুষের জাগ্রত বিবেক। বিশ্বের যেখানেই অশুভ শক্তির বিনাশ সম্ভব হয়েছে সেখানেই ক্রিয়াশীল থেকেছে এই শুদ্ধ চৈতন্য – এটাই মনোজ মিত্রের বিশ্বাস।

নাটকের অসংখ্য সংলাপে মনোজ মিত্র চিনিয়ে দিয়েছেন নির্দিষ্ট কালসীমাকে। তিন প্রেতের স্বরূপ উন্মোচনের পর নীলকমলের সংলাপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সমকাল ঃ "দীর্ঘ পথের যাত্রায় আমায় করেছে একা। প্রেত, তোরা সত্যিই প্রেত। পালাবদলের দিনে তোদের খেলা প্রেতের খেলা "[১০]। 'পালাবদলের দিন' শব্দ দুটিতেই রূপকথার আবরণ ভেঙে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে সমকাল। জরুরি অবস্থার সময় মানুষের যেভাবে কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল তার ইঙ্গিত আছে কঙ্কের সংলাপে ঃ "বিচিত্রদন্তের রাজ্যে কারো তো মাথা তোলার উপায় ছিল না। প্রতিবাদে যখনি মানুষ উঠে দাঁড়িয়েছে অমনি তার মাথায় ..."[১১] রাজনীতির সেই জটিল আবর্তের সময় শত্রু-মিত্র-ভেদ নির্ণয় দুষ্কর। কঙ্কের কণ্ঠে সেই আক্ষেপ ঃ "শুধু কণ্ঠ শুনে তো ঠাওর করতে পারি না – মানুষ আজ কে মানুষের পক্ষে, কে বা রাক্ষসের"[১২]। দুই ডাকাত বেনারসী ও তোতোপুরীর সংলাপে কংগ্রেস দলের আভ্যন্তরীণ কোন্দল, বহিষ্কারের হুমকি এবং শেষপর্যন্ত লোক দেখানো ঐক্যের প্রতি কটাক্ষ আছে ঃ "দলে যদি আর একটা লোক থাকত, তোকে আমি ভোটের জোরে দলছুট করে দিতুম। নেহাত দুজনের দল বলে ভোটে যেতে পারছি না!"[১৩] 'মায়ের থানে' 'ঐক্যের নাড়া' বাঁধার উল্লেখ নেত্রীর কর্তৃত্বের প্রতিই স্পষ্ট ইঙ্গিত। সমকালকে চিনিয়ে দেবার পাশাপাশি মনোজ মিত্র চিরন্তন সত্যকেও দেখিয়ে দিতে ভোলেন না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে প্রভুত্ব বাসনা, উপযুক্ত অবসরে যা প্রকাশিত

হয়। ক্ষমতার লোভ মানুষকে কীভাবে লালায়িত করে তার দৃষ্টান্ত হীরামনের সংলাপ ঃ "আমার চাই রাজার খেলা। যে খেলায় রাজা হওয়া যায়, রাজা থাকা যায়, মানুষকে ভেড়া বানিয়ে পায়ে চেপে রেখে যুগ যুগ সিংহাসন দখলে রাখা যায়"[১৪]। মনোজ মিত্রের নাট্যসংলাপের চিরন্তনতার গুণেই ওপরের সংলাপটি উত্তরকালের পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতেও সমানভাবে প্রযোজ্য হয়ে যায়। স্বার্থ চরিতার্থ করতে হীরামন সাধুর পোশাক দেয় রাক্ষসকে, ছদ্মবেশে কারাগার থেকে বেরিয়ে যেতে, প্রতিশ্রুতি দেয় মুক্ত রাক্ষসকে অবসরপ্রাপ্ত মহারাজার সম্মান দেবার। সাতের দশকে নকশাল নিধনের নামে যে নির্বিচার নাশকতা নেমে এসেছিল যুবকদের ওপর তার ইঙ্গিত আছে সুবর্ণর সংলাপে ঃ "দ্যাখো ... দ্যাখো এখনো আমার বুকে পিঠে রাক্ষসের ভীষণ নখের দাগ আঁকা রয়েছে"[১৫]। অসংখ্য যুবকের দেহে বিদ্ধ গুলির চিহ্নকেই স্মরণ করায় এই সংলাপ। 'গুপ্তহত্যা' সেই উত্তাল সময়ের একটি পরিচিত শব্দ। মুক্ত রাক্ষস মেষের মাধ্যমে যে রক্তশোষণ চালিয়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে 'গুপ্তহত্যা' শব্দটি জুড়ে দিয়েই মনোজ মিত্র রূপকথাকে নিয়ে আসেন একে বারে বাস্তবে ঃ"সে এখন ছদ্মবেশ ধরেছে। না ধরে উপায় নেই। হৃতসর্বস্ব রাক্ষস মুমূর্ষু। ছদ্মবেশের আড়ালে এবার সে গুপ্তহত্যায় নেমে পড়েছে। একজোড়া সিং চালিয়ে সংগোপনে একে একে বুক চিরে ফেলে – সে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে তার সিংহাসনের দিকে"[১৬]। যুবশক্তির একটি অংশ তখন শাসকের হাতের পুতুল। বোধ-বুদ্ধি-মেধা কিছুই তাদের নেই, আছে কেবল অস্ত্র। শাসকের নির্দেশে তারা বইয়ে দিচ্ছে রক্তনদী। এই ঘাতক শক্তি শাসকের বড় আদরের। রক্ত ঝরিয়ে আসার পর সুরা ধরতে হয় তাদের মুখে। ভুলিয়ে রাখতে হয় চৈতন্যকে। সামান্য ধ্বন্যাত্মক শব্দের কুশলী ব্যবহারেই মনোজ মিত্র সেখানে অনায়াসে ফুটিয়ে তোলেন সমকালের অনুষঙ্গ। ধনপতির সংলাপ ঃ "এই যে খাও ... চুকু চুকু চুকু" স্মরণ করিয়ে দেয় ঃ 'ঢুকু ঢুকু ঢালো চুকু চুকু পিও / এশিয়ার মুক্তিসূর্য যুগ যুগ জীও'। নগরে এখনো অনেক কানা পন্ডিত বেঁচে আছে, বেঁচে আছে অনেক ছেলে। তাই ঘাতক মেষকে তোয়াজ করে রাখতে হয়। মেষের মাথা সাফ – কোনো বোধ-বুদ্ধি সেখানে নেই। তাই স্বজনের বুক চিরে রক্তপান করানো সম্ভব হয় তাকে দিয়ে। যৌবনের এই অপচয় দেখে কঙ্কের যে আর্তনাদ তা দেশের যে কোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরই বেদনাসঞ্জাত প্রতিক্রিয়া ঃ "ওরে দেখে যা ... দেখে যা তোরা ... আমাদের গর্ব ... আমাদের আশা ... আমাদের ভবিষ্যৎ ... আমাদের দেশের যৌবন আজ একটা চতুষ্পদ জানোয়ার হয়ে আমদেরই বুকের ওপর দাপাদাপি করে"[১৭]।

'মেষ ও রাক্ষস' রূপকের আধারে রাজনৈতিক নাটক। কিন্তু প্রচলিত বাংলা রাজনৈতিক নাটকের মতো বক্তব্য-সর্বস্বতা বা আরোপিত বিপ্লবের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান নেই। কোনো 'ইজম' নয়, সমাধানে পৌঁছতে মনোজ মিত্র তাঁর নাট্যরচনার বৈশিষ্ট্য মেনেই নির্ভর করেছেন মানুষের শুদ্ধ চৈতন্য এবং জাগ্রত বিবেকের ওপর। ফলে এই নাটকের রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। সবচেয়ে সমালোচিত হয়েছে রাক্ষস নিধনে সিংহাসন বা চন্দ্রলেখাকে পাবার স্বপ্নের ব্যক্তিস্বার্থের বিষয়টি। অর্থাৎ দেশপ্রেম বা কোন মহৎ আবেগের বশে নয়, ব্যক্তিস্বার্থেই তিনজন চলেছিল হিমপাহাড়ের দিকে রাক্ষসের মৃত্যুবাণ আনতে।

ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থতার স্বপ্নে মশগুল যুবশক্তির দ্বারা রাক্ষস তথা অশুভ শক্তির বিনাশ কি সম্ভব? শেষে রাক্ষস বিনাশে হীরামনের একক প্রয়াস বিপ্লবের সাফল্যে সংঘশক্তির ভূমিকার মতো প্রধান বিষয়কে উপেক্ষা করেছে বলেই সমালোচকদের অভিমত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নাটকের প্রথম অভিনয়ে সম্ভবত রাক্ষস নিধনে হীরামনের একক প্রয়াস দেখানো হয়েছিল। কিন্তু ছাপা নাটকে আমরা দেখি মঞ্চনির্দেশ ঃ ''তিনদিক দিয়ে রাক্ষসকে ঘিরে ধরে তিনজন। তিনজনের অস্ত্র একযোগে রাক্ষসের দেহ বিদীর্ণ করে''[১৮]। কঙ্কও পবিত্র মানুষকে সম্বোধন করেছেন বহুবচনে ঃ ''যন্ত্রণায় পুড়ে পুড়ে তোমরা এলে আজ পবিত্র মানুষ। এ আগুন আর তোমাদের কাউকে পোড়াবে না''[১৯]। ব্যক্তিস্বার্থের প্রসঙ্গটিও উল্লেখ করেছেন একাধিক সমালোচক। একথা সত্য যে, রাজসিংহাসন এবং চন্দ্রলেখাকে প্রাপ্তির বাসনাই প্রাথমিক ভাবে তিন যুবককে হিমপাহাড় যাত্রায় প্রণোদিত করেছে। ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার জন্যই হীরামন এবং সুবর্ণ মাঝপথ থেকে ফিরে এসেছে। হিমপাহাড়ের পবিত্র আগুন হাতে পেয়ে নীলকমলের মধ্যে জেগে উঠেছে অহংবোধ, মাথাচাড়া দিয়েছে সিংহাসনের লোভ। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ব্যক্তিস্বার্থের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ততক্ষণ সাফল্য তাদের অনায়ত্ত। যন্ত্রণায় পুড়ে পুড়ে যখন তারা অর্জন করেছে পবিত্রতা, তখন হিমপাহাড়ের পবিত্র আগুনের মধ্য দিয়ে অদগ্ধ বেরিয়ে আসার যোগ্যতা অর্জন করেছে। তখনই তাদের সম্মিলিত প্রয়াসে রাক্ষসের দেহ বিদীর্ণ হয়েছে। মানুষের এই সংকীর্ণতা থেকে মহত্ত্বে উত্তরণই তো দেখাতে চান মনোজ মিত্র। কোনো বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শের প্রচার নয়, স্খলন-পতন, ত্রুটি-বিচ্যুতিসহ গোটা মানুষের ছবি ফুটিয়ে তুলে শেষপর্যন্ত মানুষেরই মধ্যে নিহিত মহত্তর সম্ভাবনার জাগরণ ঘটান তিনি। তাছাড়া নাটকে রূপকথার আদলটি রক্ষা করতেও রাজত্ব এবং রাজকন্যা প্রাপ্তির ব্যক্তিগত প্রসঙ্গটি সহায়তা করেছে। রূপকথার মতোই এই নাটকেও রাজত্ব (সিংহাসন)এবং রাজকন্যা (চাঁদ) প্রতীকায়িত। দুরূহ কর্ম সম্পাদনের শেষে এক পরম প্রাপ্তির আশ্বাসের বাণী। কিন্তু নাটকের শেষে রাজকন্যা-প্রাপ্তির প্রসঙ্গটিকে গুরুত্বহীন করে দিয়ে এবং অর্জিত মুক্তিকে যৌথ প্রয়াসে রক্ষা করার কথা বলে নাট্যকার রূপকথার খোলস ছিঁড়ে নাটককে অনায়াসে বর্তমান-লগ্ন করে দেন ঃ

> ''নটী ।। কেউ না – রাজা আর রইল না – আর ওরা তিনজন বলল – দেশকে মুক্ত করেছি আমরা ... এবার মুক্তিকে পাহারা দেব আমরা।
>
> মঞ্চাধ্যক্ষ ।। 'অতম্পর' কী হল ?
>
> নটী ।। বিয়ে হল। তিন পরমা সুন্দরী কন্যের সাথে তিন বীরের বিয়ে হল।''[২০]

'পুঁটিরামায়ণ' (১৯৮৯-৯০) নাটকে রামায়ণের কাহিনির খোলে মনোজ মিত্র ভরে দিয়েছেন আধুনিক কালের গণতন্ত্র তথা প্রশাসন-যন্ত্রের অন্তঃসারশূন্য স্বার্থসর্বস্ব দীর্ঘসূত্রিতাকে। রামায়ণের আদলে কান্ড বিভাজন করেছেন, তবে সাতের পরিবর্তে দুই। প্রথম কান্ডে পাঁচটি এবং দ্বিতীয় কান্ডে চারটি দৃশ্য। প্রত্যেক দৃশ্যের সূচনায় রামায়ণের মতোই শিরোনাম রয়েছে। হাওড়ার পুঁটিরাম বাগচি বিরচিত এই পুঁটিরামায়ণে রাম, সীতা, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, হরধনুভঙ্গ,

হনুমান, জাম্বুবান, জটায়ু, গন্ধমাদন, লঙ্কাদাহন ইত্যাদি সবই আছে, অতিরিক্ত আছে রচয়িতা পুঁটিরাম বাগচি স্বয়ং। বিশ শতকের যে পুঁটিরাম ঃ

> "বছরে আড়াই মাস টাকে চুল গজাবার অব্যর্থ ডাক্তারি ... দেড়মাস বাইসাইকেল কারিগরি, পৌনে তিনমাস তেলাপিয়া মাছের আড়তদারি, পাঁচমাস সাড়ে সতেরো দিন খোলা জানালায় আঁকশি ঢুকিয়ে গেরস্ত ঘরের থালাঘটিবাটি হাতাখুন্তি ঝাড়াঝুড়ি"[২১]

করে, সে রচনা করেছে এই 'সবিশেষ পাতলা রামায়ণ' এবং নিজেও ঢুকে বসে আছে সেই রামায়ণের খোলের মধ্যে। বক্কেশ্বর ফেরিওয়ালা তার সাগরেদ টেঁপাকে নিয়ে এই রামায়ণ ফেরি করে ... দু'টাকায় পাঁচটা সঙ্গে একটা কার্বোরাইজড দেশলাই ফ্রি। 'এই রামায়ণ কিনতে যাদের আঁতে ঘা লাগবে তাদের জন্য বিনামূল্যে দেখানো হচ্ছে এর বিষয়বস্তু'।

পুঁটিরামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড মঞ্চের ওপর দৃশ্যমান। হনুমান লঙ্কাপুরী লণ্ডভণ্ড করে যখন রাজসভায় উপস্থিত হয়ে বাদানুবাদের পর রাবণের গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করে সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে তখন অকুস্থলে আবির্ভাব হাওড়ার পুঁটিরাম বাগচির। বিংশ শতাব্দীর পুঁটিতন্ত্র তিনি চালু করেলেন ত্রেতা যুগের স্বর্ণলঙ্কায়। রাবণকে প্রশাসনিক ব্যবস্থার মোহে মুগ্ধ করলেন, ইন্দ্রজিৎকে বোঝালেন ভাবমূর্তির গুরুত্ব। তদন্ত কমিশন বসিয়ে কীভাবে ফাঁসি দিয়ে 'আইন-মাফিক হত্যাকান্ড' সংঘটিত করতে হয় তা শুনিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিলেন। হনুমানের ফাঁসির জন্য তৈরি হল বিচারবিভাগ, কারাবিভাগ। বন্দিকে ধর্মকথা শোনাবার জন্য পার্ট টাইম কাজ জুটল পন্ডিতের। রক্ষীপ্রধান শল্লক পুঁটির পরামর্শে জানল, কীভাবে গর্জন তেলের সঙ্গে রেড়ির তেলের ভেজাল দিয়ে আর রাবড়ির মধ্যে ব্লটিং পেপার গুঁজে দিয়ে উপার্জন বাড়ানো যায়। প্রায় সকলেই বাড়তি আয়ে উৎসাহিত, কেবল নাট্যকারের পীড়িত বিবেকের যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে বৈদ্য চরিত্রের মাধ্যমে। সমাজ এবং রাষ্ট্রের অধঃপতন নাট্যকারের হৃদয়ে যে রক্তক্ষরণ ঘটায় তারই উচ্চারণ যেন বৈদ্যর সংলাপে ঃ

> "ভালো হচ্ছে? আপনি বলছেন ভালো হচ্ছে? পাঁচ টাকার ওষুধ দিয়ে রোজ পাঁচ হাজার টাকার বিল করছি। টাকা নিচ্ছি আর বাড়ি ফিরে শুধু কাঁদছি। আপনারা কাঁদেন না অ্যাঁ, টাকা মেরে আপনাদের মন খারাপ হয় না! ... ওহোহো পুঁটিরাম এমন সিষ্টেমের চাকায় বেঁধেছে ... গোল্লায় যাচ্ছি, তবু থামতে পারছিনে? কাঁদবো না? ... বুঝতে পারছেন না কী হচ্ছে ... হতে চলেছে কেউ বুঝতে পারছেন না আপনারা?"[২২]

আধুনিক গণতান্ত্রিক সভ্যতার সমস্ত কু এবং কূট কৌশল পুঁটিরাম চালু করে দিয়েছেন স্বর্ণলঙ্কায়। বিভীষণের ভেতরকার সিংহাসনলোভী সত্তাকে জাগিয়ে তুলেছেন।শক্তিকে অথর্ব করে রাখার অব্যর্থ উপায় 'পাতার নেশা' চালু করেছেন লঙ্কাপুরে। নতুন ব্যবস্থার মোহে রাবণ মেনে নিয়েছেন পুঁটির সব ব্যবস্থা। লঙ্কাপুরে এখন পুঁটি ছাড়া গতি নেই। কিন্তু সমস্যা একটাই – ফাঁসুড়ের অভাবে হনুর ফাঁসি আটকে আছে। লঙ্কাপুরীতে হীন নীচ কুলাঙ্গার কেউ এগিয়ে আসছে না ফাঁসুড়ের পদ নিতে অথচ পদটি হীন নীচ কুলাঙ্গারের জন্য সংরক্ষিত। পেশাগত বিশেষ দক্ষতা ঃ "মনে হিংসা থাকবে না, দৃষ্টিতে থাকবে জিঘাংসা। অধরে লেগে থাকবে হাসি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে লোকটাকে মনে হবে চির উপবাসী"[২৩] দরখাস্তের ফর্ম বিক্রি,

ফটো তোলা, পোস্টাল অর্ডার নেওয়া ইত্যাদি সব দায়িত্ব পুঁটিরামের। এমন কি ইন্টারভিউ বোর্ডের চেয়ারম্যানও পুঁটিরাম। সব আয়োজন সত্ত্বেও একমাত্র ফাঁসুড়ের অভাবে আটকে অছে ফাঁসি।

লঙ্কাপুরীতে বন্দী হনুকে নিয়ে সবাই শুরু করেছে স্বার্থ চরিতার্থতার খেলা। সকলেরই অবৈধ আয়ের উৎস বন্দী হনু। এদিকে ফাঁসি দিতে না পেরে দশাননের সম্মানহানি ঘটছে। মান রক্ষার্থে হনুমানকে তিনি ক্ষমা করে দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু হনুমান দেখতে চায় দশাননের ক্ষমতা। কালনেমির পরামর্শে হনুকে পালাবার অবসর দিয়ে পেছন থেকে পাথর ছুঁড়ে হত্যার সিদ্ধান্ত হয়। এই কলঙ্কজনক কাজের দায়িত্ব পায় কুম্ভকর্ণ এবং বিভীষণ। নেশাগ্রস্ত কুম্ভকর্ণের হিতাহিতবোধ লুপ্ত আর সিংহাসনের দাবী তুলে নির্বাসিত বিভীষণ যে কোনো মূল্যে দশাননের মার্জনা চায়। কিন্তু এখানেও বিভীষণ হনুমানকে মুক্তি দেবার বিনিময়ে নিজের সিংহাসনপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে চায়। হনুমান বিভীষণের সে প্রয়াস ভেস্তে দেয়। ফাঁসুড়ে জোগাড় করতে এবার পুঁটিরাম সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে বিয়ের লোভ দেখায়। যে ফাঁসুড়ের চাকরি নেবে সে লাভ করবে সুন্দরী যুবতী দাসী মাছরাঙাকে। এই সূত্রে লঙ্কাপুরে দাসীর বিয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তবু কোনো প্রার্থী নেই ফাঁসুড়ের পদে। পুঁটিরাম বিংশ শতাব্দীর মানুষ। তিনি জানেন, হীন নীচ কাপুরুষ কুলাঙ্গার সত্তা আছে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই। উপযুক্ত অবসর সৃষ্টি করতে পারলেই তা বেরিয়ে আসবে নিশ্চিত। তাই তার পরামর্শে ফাঁসুড়ের পদের জন্য ঘোষিত হল দেশের সর্বোচ্চ স্কেল। সুযোগ-সুবিধা লঙ্কেশ্বর দশাননের চেয়েও বহুগুণ বেশি। এবার খসে পড়ল আবরণ। মনের অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এল হীন নীচ কুলাঙ্গার সত্তা। উপস্থিত হল লাখ লাখ আবেদনকারী। রাজপন্ডিত, রাজবৈদ্য থেকে শুরু করে রাজভ্রাতা কুম্ভকর্ণ, রাজমাতুল কালনেমি প্রত্যেকেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ কুলাঙ্গার রূপে প্রতিষ্ঠা করে চাকরিটা পেতে চায়। কারো লোভ অর্থে তো কারো সুন্দরী নারীতে। নিজেকে কুলাঙ্গার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে প্রত্যেকেই নিজেদের কুকীর্তির তালিকা পেশ করেছে। শেষে পুঁটির পরামর্শে ফাঁসুড়ের চাকরী দেওয়া হয় 'কালজয়ী কুলাঙ্গার' পুঁটিকেই আর আবেদনকারীদের আসামী করে ফাঁসিতে ঝোলানোর আদেশ হয়। প্রথম ঝোলানো হবে পন্ডিতকে। তার আগে পন্ডিতকে পড়তে হবে পুঁটি আর মাছরাঙার বিয়ের মন্ত্র। কিন্তু ততদিনে লঙ্কায় জেঁকে বসেছে পুঁটিতন্ত্রের মহিমা। সবাই শিখে গেছে কাজ ঝুলিয়ে রাখতে। পণ্ডিত তাই মন্ত্র শেষ না করে 'না-না-না' করে ঝুলিয়ে রাখে। ফাঁসিও ঝুলে থাকে। সকলেই পণ্ডিতকে উৎসাহ দিয়ে চলে ফাঁসি ঝুলিয়ে রাখতে। পুঁটিরাম-মাছরাঙার বিয়েও ঝুলে থাকে অনন্ত প্রতীক্ষায়।

মনোজ মিত্র এই নাটকে ব্যবহার করেছেন রামায়ণ কাহিনির আদল। প্রাচীনকালে গায়েনরা যেমন পটের ছবি দেখিয়ে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি গেয়ে বেড়াতেন, ঠিক সেভাবেই যেন বঙ্কেশ্বর ফেরিওয়ালা এবং তার সাগরেদ টেঁপা একালের পুঁটিরামায়ণের গায়েন। সমাজ-রাজনীতির ভ্রষ্টাচারকে কটাক্ষ করার জন্য মনোজ মিত্র এখানে রামায়ণ কাঠামোকে ব্যবহার করেছেন। তবে রাবণ-বিভীষণ-ইন্দ্রজিৎ-কালনেমি এবং হনুমান থাকা সত্ত্বেও এই রামায়ণ যে নিতান্তই একালের তা স্পষ্ট ত্রেতাযুগের রামের পরিবর্তে কলিযুগের

পুঁটিরামের অনুপ্রবেশে। পুঁটিরাম কালজয়ী কুলাঙ্গার। স্বরচিত রামায়ণের খোলে সে স্বয়ং বিরাজমান কলিযুগের পোশাক পরিচ্ছদ এবং জিনিসপত্রসহ। রাবণসহ লঙ্কাপুরীর সকলকে বিংশ শতাব্দীর জিনিসপত্র এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিচয় দিয়ে তাক লাগিয়ে নিজের আখের গোছাতে চায় পুঁটিরাম। লঙ্কাপুরীতে চালু করে পুঁটিতন্ত্র। নাট্যকার এই পুঁটিতন্ত্রের মাধ্যমেই রঙ্গ-ব্যঙ্গ শ্লেষের তীর নিক্ষেপ করেন আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষতিকর দিকগুলির প্রতি। সীতাহরণকে রাবণ ব্যাখ্যা করেন 'নির্যাতিতা নারীর উদ্ধার' হিসেবে। হনুমান-মাল্যবান-কালনেমি-রাবণের সংলাপে দু'একটি মাত্র বিশিষ্ট শব্দের প্রয়োগে মনোজ মিত্র অনায়াসে ফুটিয়ে তোলেন মানবাধিকার রক্ষার নামে সারা বিশ্বের ওপর মার্কিন খবরদারির অনৈতিক প্রয়াসকে ঃ

> ''হনুমান ।। পররাজ্যের ঘরোয়া ব্যাপারে কেন তোরা গলাইবি মাথা।
>
> মাল্যবান ।। তোরা বলিস ঘরোয়া ব্যাপার ...
>
> আমরা বলি ব্যাপার মানবাধিকার রক্ষার।
>
> কালনেমি ।। দৃষ্টি ভঙ্গির তফাৎ বুঝিলি বজ্জাত।
>
> রাবণ ।। জগতে যেখানে উঠিবে জাগি মানবাত্মার আক্ষেপ ...
>
> সেখানেই পড়িবে রাবণের হস্তক্ষেপ।
>
> শোনরে নরাধম রামের শাবক,
>
> রাবণ হৈতে চাহে বিশ্বের নৈতিক অভিভাবক''[২৪]

পুঁটিরামের দৃষ্টিতে রাবণ 'জগতের সেই আদি পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার নায়ক', কালনেমি 'রাবণের পলিটিক্যাল অ্যাডভাইসার' আর ইন্দ্রজিৎ 'হিজ ম্যাজেস্টির সাম্রাজ্যবাদী কারবারের এক নম্বর স্তম্ভ'। এই পরিচয়ের সূত্রেই রামায়ণের আগল ভেঙে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ হয়ে ওঠেন একালের সহযাত্রী। রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা রাজনীতির ভ্রষ্টাচারের প্রতি বিদ্রূপ মনোজ মিত্রের অন্যান্য নাটকের মতো এই নাটকেও সহজলভ্য। পুলিশি ব্যবস্থার প্রতি তাঁর কটাক্ষ ঃ ''আমাদের কালের রক্ষী বাহিনী মানে পুলিশ কেমন শান্তশিষ্ট নম্র, সাতচড়ে রা কাড়েন না। অবশ্য দুষ্ট লোক বলে থাকে, তারা কথায় কথায় গুলি ছোঁড়ে''[২৫] নেতাদের ভাবমূর্তিপ্রিয়তাকে ব্যঙ্গ করেতেও ছাড়েন নি তিনি ঃ ''একটু ভাবমূর্তির জন্যে আমাদের কালের নেতারা মাথা কোটাকুটি করছেন, আর আপনি গড়া জিনিস গুঁড়িয়ে দিচ্ছেন। ধরে রাখুন জেনারেল, ইমেজটাকে ধরে রাখুন। আখেরে ঐ ভাবমূর্তি ভাঙিয়ে খেতে পারবেন''[২৬] সাংসদদের অসংসদীয় আচরণও রেহাই পায়নি তাঁর ব্যঙ্গ থেকে ঃ ''আমাদের কালে সংসদে কক্ষনো মারামারি হয় না। বড়জোর জুতো ছোঁড়াছুঁড়ি ... ব্যস্''[২৭] মন্ত্রি হতে নেতাদের আগ্রহকেও ব্যঙ্গ করেছেন তিনি ঃ

> ''আমাদের কালে দেখগে যা, মন্ত্রী হবে শুনে ঘাটের মড়াও তিড়িং করে লাফ দিয়ে উঠে বসে। শুধু সে নয়, তার নাত বৌ-এর কোলের ছেলেটাকেও মন্ত্রী করবে বলে ছুটোছুটি করে''[২৮]

গণতন্ত্র, রাজনৈতিক মূল্যবোধ, আইনশৃঙ্খলা, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, প্রশাসনিক পরিকাঠামো প্রভৃতি গালভরা শব্দের আড়ালে যে অন্তঃসারশূন্যতা চলছে আধুনিক দেশীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় তার দিকে আঙুল তুলেছেন নাট্যকার, তবে সবটাই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকের আবরণে। বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতাকে কটাক্ষ করেছেন তিনি ঃ "আমাদের কালে বিচারব্যবস্থা মানে খালাস-ব্যবস্থা। তদন্তের রায় যতদিনে বেরুবে তদ্দিনে বিবাদী চিরতরে খালাস"[২৯] অতি প্রত্যক্ষ বিষয় সম্পর্কেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তদন্ত কমিশন বসানো হয় ঘটনার সত্যতা নিরূপণে। তাই সভায় সকলের সামনে হনুমান রাবণের গালে চড় মারলেও পুঁটিরাম তদন্ত কমিশন বসাতে বলে সত্যিই হনুমান চড় মেরেছে কিনা তা নির্ণয়ের জন্য। এই তদন্ত কমিশন সম্পর্কে নাট্যকারের বক্তব্য ঃ "তদন্ত মানেই হচ্ছে কর্তার ইচ্ছাপূরণ"[৩০] ফাঁসি মনোজ মিত্রের দৃষ্টিতে 'আইন মাফিক হত্যাকান্ড'। সমগ্র নাটক জুড়েই নাট্যকারের শ্লেষ ও রঙ্গের পরিচয় ছড়িয়ে আছে। বক্কেশ্বরের গলায় তিনি শুনিয়েছেন আধুনিকতার ট্রাজেডি ঃ "ওইটাই তো মজা মামা মজা ওইটাই/ আধুনিক হতে মামা কুলাঙ্গার চাই"[৩১] শিক্ষকের প্রাইভেট টিউশন, চিকিৎসকের অসততা, ভেজাল কারবার প্রভৃতি কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। 'সিস্টেম' যখন মুখ্য হয়ে ওঠে তখন আসল কাজ চাপা পড়ে যায়, টিঁকে থাকে শুধু সিস্টেমের আড়ম্বর। সেই আক্ষেপ রাবণের সংলাপে ঃ "ওঃ মহাবিত্তশালী মহাপরাক্রমী রাজা রাবণ প্রশাসনের জালে জড়িয়ে পড়ে ক্রমশ অথর্ব অক্ষম জুবুথুবু দিশেহারা। একটা ফাঁসিও তার পক্ষে সুষ্ঠুভাবে দেওয়া সম্ভব না"[৩২] দলীয় নেতা বা নেত্রীর কাছে রাজনীতিকদের পদত্যাগপত্র জমা দেওয়া, যাতে প্রয়োজনে ফিরিয়ে নেওয়া যায়, রাজনীতির মূলস্রোতে টিঁকে থাকার বাসনা, পলায়নপর বন্দী হত্যা প্রভৃতি রাজনীতির অসংখ্য খুঁটিনাটিকে মনোজ মিত্র তুলে ধরেছেন এই নাটকে। তবে পুঁটিরাম তথা নাট্যকারের প্রধান কৃতিত্ব মানুষের কুলাঙ্গার সত্তা উন্মোচনে। উপযুক্ত অবসর সৃষ্টি করে পুঁটিরাম টেনে বের করেছেন বিভীষণের রাজ্যলোভ, পন্ডিত-রক্ষীপ্রধানের উপরি আয়ের লোভ, কুম্ভকর্ণর মনুষ্যত্বনাশী নেশার লোভ, কালনেমির নারীলোভকে। যে লঙ্কাপুরে একজন মাত্র ফাঁসুড়ে পাওয়া যাচ্ছিল না, উপযুক্ত অবসর সৃষ্টি করেতেই সেখানে উপস্থিত হল লাখ লাখ আবেদনকারী – যারা প্রত্যেকেই নিজেদের শ্রেষ্ঠ কুলাঙ্গার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যগ্র। শেষপর্যন্ত সমস্ত কুলাঙ্গারের ফাঁসির আদেশ ঘোষণার মধ্যে নাটকের মনোজ মিত্র সুলভ সমাপ্তি।

মনোজ মিত্রের যে কোনো নাটকেরই প্রাথমিক লক্ষণ নাটক হয়ে ওঠা। আলোচ্য নাটকেও সমাজ-রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতির প্রতি বহুবিধ কটাক্ষ সৃষ্টি করেও রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুকে একে সমগ্র নাটক হিসেবে পূর্ণতা দিয়েছেন তিনি। ফেরিওয়ালা বক্কেশ্বর ও টেঁপার কৌতূহলোদ্দীপক প্রচারভঙ্গির মধ্য দিয়ে নাটকের সূচনা, লঙ্কার রাজসভায় রাবণের গালে হনুমানের চপেটাঘাতের পরমুহূর্তেই একেবারে কলিযুগের পোশাকে ত্রেতাযুগের রাজসভায় পুঁটিরামের আবির্ভাব, বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন ধারণা ও বস্তুর সহযোগে লঙ্কার রাজসভায় বিস্ময় উৎপাদন, বিভীষণকে 'মীরজাফর' বলে সম্বোধন, রাবণের কাঁটাচামচ গিলে ফেলা, টর্চলাইট নিয়ে রাজসভায় চরম কৌতূহল প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়েছে।

হনুমান ও মাছরাঙার মধ্যে রোমান্স, পুঁটিরামের অদ্ভুত এবং আশ্চর্য সংলাপ, পণ্ডিতের বিচিত্র মন্ত্রোচ্চারণ, রক্ষী কর্তৃক রাবড়ির মধ্যে ব্লটিং পেপার গুঁজে আয় বাড়ানোর উল্লেখ প্রভৃতি নাট্যগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। মাঝে মাঝেই রামায়ণের মতো কবিতার আকারে সংলাপ রচনা করে নাট্যকার রামায়ণের যুগের সৌগন্ধ এনেছেন কিন্তু সে সংলাপে নিতান্ত আধুনিক কালের অনুষঙ্গ জুড়ে দিয়ে রূপকের আবরণটিকে ইচ্ছাকৃত খসিয়ে ফেলেছেন। যেমন, বিভীষণের সংলাপ ঃ "নির্বাসনে না হৈবে দমন/ অন্তরে জ্বলিছে হুতাশন/ শোনরে পামর ... / যথাকালে লঙ্কায় দিবে দেখা জনাব মীরজাফর"[৩৩] কৌতুক সৃষ্টিতে এসব সংলাপের ব্যবহার অনবদ্য। মনোজ মিত্র জানেন, বলার কথাটিকে শিল্পরূপের আধারে কীভাবে বলতে হয়। দৃষ্টি ও শ্রুতিনন্দন হিসেবে নাট্যশিল্পকে গড়ে তোলার কাজে তাঁর সাফল্য প্রশ্নাতীত। তাই সমস্ত কাজের কথাকে ধারণ করেও তাঁর নাট্যসৃষ্টি একটি সম্পূর্ণ শিল্পকর্ম। 'পুঁটিরামায়ণ' সেই সমগ্র শিল্পসৃষ্টিরই অন্যতম দৃষ্টান্ত।

'রাজার পেটে প্রজার পিঠে', (১৯৮৮) মনোজ মিত্রের আর একটি রূপক নাটক। ভূমিকায় নাট্যকার একে 'কিশোর নাটক' বলে উল্লেখ করেছেন। অরণ্যরাজ্যের রূপকে মনোজ মিত্র এই নাটকে আসলে বলতে চেয়েছেন আমাদের পরিচিত প্রতিবেশেরই কথা, যেখানে বহুকে বঞ্চিত করে শাসক নিজের আখের গুছিয়ে নেয়। কিন্তু মনোজ মিত্রের নাটকের বৈশিষ্ট্য মেনেই শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারে না শাসকের স্বার্থবুদ্ধি, তার পরিবর্তে জয়ী হয় সাধারণ প্রজারা। রাজার গুপ্ত সম্পদ প্রজাদের হাতে আসে।

বন-রাজ্যের রাজা সিংহ। তার রাজ্যচালনার মূল নীতি 'খরচা কমাও খাজনা বাড়াও'। খরচ কমানোর জন্য কতগুলি অদ্ভুত যুক্তি আছে তার। হাঁটা-চলা করতে সড়ক বানাতে চান না তিনি, কারণ হাঁটা-চলা করলেই পায়ে পায়ে সড়ক গড়ে ওঠে। হাসপাতালে ডাক্তার-নার্স-ঝাড়ুদারদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মরার চেয়ে বাড়িতে মায়ের কোলে মাথা রেখে মরা অনেক শ্রেয় বলে হাসপাতাল অপ্রয়োজনীয়। দেশের সংকট সকলের কাছে তুলে ধরতে রাজা নিজে পরেন বৈঁচি ফলের মালা আর লোহার বর্ম। লোহার বর্ম দামে সস্তা, টেঁকসই, আবার কাচার খরচও নেই। রেপসিডে রান্না করা খোড়-চচ্চড়ি রাজার খাদ্য। অর্থ ব্যয়ের নাম শুনলেই রাজার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। রাজকর্মচারীরা কেউই পুরো বেতন পান না। বেতনের কথা তুললেই রাজার মনটা টকে যায়, একচোখে ছানি পড়েছে বলে মাকে তিনি আধখানা চশমা পরিয়ে রেখেছেন। খরা-পীড়িতদের বন্যার অঞ্চলে আর বন্যাপীড়িতদের খরার অঞ্চলে পাঠিয়ে একই সঙ্গে দুই সমস্যার সমাধান করা গেছে ভেবে তিনি অদ্ভুত আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। বন্যার্তদের ত্রাণ প্রসঙ্গে তার উক্তি ঃ

> "টাকা ছাড়া ত্রাণ করা যায় না? এই তো বললে খাদ্যশস্য ভেসে গিয়েছে। ভেসে আর কদ্দূর যাবে। যাও ওদের গিয়ে বলো যে যার খাদ্যশস্য খুঁজে পেতে ধরে এনে রাজভাণ্ডারে জমা দিয়ে যাক। তারপর আমি আমার মতো ত্রাণ ব্যবস্থা করবো"[৩৪]

প্রজাদের ত্রাণ দেবার পরিবর্তে তিনি নিজের পায়ের ধুলো মন্ত্রির হাতে দিয়ে বলেন যে, বন্যা

ও খরাপীড়িতদের মাথায় ছড়িয়ে দিতে। পদধূলির সাহায্যে তারা খরা ও বন্যার বিপদ থেকে মুক্ত হবে। কিপটে রাজার রাজ্যে মূর্তিমতী বিদ্রোহ ময়ূর। সে রংচঙে জামা পরে, পায়ে সোনার নূপুর বেঁধে, নেচে গেয়ে বেড়ায়। সে ফাঁস করে দিয়েছে রাজার লুকোনো রত্নগুহার সংবাদ। ময়ূরকে কিছুতেই কজা করতে পারেন না রাজা। এদিকে ছত্রধারী রাসভও একদিন শুনে ফেলেছে ঘুমের মধ্যে রাজা বিড়বিড় করে বলছিলেন, পাহাড়ের মাথায় সুন্দর সরোবরের ওপর ঝুলন্ত হিরের প্রাসাদ বানিয়ে শেষ জীবন তিনি আরামে কাটাবেন। সেখানে কাউকে এমনকি নিজের মাকেও নিয়ে যাবেন না। বন্যার্ত হরিণ-হরিণী এবং খরাপীড়িত শশকেরা রাজপ্রাসাদের সামনে বসে পড়েছে। রাজার অশ্বশক্তি এবং বিমান শক্তি (বাজপাখি) উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে দুর্বল, সুতরাং শক্তির জোরে অবস্থানকারীদের হটিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। রাজাকে ভেট দেবার জন্য শরণার্থীরা যে নারকেল আর ঘি-গুড় এনেছিল তা দিয়ে রাজপ্রাসাদের সামনে তারা ভাজছে 'মুখসামালি পিঠে'। তাদের বক্তব্য, রাজাও যদি তাদের মতো নিজের ঘরে পিঠে বানাতে পারেন তা হলে ওরা ঘেরাও তুলে নেবে। কিপটে রাজার হাত ওরা খোলাবেই। ওরা দুয়ো দিচ্ছে – ওরা যা পারে রাজা তা পারেন না। অতিষ্ঠ হয়ে রাজা যখন প্রজাদের হাত থেকে মুক্তির উপায় খুঁজছেন তখন এসে উপস্থিত গুপ্তঘাতক ঋক্ষ। যে গুপ্তঘাতক এর আগে রাজার আদেশে বিদ্রোহীদের পেট চিরে দিয়েছে, রাজার পিতাকেও যমালয়ে পাঠিয়েছে, আজ তারই ওপর রাজা ভার দিয়েছেন হরিণ-শশক নিধনের। ঋক্ষ বেরিয়ে গেছে কর্মসাধনে। আর রাজা আকুল হয়েছেন মুখসামালির গন্ধে। নিজে খরচ করবেন না, তাই রসনা তৃপ্তির জন্য তিনি আদেশ দেন শরণার্থীদের মুখের পিঠে ছিনিয়ে আনতে। ছিনিয়ে আনা সেই পিঠে রাজা যখন গোগ্রাসে গিলছেন তখনই ঋক্ষ এসে জানায় হরিণ-শশক বধের জন্য সে পিঠেতে সেঁকো বিষ মাখিয়ে দিয়েছিল। মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত রাজা এবার নিজের সমস্ত গোপন কীর্তি প্রকাশ করে দেন। রত্নগুহার চাবি মায়ের হাতে দিয়ে সমস্ত ধনসম্পদ প্রজাদের ফিরিয়ে দিতে বলেন, কারণ প্রজাদের নিঃস্ব করেই গড়ে উঠেছিল সেই ধনভাণ্ডার। কিপটে রাজার রাজ্যে ডাক্তার, ঔষধ, হাসপাতাল কিছুই নেই। তাই অসহায়ভাবে মরতে হবে রাজাকে। কিন্তু রত্নগুহার চাবি দিয়ে দেবার পর রাজা জানলেন বিষ নয় – পিঠেতে মেশানো ছিল মধু। পবননন্দনের পরামর্শে ঋক্ষ নিজের পূর্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে কৌশলে কিপটে রাজার হাত খুলিয়েছে। প্রজাদের সম্পদ প্রজাদের হাতে ফিরে আসায় সকলের আনন্দ এবং ময়ূরের গানে নাটকের সমাপ্তি।

কিশোর মনের উপযোগী এই নাটকে মনোজ মিত্র অরণ্য রাজ্যের রূপকের আড়ালে আসলে মানব সমাজেরই কথা বলে এই বার্তা দিতে চেয়েছেন ঃ "সবকে মেরে আপনা বাঁচা হয়না হয়না"[৩৫] বাঁচতে হয় সকলকে নিয়ে। সে বাঁচাতেই প্রকৃত আনন্দ। যারা স্বার্থপরের মতন বহুকে বঞ্চিত করে কেবল নিজেই বাঁচতে চায় তাদের মনোজ মিত্র কিপটে রাজার মতো দশাই করেন। কিশোর নাটক হলেও নাট্যকার এখানেও সুযোগমতো বলে দিয়েছেন তাঁর বলার কথাগুলি, অবশ্যই নাট্যিক শর্ত অক্ষুণ্ণ রেখে। সমস্যা সমাধানে শাসকের অদ্ভুত যুক্তির ইঙ্গিত আছে সড়ক ও হাসপাতাল নির্মাণ এবং বন্যা ও খরার সমস্যা প্রসঙ্গে। হাসপাতালের

অব্যবস্থা সম্পর্কে কটাক্ষ করেছেন মনোজ মিত্র সুযোগ পেতেই ঃ"হাসপাতাল একটি সুবৃহৎ আস্তাকুঁড়, পুঁজ-রক্ত-মাছি-ব্যান্ডেজ। আমি বলছি, নাকে সর্দি নিয়ে ঢুকবে পেটে ছুরি-কাঁচি নিয়ে ফিরে আসবে"[৩৬] মনোজের দৃষ্টিতে হাসপাতাল হল 'হুশপাতাল', যেখানে ভরতি হলে বেহুঁশ হয়ে হুশ্‌শ্‌ করে পাতালে চলে যেতে হয়। দেশের সংকটকালে সকলকে কৃচ্ছ্রসাধনের উপদেশ দিয়ে এবং কর্মচারীদের উপযুক্ত বেতন না দিয়ে, প্রজাদের নিঃস্ব করে যে শাসক গোপনে নিজের বিলাসের উপকরণ সঞ্চয় করেন তিনি কেবল রূপকথার রাজ্যের অধিবাসী নন, বরং আমাদের পরিচিত জগতেই তার আনাগোনা। শরণাগত প্রজাকে রক্ষা নয়, শরণার্থীদের বল প্রয়োগে বিতাড়িত করা এবং তাদের সর্বস্ব হরণ করা যে শাসকের নীতি তার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করেছেন মনোজ মিত্র এই নাটকে।

" 'নিউ রয়্যাল কিস্‌সা' তে হবু রাজা ও গবু মন্ত্রীর বহুচেনা প্রায় আর্কিটাইপাল জুটিকে মনোজ ব্যবহার করেন চারপাশের সমাজ রাজনীতির ভ্রষ্টাচারকে ব্যঙ্গের চাবুকে ফালাফালা করার জন্য"[৩৭] – বলেছেন শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়। ১৯৯২ সালে রচিত এই নাটকে দ্বিতীয় হবু ও দ্বিতীয় গোবুর রাজত্বকাল বর্ণনা করতে গিয়ে মনোজ মিত্র আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার বিভিন্ন ফাঁকফোকরের দিকে আঙুল তুলেছেন। জ্যোতিষী ইন্দুগুপ্তের ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করে প্রথম হবুচন্দ্র নোবেল পুরস্কার আশা করেছিলেন। তিনি সেই আশায় এবং তার মন্ত্রী প্রথম গোবুচন্দ্র নোবেল পুরস্কারের প্রাইজমানির ভাগ পাবার আশায় থেকে থেকে শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে পাগল হয়ে যান এবং তাদের স্থান হয় পাগলা গারদে। এরপর শাসনভার গ্রহণ করেন দ্বিতীয় হবু-গোবু। এই দ্বিতীয় হবুও জ্যোতিষী বাঁকাশশীর কথায় বিশ্বাস করেছেন, তার হাতে নোবেল প্রাইজের রেখা ফুটে উঠেছে। মন্ত্রি গোবু নিজেদের বাবাদের কথা স্মরণ করিয়ে রাজাকে সাবধান করেছেন। কিন্তু রাজা তখন নোবেলের স্বপ্নে বুঁদ। তবে বেশ কিছু সতর্কতাও তিনি নিয়েছেন। বাঁকাশশীর কাছ থেকে বাহাত্তর ঘন্টার টাইম বেঁধে নিয়েছেন, গোবুর পীড়াপীড়িতে চন্দ্রপুলিকে দায়িত্ব দিয়েছেন আচরণে অস্বাভাবিকতা কিছু দেখলেই সতর্ক করতে। সাগরপার থেকে নোবেলকর্তার ফোন এসেছে, দ্বিতীয় হবুচন্দ্র পাবেন নোবেল শান্তি পুরস্কার। যে দেশে দিন দুপুরে চুরি ডাকাতি খুন জখম ধর্ষণ চলে অবাধে, সেই দেশের শাসক পাবেন নোবেল শান্তি পুরস্কার। এই সময় দেশের কোথাও সামান্যতম অশান্তির সংবাদে ফস্‌কে যেতে পারে নোবেল। তাই যে কোনো প্রকারে শান্তি স্থাপন এখন একমাত্র লক্ষ্য। গোবু প্রাইজামানির হাফশেয়ার চায়, কারণ তার বিশ্বাস, তারই দক্ষ পরিচালনায় দেশময় শান্তি বিরাজিত। বাঁকাশশী তাকে পাগল প্রতিপন্ন করার ভয় দেখিয়ে নতি স্বীকারে বাধ্য করেন। বাঁকাশশীরই পরামর্শে দেশের সমস্ত দুষ্কৃতীকে আত্মসমর্পণে আহ্বান জানান রাজা হবুচন্দ্র। সে আহ্বানে সাড়া দেয় দস্যু, চোর এবং পকেটমার। রাজ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পেশা ত্যাগ করতে রাজি কিন্তু তাদের প্রতিদিনের উপার্জন রাজকোষ থেকে মিটিয়ে দিতে হবে। যদিও প্রত্যেকের দৈনিক উপার্জন সমান নয় তবু এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে কেন – এই যুক্তিতে প্রত্যেকেরই দাবী দৈনিক সাড়ে পাঁচ লাখ। রাজকোষে অর্থ নেই, সুতরাং বাঁকাশশীর পরামর্শে সকলকে মন্ত্রি করে নেওয়া হল। চোর

ডাকাত পকেটমার এবং তাদের আত্মীয়দের নিয়ে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মন্ত্রিসভা গড়লেন দ্বিতীয় হবুচন্দ্র। গোবুর সব দপ্তর কেড়ে নিয়ে অন্যদের দেওয়া হলে ক্ষিপ্ত গোবু ফোনে নোবেলকর্তার কাছে হবুচন্দ্রের নামে ভাংচি দিতে যায় আর তখনই আবিষ্কৃত হয় ফরেন এক্সচেঞ্জ ফুরিয়ে যাওয়ায় সাগরপারের লাইন একমাস থেকে বন্ধ। জ্যোতিষী বাঁকাশশীই বাইরে থেকে ফোন করে হবুচন্দ্রকে প্রলুব্ধ করেছেন। এই বাঁকাশশী আসলে ছদ্মবেশে সেই ইন্দু গুপ্ত, হবু-গোবুর কুশাসন থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করাই যার উদ্দেশ্য। চোর-ডাকাত-পকেটমার রূপে যারা এসেছে তারাও আসলে সেই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক শক্তি। দেশের সমস্ত দপ্তরের চাবি এসেছে সাধারণ মানুষের কাছে, প্রথম হবু-গোবুর মতো দ্বিতীয় হবু-গোবুও পাগল হয়েছে এবং তাদের আর বংশধর নেই বলে হবু-গোবুর কুশাসন থেকে দেশ রক্ষা পেয়েছে। মনোজ মিত্রের নাটকের বৈশিষ্ট্য অনুসারেই শেষপর্যন্ত অন্যায়কে পর্যুদস্ত করে ন্যায় ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে।

হবু-গোবুর রাজতন্ত্রের রূপকের আড়ালে মনোজ মিত্র এই নাটকে রঙ্গ এবং ব্যঙ্গের তীর নিক্ষেপ করেছেন সমকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকে। রাষ্ট্রপ্রদত্ত পুরস্কারগুলির প্রদান ব্যবস্থার অস্বচ্ছতা প্রসঙ্গে তাঁর ব্যঙ্গ ঃ

> "হবু ।। ... দ্যাখো আর সব খেতাব পুরস্কার – মানে দেশরত্ন দেশমুক্তা দেশচুনি দেশপান্না দেশহীরা ...
>
> চন্দ্রপুলি ।। মানে যে যে খেতাব পুরস্কার এই দেশে মহারাজ নিজ হস্তে বিতরণ করেন ...
>
> হবু ।। এ পর্যন্ত তার সবগুলিই আমি পেয়েছি, মানে ...
>
> চন্দ্রপুলি ।। মানে মহারাজই মহারাজকে বিতরণ করেছেন ..."[৩৮]।

দেশে অপরাধ যতই ঘটুক না কেন, তাকে লঘু করে দেখাবার চেষ্টা শাসকের চিরন্তন। হবুচন্দ্রও চব্বিশ ঘন্টায় আড়াইশো চুরি ডাকাতির সংবাদ পেয়ে বলেন ঃ "মাত্তর আড়াইশো। তবে তো পরিস্থিতি পুরো কনট্রোলে। বলো, শান্তি বিরাজ করছে"[৩৯]। হবুর এই সংলাপ সহজেই মনে করিয়ে দেয় পশ্চিমবঙ্গে সংঘটিত যে কোনো অপরাধের পর এ রাজ্যকে 'শান্তির মরূদ্যান' বলে শাসকের আত্মশ্লাঘা অনুভবের বিষয়টিকে। দেশে অবস্থা যেমনই থাক, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে তুলতে যে কোনো শাসকই হবুচন্দ্র ঃ "আওয়াজ ছাড় – এ দেশ শান্তির দেশ, মহাশান্তির দেশ ... দেশজুড়ে একটা শান্তি উৎসব লাগা"[৪০]। দেশের অক্ষম পুলিশি ব্যবস্থাও রেহাই পায় না মনোজ মিত্রের ব্যঙ্গ থেকে ঃ

> " যে দেশে দিনদুপুরে চুরি ডাকাতি খুনজখম ধর্ষণ মর্ষণ সবই চলে, সে দেশে টাকা ব্যয় করে পুলিশ প্রশাসন সাজিয়ে রাখার কী দরকার। তার চেয়ে আমাদের মতন কাকতাড়ুয়া পুষুন মহারাজ ... আর কিছু না হোক খোকাখুকুরা আমাদের দেখে একটু ভয় পাবে"[৪১]

বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতাকেও কটাক্ষ করেছেন মনোজ মিত্র ঃ

"গোবু ।। ধরা না হলে কী হয়েছে, তদন্ত চলছে। যথা সময়ে তদন্তের ফল জানতে পাবে!

হবু ।। তুমি না পেলে তোমার ছেলে পাবে ...

গোবু ।। সে না পেলে নাতি পাবে ...

হবু ।। দীর্ঘদিন তদন্ত না হলে সেপাই দারোগা চৌকিদার হাকিম মোক্তারদের চলবে কি করে বাপু?"[৪২]

অদ্ভুত যে এক স্থিতাবস্থাকে শান্তি বলে প্রচার করে আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন শাসক এবং প্রতিবাদহীন নিশ্চেষ্টতায় সেই স্থিতাবস্থাকে মেনে নিয়ে বালিতে মুখ গুঁজে থাকে যে মধ্যবিত্ত তার প্রতি মনোজ মিত্রের ব্যঙ্গ ঝাঁঝালো রূপ নিয়েছে। বিনা প্রতিবাদে সব মেনে নেবার স্থবিরতা তাঁকে এখানে ক্ষিপ্ত করেছে। প্রয়োগমূলক রাজনীতির কারণে অধস্তন ব্যক্তিও কী ভাবে ওপরওয়ালার নেতা হয়ে ওঠে তাও দেখিয়েছেন তিনি ঃ "দেখুন, আমি ক্লাস ফোর স্টাফ হতে পারি, কিন্তু ইউনিয়নের সেক্রেটারি"[৪৩] রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন সম্পর্কে বলতে গিয়ে মনোজ মিত্র Serious. কৌতুকের আবরণ নয়, ব্যঙ্গ তখন উন্মুক্ত এবং তীব্র। চোর দস্যু পকেটমার নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন হবুচন্দ্র। এতদিন যেসব অপকর্ম করতে হত লুকিয়ে চুরিয়ে এবার থেকে তা করা যাবে প্রকাশ্যে। মন্ত্রীত্ব মানেই মনোজ মিত্রের দৃষ্টিতে প্রকাশ্যে অপকর্ম করার লাইসেন্স ঃ "আর তো লুকোচুপি থাকল না, চোরাগোপ্তা থাকল না, মেহনত থাকল না – কিন্তু আমদানি থাকল। আরো বেশি থাকল"[৪৪]

সমাজ-রাজনীতির ভ্রষ্টাচারকে ব্যঙ্গের চাবুকে পীড়ন করতে গিয়ে মনোজ মিত্র কিন্তু নাটককে বক্তব্যের ভারে ভারাক্রান্ত করে তোলেননি। নাটকীয়তার শর্ত প্রাথমিকভাবে রক্ষা করেছেন। হবু-গোবুর কাহিনি বয়নের ভূমিকা হিসেব গান ব্যবহার করেছেন, একটি নির্দিষ্ট ঘটনা (হবুচন্দ্রের নোবেল প্রাপ্তির সম্ভাবনা) অবলম্বনে কাহিনির সূচনা, বিকাশ ও পরিণতি দেখিয়েছেন, আগাগোড়া কৌতুকের আবরণটি রক্ষা করেছেন। চন্দ্রপুলি, প্রেমশশী, বাঁকাশশী প্রভৃতি চরিত্র কমেডির মাপে রচিত। নেপথ্যে পাগলাগারদে বন্দী প্রথম হবুচন্দ্র ও প্রথম গোবুচন্দ্রের কণ্ঠস্বর এবং বাদ্যযন্ত্রের উৎকট আওয়াজ নাটকীয় প্রতিবেশ রচনা করেছে ও দ্বিতীয় হবু-গোবুর সম্ভাব্য পরিণতির ইঙ্গিত দিয়েছে। হবু-গোবুর সংলাপে মনোজ মিত্রের নিজস্ব ধরণে নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়েছে ঃ

"গোবু ।। (লাফাতে লাফাতে) মহারাজ! সাগরপারের কল! নোবেল প্রাইজের বড়কর্তা হটলাইনে আপনাকে ডাকছে মহারাজ!

(শুনে ফ্যাল ফ্যাল করে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল হবু – তারপর ঘোর অবিশ্বাসে –)

হবু ।। যাঃ

গোবু ।। হ্যাঁ, এ বছর প্রাইজের জন্যে আপনার নাম প্রস্তাবিত হয়েছে!

হবু ।। (লজ্জায় রাঙা হয়ে) দূর! ইয়ার্কি মেরো না তো !

গোবু ।। (হবুর দিকে রিসিভার বাড়িয়ে ধরে) মাইরি মহারাজ, বাবার দিব্যি! কোন্ শালা ইয়ে করে ...

হবু ।। (লজ্জায় সন্দেহে আশায় অবিশ্বাসে বিচিত্র হয়ে উঠে তোতলাতে শুরু করে) যাঃ আ- আমার নাম প্র-প্রস্তাব হবে কেন ? ধ্যা-অ্যাৎ-আ-আ-মি কে-এ একটা ?''[৪৫]

এসব সংলাপে চোখের সামনে ভেসে ওঠে মঞ্চের ওপর অভিনয়রত মনোজ মিত্র। কৌতুকের এই আবরণ সরিয়ে আবার প্রয়োজনের সময় মনোজ মিত্র Serious কথাটিও বলিয়ে নেন তাঁর চরিত্রকে দিয়ে ঃ

''উচ্ছব মচ্ছোব দিয়ে সত্যিকথাটা আড়াল করা যাবে না মন্ত্রিমশাই! এখনো যদি ঐ চোর ডাকাত খুনে লম্পটদের শাসন না করেন, আমরাও পাল্টা আওয়াজ ছাড়বো – দেশে শান্তি নেই ! শান্তি পুরস্কার জলে পড়ছে!''[৪৬]

রূপকের আঙ্গিক ব্যবহৃত হয়েছে প্রধানত যে চারটি নাটকে তার মধ্যে 'মেষ ও রাক্ষস' Serious নাটক, বাকি তিনটি কমেডির ভঙ্গিতে রচিত। তবে সবগুলি নাটকেই মনোজ মিত্রের আক্রমণের লক্ষ্য সমাজ-রাজনীতির ভ্রষ্টাচার। কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ-অনুসারী ইচ্ছাপূরণের নাটক নয় মনোজ মিত্রের, তবে তাঁর আছে নিজের বিশিষ্ট নাট্যরচনার ধরণ। সেখানে পরিনামে শুভশক্তির জয় ঘোষিত হয় কিন্তু তা কখনো আরোপিত মনে হয় না, নাট্যদেহের নিপুণ গঠন কৌশলের সুচারু পরিণতিরূপেই উপস্থাপিত হয়। তিনি নিজের বলার কথাটিকে বেশিরভাগ সময়েই বলেন কৌতুকের আবরণে, তবে কখনো কখনো প্রয়োজনে কৌতুককে দূরে সরিয়ে নির্মম ব্যঙ্গের শরও নিক্ষেপ করেন। কোনো বিশেষ আদর্শ-অনুসারী নয় বলে মনোজ মিত্রের আঘাত কোনো বিশেষ কারো দিকে নয়, বরং তা এক সাধারণীকৃত প্রতিবাদের রূপ পায়। কেনো কোনো সমালোচক তাঁর নাট্যরচনার এই ভঙ্গিটিতে গভীরতার অভাব খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু মধুসূদন-দীনবন্ধুর উত্তরসূরী মনোজ মিত্রের নাট্যরচনা কোনো বিশেষ মতাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে নয়, বরং সামাজিক জঞ্জাল অপসারণের জন্য। সে জঞ্জাল সরাতে গিয়ে তিনি সেখানেই প্রয়োজন বোধ করেছেন সেখানেই রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুকের তীর নিক্ষেপ করেছেন। যেখানেই দেখেছেন ভ্রষ্টাচার সেখানেই যেন কান মুলে দেখিয়ে দিয়েছেন সত্য পথটিকে। তবে তাঁর এই শোধন-প্রয়াস সবসময়ই সহমর্মীর বেদনা-সঞ্জাত। এই কারণেই তাঁর দৃষ্টি প্রসন্ন, বাণী সরস। তিনি জানেন স্খলন-পতন মানুষের-ই বৈশিষ্ট্য। স্খলিত, পতিত মানুষকে তিনি ধুলো ঝেড়ে-মুছে পৌঁছে দেন শুদ্ধ চৈতন্যের জগতে, সেখানেই তাঁর অনন্যতা।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১) 'সাহিত্য প্রকরণ - হীরেন চট্টোপাধ্যায়' গ্রন্থে উৎকলিত। তৃতীয় সংস্করণ - বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ - কলকাতা- পৌষ ১৪০৬, পৃ.১৩৭

২) মনোজের মনোভূমি ঃ কুমার রায় - স্যাস্-১৯৯০, পৃ.৩৫০

৩) ঐ, পৃ.৩৫০

৪) মনোজ মিত্র ঃ জনপ্রিয়তার দুই দশক - সৌমিত্র বসু-স্যাস্-১৯৯৩, পৃ.৮৫

৫) ঐ, পৃ.৯১

৬) মনোজের মনোভূমি ঃ কুমার রায় - স্যাস্-১৯৯০, পৃ.৩৫০

৭) মেষ ও রাক্ষস - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি.- ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট - কলি-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ - মাঘ ১৪১৩, পৃ.৯৫

৮) ঐ, পৃ.৯৫

৯) ঐ, পৃ.৮৫

১০) ঐ, পৃ.৬৩

১১) ঐ, পৃ.৬৫

১২) ঐ, পৃ.৬৬

১৩) ঐ, পৃ.৬৮

১৪) ঐ, পৃ.৭৩

১৫) ঐ, পৃ.৭৯

১৬) ঐ, পৃ.৮০

১৭) ঐ, পৃ.৯২

১৮) ঐ, পৃ.৯৫

১৯) ঐ, পৃ.৯৫

২০) ঐ, পৃ.৯৫

২১) পুঁটিরামায়ণ - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড, পৃ.২৯৭

২২) ঐ, পৃ.৩০৯

২৩) ঐ, পৃ.৩০৬

২৪) ঐ, পৃ.৩০০

২৫) ঐ, পৃ.৩০২

২৬) ঐ, পৃ.৩০২

২৭) ঐ, পৃ.৩০৩

২৮) ঐ, পৃ.৩১৫

২৯) ঐ, পৃ.৩০৪

৩০) ঐ, পৃ.৩০৫

৩১) ঐ, পৃ.৩০৬

৩২) ঐ, পৃ.৩২৪

৩৩) ঐ, পৃ.৩১৭

৩৪) রাজার পেটে প্রজার পিঠে - মনোজ মিত্র - অপেরা - ৬৫ সূর্যসেন স্ট্রীট - কোলকাতা-০৯ - মাঘ ১৩৯৯, পৃ.২৪

৩৫) ঐ, পৃ.৬৩

৩৬) ঐ, পৃ.১৬

৩৭) দশ আঙুলের অঞ্জলি - 'মনোজ মিত্রের দশ একাঙ্ক' -এর ভূমিকা - অশোক মুখোপাধ্যায় - অপেরা - ৬৫, সূর্য সেন স্ট্রীট - কোলকাতা-০৯ - মাঘ ১৪০৭

৩৮) নিউ রয়্যাল কিস্‌সা - মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - পঞ্চম খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১৩, পৃ.২৬১

৩৯) ঐ, পৃ.২৬৫

৪০) ঐ, পৃ.২৬৯

৪১) ঐ, পৃ.২৬৬

৪২) ঐ, পৃ.২৬৬

৪৩) ঐ, পৃ.২৭৯

৪৪) ঐ, পৃ.২৮০

৪৫) ঐ, পৃ.২৬৭

৪৬) ঐ, পৃ.২৬৯

রহস্য নাটক ঃ 'পাহাড়ী বিছে' ও 'বেকার বিদ্যালংকার'

নাটক রচনার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু এবং পটভূমি নির্বাচনে মনোজ মিত্রের লেখনীকে বলা চলে সর্বত্রগামী। দীর্ঘ নাট্যজীবনে তিনি দু'টি রহস্যনাটক রচনা করেছেন – 'পাহাড়ী বিছে' (১৯৭৬-৭৭) এবং 'বেকার বিদ্যালংকার' (চতুর্থ সংস্করণ ১৩৯৮)। প্রথমটির পটভূমি শৈলশহর দার্জিলিং এবং দ্বিতীয়টির পটভূমি কোলকাতার অভিজাত অঞ্চল সল্টলেকের এক অফিস বাড়ি। 'পাহাড়ী বিছে' নাটকে ভয়াল ভীষণ রহস্য সৃজন করেছেন নাট্যকার। যমজ দুই বোন কণা এবং রত্না আকৃতিতে একরকম হ'লেও প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ বিপরীত। অগাধ ঐশ্বর্যের মালিক রাজা রায় 'হোটেল মুনমুন'কে কেন্দ্র করে অবৈধ ব্যবসা চালায়। ঝকঝকে মুখোশের আড়ালে সে ঢেকে রাখে নিজের কদর্য রূপ। ধনী মেয়েদের নিজের ব্যক্তিত্বের দ্বারা আকর্ষণ করে তাদের সর্বস্ব হাতিয়ে নিয়ে খুন করে সে। সম্পত্তির লোভে এই রাজা রায় বিয়ে করেছে কণাকে কিন্তু বিয়ের পর থেকে কণার বোন রত্নার প্রতিই তার আকর্ষণ। ছোটোবেলা থেকেই কণার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ রত্নাও রাজাকে ছিনিয়ে নিয়ে কণাকে আঘাত দিতে চায়। রত্না কোলকাতায় হস্টেলে থেকে পড়ে। কণার বাড়িতে থাকেন তাদের এক কাকা। তাদের বাবার সমস্ত সম্পত্তি কণার নামে লিখে কাকা রত্নার জন্য কেবল মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন বলে রত্নার আক্রোশ আরো তীব্র। রত্নাকে ভালোবাসার পাশাপাশি রাজা ভালোবাসে অর্থ। মালিনী, ডোরা, কণা, রত্না প্রত্যেকের সঙ্গেই সে ভালোবাসার অভিনয় করেছে মাত্র। কণা যখন কিছুতেই নিজের সম্পত্তি রাজার নামে লিখে দিচ্ছে না, তখন রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তার পরিকল্পনা ছিল, সম্পত্তি লিখিয়ে নেবার পর কণাকে ডিভোর্স করে রত্নার সঙ্গে ঘর বাঁধবে। কিন্তু সম্পত্তি না পেয়ে সে অধৈর্য হয়ে পড়ছে। এদিকে রত্না পড়াশুনোর পাট চুকিয়ে চলে এসেছে দিদির বাড়িতে। সে ক্রমাগত রাজাকে চাপ দিয়ে যাচ্ছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য। রাজা অনেকবার ভেবেছে কণাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার কথা, কিন্তু মন স্থির করে উঠতে পারেনি। যেদিন রত্নার মুখে খবর পেল যে, কণা উকিল ডেকে উইল করছে এবং সম্ভবত পূর্বপ্রেমিক সুব্রত'র স্কুলের নামে সব দান করে দিচ্ছে, সেদিন সম্পত্তি হাত থেকে বেরিয়ে যাবার আশঙ্কায় রাজা বিপর্যস্ত। মদের টেবিলে চৌধুরীর পরামর্শে রাজা সেদিন চরম সিদ্ধান্ত নেয়। কণাকে 'মাইনাস' করে তার জায়গায় রত্নাকে কণা বলে চালাবে আর রত্না তখন কণা সেজে সম্পত্তি লিখে দেবে রাজার নামে। রত্নার চিন্তাক্ষমতা লোপ করতে তাকে ড্রাগে অভ্যস্ত করে তুলতে থাকে রাজা।

কণা এই ষড়যন্ত্রের আঁচ পেয়ে চিঠি লিখেছে পূর্বপ্রেমিক সুব্রতকে। রাজার মুখোশ ছিঁড়ে দিতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ডোরা ল্যামবার্ট যেদিন বুঝেছে যে, রাজা তার সঙ্গে প্রতারণা করছে সেদিন সে কণার কাছে এসে জানিয়ে দিয়েছে রাজার আগের সব কীর্তি, জানিয়ে দিয়েছে কণাকে হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা। কণার প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর হয়েছে ঃ "ওর মুখোশ আমি ছিঁড়ে দেবো। ও যেমন আমার জীবনটা নষ্ট করেছে ... যদি বেঁচে থাকি ... তেমনি আমিও ওর ..."[১]। কিন্তু সুব্রত এসে পৌঁছবার আগেই রাতের অন্ধকারে সিল্কের ফাঁস জড়িয়ে রাজা সাঙ্গ করল হত্যালীলা। কিন্তু কাকে সে হত্যা করল? কণা না রত্না? সুব্রত এসে যাকে দেখল তাকে তো তার কণা বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু কেন তবে সে সুব্রতকে

এবং কাকাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল? পাহাড়ী কিশোরীর গায়ে কণার চাদর দেখে জিজ্ঞাসাবাদ করে সুব্রত বুঝতে পারে, রাজা কণাকে হত্যা করে রত্নাকে কণা সাজিয়ে রেখেছে। এই বুঝে ফেলার শাস্তি হিসেবেই তাকে বন্দী হতে হয়। অন্যদিকে ডোরা ল্যামবার্টও কাল্পনিক এক টেপ রেকর্ডারে রাজার সব কথা ধরা আছে বলে রাজাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। ডোরা এবং সুব্রতকে হোটেলের গুমঘরে রেখে হোটেলে আগুন দিয়ে দার্জিলিং-এর পাট চুকিয়ে রাজা আবার অন্য জায়গায় গুছিয়ে বসবে। কিন্তু তার আগে আরো একটা 'মাইনাস' করবে সে এবং তা রত্নাকে। রত্না দিনরাত কণার ভূত দেখছে, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। হত্যার সব প্রমাণ সে নিয়েছে পুড়িয়ে ফেলার জন্য, তবু তার স্বস্তি নেই। তাই তাকে 'মাইনাস' করে সমস্ত প্রমাণ লোপ করতে চায় রাজা রায়চৌধুরী। পাহাড়ী বিছের বিষ দিয়ে যখন সে হত্যা করতে যায় তখনই তাকে চমকে দিয়ে প্রকাশিত হয় আসল সত্য- আগে যাকে হত্যা করা হয়েছে সে আসলে রত্না আর এখন তার সামনে দাঁড়িয়ে কণা। এই কণার কাছে রাজার সমস্ত অপকর্মের প্রমাণ মজুত। এদিকে ডোরার নীরব প্রেমিক লাল সিংয়ের চেষ্টায় সুব্রত এবং ডোরা মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছে। শেষে সুব্রত, কাকাবাবু এবং পুলিশ (যে কিনা এতদিন 'হাতিয়া' নামের আড়ালে রাজার দলে কাজ করছিল সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে) এসেছে এবং পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগে অন্যমনস্কভাবে অন্যের জন্য আনা পাহাড়ী বিছের কৌটোয় হাত দিয়ে ফেলায় তীব্র দংশনে রাজার মৃত্যু হয়েছে। কণা-সুব্রত'র নতুন জীবনের ইঙ্গিতে নাটক শেষ করেছেন মনোজ মিত্র।

এই নাটকে স্মাগলিং-ব্ল্যাকমেলিং আছে, গুলি-বন্দুক আছে, গুন্ডার ছদ্মবেশে পুলিশ আছে, ভাড়াটে গুন্ডা আছে, গুমঘর আছে, হোটেলের বারে গান আছে, তীব্র নাট্যোৎকণ্ঠা আছে, Dramatic Relief হিসেবে গড়গড়ি এবং চৌধুরীর কৌতুক আছে – এককথায় পেশাদার মঞ্চে অভিনয়ের উপযোগী রহস্য নাটকের সব মশলাই এতে মজুত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই নাটক প্রথম অভিনীত হয় রামমোহন মঞ্চে ১৭ মার্চ, ১৯৯১, পর্ণিকা এন্টারপ্রাইজ-এর প্রযোজনায়। নাটক জমিয়ে দেবার সব উপকরণ থাকা সত্ত্বেও পড়তে গিয়ে বারবার মনে হয়, এধরণের নাটক মনোজ মিত্রের উপযুক্ত বিচরণক্ষেত্র নয়। যে কৌতুক তাঁর শরসন্ধানের মূল অবলম্বন, এই নাটকে গড়গড়ি চরিত্রে তা অনেকটাই স্থূল। কণা ও রত্নার মধ্যে মিল কতটা – প্রকৃতপক্ষে তা বোঝাতেই গড়গড়ির নাটকে উপস্থিতি। কিন্তু তার ভাঁড়ামো কোনো কোনো সময় মাত্রাছাড়া। নেপালি বৃদ্ধ এবং তার নাতিকে নিয়ে এসে নাটকে একটা আঞ্চলিক সৌগন্ধ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন নাট্যকার। তবে সম্ভবত কোলকাতার দর্শকের বোধগম্য করার জন্যই সংলাপে নেপালি ভাষার ইচ্ছাকৃত বিচ্যুতি ঘটিয়েছেন। কণার মৃত্যুসংবাদ নিশ্চিত করে রহস্যজাল ঘনীভূত করার জন্যই এই দৃশ্যটির উপস্থাপনা। যে রকম চরিত্রের আশ্রয়ে সাধারণত তাঁর বক্তব্য প্রকাশিত হয়ে থাকে, এই নাটকে তার ইঙ্গিত আছে কেবল কাকাবাবু, লাল সিং এবং সুব্রত চরিত্রে। কাকাবাবু সহায়-সম্বলহীন আশ্রিত। তিনি একান্তভাবে কণার শুভচিন্তক। লাল সিং ডোরা ল্যামবার্টের নীরব প্রেমিক। চরম বিপদের সময় সে গোপন দরজা দেখিয়ে দিয়ে ডোরা এবং সুব্রতর প্রাণ বাঁচিয়েছে কিন্তু নিজে লুটিয়ে পড়েছে গুলির আঘাতে। সুব্রত কণার প্রেমিক কিন্তু নিজের আর্থিক দুর্বলতা তাকে প্রেমে প্রত্যয়ী করতে পারে নি। ব্যর্থতার বিষাদ থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে সে গ্রহণ করেছে শিশু-সাহচর্য। বস্তির ছেলে-মেয়েদের বিনে পয়সায় শিক্ষা দেবার

আদর্শ নিয়ে সে গড়ে তুলেছে 'শিশুমেলা'। কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও বলতে হয় যে, 'পাহাড়ী বিছে' মনোজ মিত্রের প্রতিভার প্রতি সুবিচার নয়। নাটক জুড়ে অসংখ্য রোমহর্ষক ঘটনা, একের পর এক ঘটনা এবং সুখদায়ক পরিণতি অনেকটাই সিনেম্যাটিক। সম্ভবত এই কারণেই তাঁর নাট্যধারায় 'পাহাড়ী বিছে' প্রায় নিঃসঙ্গ।

'পাহাড়ী বিছে'র মঞ্চসাফল্য সম্ভবত মনোজ মিত্রকে উৎসাহী করেছিল আর একটি রহস্য নাটক 'বেকার বিদ্যালংকার'-এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করতে। ১৯৯১, মার্চ মাসে 'পাহাড়ী বিছে'র মঞ্চায়নের পর আশ্বিন, ১৩৯৮ (সেপ্টেম্বর - অক্টোবর, ১৯৯১) এ 'বেকার বিদ্যালংকার' -এর চতুর্থ সংস্করণের প্রকাশ সেই অনুমানকেই দৃঢ়তর করে। ১৯৬৬ সালে একাঙ্ক হিসেবে লিখেছিলেন 'বেকার বিদ্যালংকার'। এখন তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিলেন যদিও ছাপা গ্রন্থে অভিনয়ের কোনো সংবাদ নেই, তবু অভিনয়-সাফল্যের উপযোগী সব রসদই এখানে বর্তমান। 'পাহাড়ী বিছে'র সঙ্গে এই নাটকের প্রধান পার্থক্য হ'ল-রহস্য এখানে এসেছে মানবিক সংকটের আধারে সমাজবিশ্লেষণী সূত্র নিয়ে। নাট্যকার এখানে আবার স্বভূমিতে অধিষ্ঠিত। শাণিত ব্যঙ্গ, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আর অশ্রুসজল হিউমারে তিনি সাজিয়েছেন রহস্যের বাতাবরণটিকে।

শীর্ণকায় বিদ্যালংকার 'ক্রনিক বেকার'। সেই আঠারো বছর বয়স থেকে তেত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত চাকরির বাজারে সে ক্রমাগত ডিগবাজি খেয়েছে। কোনো ডিগ্রি-ডিপ্লোমা অর্জন করতেই তার বাকি নেই। অ্যানাটমি-ফিজিওলজিতে তার যথেষ্ট জ্ঞান, রাজভবনের মাটিতে খেজুর চাষ সম্ভব কিনা সেকথা সে জানে, রাষ্ট্রসংঘে প্রতিদিন কত কিলো ধুনো পোড়ে সে তথ্যও তার নখদর্পণে। এখন সুন্দর করে ডিগবাজি খেতেও সে জানে। তা সত্ত্বেও তার চাকরি হয় নি। ভারতবর্ষের অসংখ্য কোটি বেকারের অন্যতম প্রতিনিধি শীর্ণকায় ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে একদিন বোম তৈরি করে পৌঁছে যায় ভরদ্বাজ ট্রেডিং কোম্পানির সল্টলেকের অফিসে এবং নিজেই যেচে ইন্টারভিউ দিতে শুরু করে। এই অফিসে ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যে অফিসের দু'নম্বর আধিকারিক পবন সরকারের এক চপেটাঘাতে মৃত্যু হয় শীর্ণকায়ের। লাশ নিয়ে এবার বিপদে পড়ে যায় পবন। যে ভোম্বল ডাক্তার অপারেশন করতে গিয়ে রোগীর পেটে ছুরি কাঁচি গজ রেখেই সেলাই করে দেন, তিনি পর্যন্ত ডেথ সার্টিফিকেট লিখতে চান না। সম্ভব-অসম্ভব নানা ভাবনার মাঝে হঠাৎ পবনের অধস্তন কর্মচারী মন্টুর মাথায় আসে অদ্ভুত এক প্ল্যান। খিদিরপুর ডকের বাজপাখি মানে Mr. Hawk ভরদ্বাজ ট্রেডিং কোম্পানিতে তিনশো বাহান্ন পেটি চায়ের অর্ডার দিয়ে পেয়েছেন এক পেটি কম। পবন সেই এক পেটি চা বিক্রি করে দিয়েছে বাগড়ি মার্কেটে। Hawk সাহেব বারবার হানা দিচ্ছেন সেই চায়ের জন্য। এই সুযোগে শীর্ণকায় বিদ্যালংকারকে চায়ের পেটিতে ভরে কামাসকাটকায় চালান দেবার প্ল্যান করেছে মন্টু। ভারতবর্ষ এই একটা জিনিসই প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রফতানি করতে পারে — খাঁটি নির্ভেজাল বেকার।

কিন্তু এই পরিকল্পনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয় হঠাৎ ইন্সপেক্টর সোমনাথ মল্লিকের আগমনে। তিনি উড়ো ফোনে খবর পেয়েছেন বেলা তিনটে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে ভরদ্বাজ ট্রেডিং কোম্পানির অফিসে একটা খুন হয়েছে। এই খুনের তদন্ত যত এগোয় তত উদ্‌ঘাটিত হয় বিচিত্র রহস্য। উচ্চাভিলাষী

মন্টু সেনের ভেতরকার দরদী মনটিকে চেনা যায়, ভোম্বল ডাক্তার যে এই শীর্ণকায়কেই পেটে ছুরি কাঁচি গজ রেখে সেলাই করে দিয়েছিলেন সেকথাও প্রকাশ পায়, Hawk সাহেব যে আসলে খুবই নরম মনের, বন্দরের দালালিতে যে সে আনফিট এবং তা ঢাকা দিতেই যে তার এত হম্বিতম্বি – জানা যায় সেকথাও। এসবের মধ্যেই চলতে থাকে নেপথ্যের স্টোররুমে চায়ের পেটিতে শীর্ণকায়কে ভরে প্যাকিংয়ের কাজ। চালান দেবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে মুখ খোলা ডাব নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন পাহাড়ী বিদ্যালংকার – বেকার বিদ্যালংকারের বাবা। ছেলে যেখানেই ইন্টারভিউ দিতে যায় সেখানেই তিনি ডাব নিয়ে যান। তার মুখে দারিদ্রলাঞ্ছিত জীবনের বর্ণনা শুনতে শুনতে মন্টু নিজেকে আবিষ্কার করে সেই দারিদ্রেরই অঙ্গ হিসেবে। নিজের প্ল্যান সে নিজেই ফাঁস করে দেয় সকলের সামনে। বাক্স ভেঙে কিন্তু সকলে আরো আশ্চর্য। ভেতরে শীর্ণকায় নেই। ঠিক তখনই বাইরে থেকে প্রবেশ করে জলজ্যান্ত শীর্ণকায়। বেকার মরে না। বেকারের মৃত্যু নেই। চাকরির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে গিয়ে শীর্ণকায় শিখেছে তেরো ঘন্টা পর্যন্ত নিঃশ্বাস না নিয়ে বেঁচে থাকতে, এমনকি ভোজবাজিও সে শিখেছে। একে একে সব রহস্যের সমাধানসূত্র দিয়েছে শীর্ণকায়। পঞ্চানন ও কিষেণলালের সাহায্যে সে পবনের অনৈতিক সব কাজের সংবাদ সংগ্রহ করেছে, তারপর সকলের সামনে হাঁড়ি ভেঙেছে। কাজলের সঙ্গে পবনের প্রেম, কাজলের মিথ্যে অসুস্থতা, ঘুষের টাকায় তিন তলা বাড়ি ইত্যাদি কিছুই গোপন থাকে নি। চাকরি পাবার জন্য সুচারু পরিকল্পনা করেছে শীর্ণকায়। তারই প্ল্যান অনুসারে পাহাড়ী বিদ্যালংকার ফোন করেছিল থানায়। যে দুটি বোম শীর্ণকায় রেখেছিল বাজে কাগজের ঝুড়িতে সেগুলি যে আসলে তুলোর বল, তাও প্রকাশ পেয়েছে নাটকের শেষে। কৃতকর্মের দায়ে পবন গেছে জেলে আর তার জায়গায় কাজে নিযুক্ত হয়েছে শীর্ণকায়। নিজের জন্য 'ভেকেন্সি' এভাবেই 'ক্রিয়েট' করে নিয়েছে সে।

গ্রন্থপরিচয়ে এই নাটককে বলা হয়েছে 'দুঃসহ কৌতুক'। সত্যিই এখানে নিজের চারপাশের জগতের নির্মম বাস্তবকে প্রতি মুহূর্তে চিনে নিতে নিতে কৌতুক 'দুঃসহ' হয়ে ওঠে। হাসি এখানে যেন মিহি কাচের মতো ছড়িয়ে পড়ে হৃদয়কে রক্তাক্ত করে তোলে। রহস্য নাটক হলেও মনোজ মিত্রের নাটকের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি, যেমন – প্রাণবন্ত কৌতুক, তীক্ষ্ণ সংলাপ, ক্ষুরধার ব্যঙ্গ, চরম আকস্মিকতা প্রভৃতি থাকার ফলে 'বেকার বিদ্যালংকার' নাটকীয়তায় সার্থক হয়ে উঠেছে। কৌতুকের শর নিক্ষেপ করে কার্যসিদ্ধি, যা তাঁর নাটকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, তা এখানেও লক্ষণীয়। অফিসে চাকরি করতে এসে দুর্নীতি, বিশ্বাসঘাতকতা, অধস্তন কর্মচারীকে exploit করা প্রভৃতি সাধারণভাবে মনোজের কৌতুক ও ব্যঙ্গের লক্ষ্য হয়েছে এই নাটকে। কিন্তু নাটক এসব সাধারণত্ব অতিক্রম করে যায় শীর্ণকায়ের মঞ্চে প্রবেশের পর থেকে। আর্ত আবেদনে শীর্ণকায় যখন বলে ঃ

> "চাকরি ... একটা চাকরি ... দেবেন স্যার? ...বলুন কি কোয়ালিফিকেশন চাই? আর কি শিখলে একটা কাজ পাবো? মানুষের বুকে বোম মারা শেখার পরেও আরো কি শিখতে হবে – আরো কি মূল্য দিতে হবে আমাদের ..."[২]

তখন আমাদের অতি পরিচিত পাশের বাড়ির ছেলেটিকেই আমরা যেন দেখি মঞ্চের ওপর। মন্টু অফিসের কর্মচারী। পবন তাকে ব্যবহার করে। তাকে দিয়ে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের টিকিট কাটায়, নানারকম ফাইফরমাশ খাটায়। মন্টুর বাড়িতে বারোটা লোক, তিনটে বোন, বড়দার ক্যান্সার, সবাই চেয়ে আছে

তার দিকে। মন্টুকে তাই বিবেকের টানাপড়েন সত্ত্বেও পবনকে বাঁচাবার কথাই ভাবতে হয়। কারণ পবনের রিপোর্টের ওপরই তার চাকরি থাকা-না-থাকা নির্ভর করছে। এরকম অতি সাধারণ বিষয় অবলম্বনেই মনোজ মিত্র গেঁথে তোলেন সার্থক নাট্যমুহূর্ত ঃ " পবনদাকে ধরাবো? তাহলে আমার চাকরি ! প্রমোশন! টাকা! দরকার ... ভীষণ দরকার ! টাকা চাই আমার !"[৩] এই অফিস-কাটা মন্টু, এই টাকার জন্য উদ্‌গ্রীব মন্টুই কিন্তু বেকার ছেলের পিতার আর্তিতে বিহ্বল হয়ে সত্য প্রকাশ করে দেয় নিজের ভবিষ্যতের ঝুঁকি নিয়েই ঃ "চাই না ... চাই না ... আপনার পা-চাটা হয়ে বাঁচতে! মরে যাই যাবো তবু আপনার মুখোশ আমি ছিঁড়ে দেবো! খুনী!"[৪] মনোজের average চরিত্রেরা এভাবেই মুহূর্তে হয়ে ওঠে above the common level. এই চরিত্রের মুখেই তাই উচ্চারিত হয় নাটকের মর্মবাণী ঃ

> "বলুন ভারতবর্ষ এর চেয়ে ভালো জিনিস আর কি রপ্তানি করতে পারে পৃথিবীতে! যে জিনিস ভারতে অঢেল আছে ... সব প্রোডাক্‌সন বন্ধ হলেও যার প্রোডাক্‌সন দিনে লক্ষ লক্ষ বেড়েই যায় ... প্রচুর ... সারপ্লাস ... তা হলো বেকার। আমরা এবার সেই বেকার চালান দেবো দূর দূর দেশে।"[৫]

আবার যে চরিত্রগুলি নিতান্ত তুচ্ছ তাদের মধ্যেই প্রকৃত মহত্ত্বের অস্তিত্ব দেখেন মনোজ মিত্র। তাই পঞ্চানন ও কিষেণলাল শীর্ণকায়ের সহযোগী হয়। নাটকে সবকিছুকে ছাপিয়ে ওঠে শীর্ণকায়ের যন্ত্রণা – একজন বেকারের যন্ত্রণা। যোগ্যতা যাচাইয়ের নামে কত অদ্ভুত প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় তার ইঙ্গিত দিয়েছেন নাট্যকার রাজভবনের উদ্যানে খেজুর চাষ বা রাষ্ট্রসংঘে প্রতিদিন কত ধুনো পোড়ে সেই প্রসঙ্গ এনে। এযুগে বেকারকে সবকিছু শিখতে হয় – অ্যানাটমি থেকে ভোজবাজি পর্যন্ত। সেই সংবাদ তিনি যখন দেন বেকারের পিতার মুখে তখন সাধারণ সংলাপই রচনাগুণে চোখের কোণে জল এনে দেয় ঃ "আমার খোকা সব শিখেছে – চাকরির জন্য সব শিখেছে, মায় ভোজবাজিও শিখেছে।"[৬] নাটকের শেষে বিদ্যালংকারের আনা বোমকে তুলোর বল হিসেবে পরিচিত করেছেন মনোজ মিত্র, কিন্তু নাটকে এই ইঙ্গিত চাপা থাকে নি যে, ভয়াবহ বেকার সমস্যার চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে যে কোনো মুহূর্তে!

মনোজ মিত্রের নাট্যধারায় মাঝে মাঝে এধরণের সৃষ্টি যেন কিছুটা স্বাদবদল। নাট্যকার যেন নিজের বলার কথাটিকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে পরিবেশন করে দেখতে চেয়েছেন – ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়। মানবিক মূল্যবোধের বিপর্যয় ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেখিয়েছেন 'পাহাড়ী বিছে' নাটকে আর জ্বলন্ত এক সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্রে রেখেছেন 'বেকার বিদ্যালংকার' নাটকে। উভয় ক্ষেত্রেই আঙ্গিক রহস্য-নাটকের। তবে প্রথম নাটকে যখন রহস্যই প্রাণ, দ্বিতীয়টিতে সেখানে রহস্যের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে সামাজিক সমস্যার প্রতিক্রিয়া। রহস্য নাটকে জমাট রহস্য ঘনিয়ে তোলা এবং সেই রহস্যের জাল ভেদ করার দিকেই নাট্যকারের লক্ষ্য থাকে। যে কোনো রহস্যগ্রন্থের মতো রহস্য নাটকের আকর্ষণও রহস্য ভেদ না হওয়া পর্যন্ত। নাটকের আঙ্গিক হিসেবে রহস্যময়তার ব্যবহার খুব একটা সার্থক হয় না। মনোজ মিত্রের এই দুটি নাটকও মহৎ সৃষ্টির মর্যাদা পেতে পারে নি। প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির নাটকীয় মূল্য কিছু বেশি হ'লেও তা তাঁর প্রথম শ্রেণির নাটকগুলির পাশে দাঁড়াবার মতো নয়। এই নাটক দু'টি, সুতরাং, নাট্যকারের লেখনীর বিচিত্রগামিতার নিদর্শন হয়েই থেকে গেছে। কোনো নতুন বক্তব্য বা নির্মাণকলার পরিচয় দিতে পারেনি।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১)　পাহাড়ী বিছে (১/৫) - মনোজ মিত্র - অপেরা - চতুর্থ সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৯৯, পৃ.৫০

২)　বেকার বিদ্যালংকার (প্রথম অর্ধ) - মনোজ মিত্র - অপেরা - চতুর্থ সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৯৮, পৃ.২৩

৩)　ঐ, পৃ.৪২

৪)　বেকার বিদ্যালংকার (দ্বিতীয় অর্ধ)-মনোজ মিত্র, পৃ.৮১

৫)　বেকার বিদ্যালংকার (প্রথম অর্ধ)-মনোজ মিত্র, পৃ.৫৯

৬)　বেকার বিদ্যালংকার (দ্বিতীয় অর্ধ)-মনোজ মিত্র, পৃ.৮৫